বারীন্দ্রনাথ দাশ

এক বেগম এক সুলতান

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশক
আশীষকান্তি বসু
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রক
ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
বি তি সেনগুপ্ত

ঃ এই লেখকের অন্যান্য বই

শাহজাদা

চন্দ্রচকোর

কর্ণফুলি

রঙের বিবি

বেগমবাহার লেন

অনুরঞ্জিতা

পূর্বরাগের ইতিহাস

অন্তরতমা

বিশাখার জন্মদিন

চায়না-টাউন

রাজা ও মালিনী

মিতালী-মধুর

নিশীথ-নিঝুম

দুলারীবাঈ

অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা

ইমন-বেহাগ-বাহার

অতনু ও জীবনদেবতা

বাহাদুর শা'র সমাধি

নগরকন্যা

উপনায়িকা

॥ পূর্বকথা ॥

ষোলোশো আটত্রিশ খৃষ্টাব্দ—।

বছর দুয়েক হোলো প্রবল যুদ্ধের পর বিজাপুরের সুলতান মহম্মদ আদিল শাহকে পরাজিত করে হিন্দুস্তানে ফিরে গেছেন বাদশাহ শাহ জাহান। দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে শাহজাদা আওরংজেব। বিধ্বস্ত নিজাম-শাহী রাজ্যের কর্ণধার মালিক অম্বর খিরকি নামে এক গ্রামে পত্তন করেছিলেন এক নতুন শহরের। শাহ জাহানের নির্দেশে শাহজাদা আওরংজেবের সম্মানে সেই শহরের নতুন নামকরণ হয়েছে—আওরঙ্গাবাদ। মোগল দাক্ষিণাত্যের নতুন সুবার রাজধানী হয়েছে এই নতুন শহর, সুবাদার শাহজাদা আওরংজেবের অধিষ্ঠান সেখানে। শাহজাদার তখন কুড়ি বছর বয়েস।

পরবর্তীকালীন ইতিহাসের আরেকটি প্রধান চরিত্র শিবাজীর বয়েস তখন এগারোর বেশী নয়। পুণায় থাকেন জননী জীজাবাঈয়ের সঙ্গে, দাদাজী কাহ্নাদেবের তত্ত্বাবধানে। নিজাম-শাহী রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে মোগলদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে বিজাপুর হুকুমতের অধীনে কর্মগ্রহণ করেছেন বছর দুয়েক হোলো।

মোগল সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ এমন কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হননি, বরং সক্ষম হয়েছেন বিজাপুর রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারিত করতে। প্রাক্তন নিজাম-শাহী রাজ্যের শোলাপুর, ওয়াঙ্গি, ভল্‌কি, চিডগুপা, পুণা, উত্তর কোঙ্কন প্রভৃতি পরগণা তাঁর এলাকাভুক্ত হয়েছে। রাজ্যের আয় বেড়ে গেছে

কুড়ি লক্ষ গুণ বা আশী লক্ষ টাকা, অতিরিক্ত রাজস্ব বাবদ। বিজাপুর রাজ্যের সৌভাগ্যসূর্য এসময় সাফল্যের মধ্যাহ্নগগনে পূর্ণ গৌরবে ভাস্বর হয়ে আছে। আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত রাজ্যের বিস্তৃতি। বাৎসরিক আয় তেরো কোটি টাকারও বেশী। ধনরত্নে রাজকোষ পরিপূর্ণ, রাজ্যের ঐশ্বর্যের খ্যাতি হিন্দুস্তানে সর্বজনবিদিত। মোগল সেনাবাহিনীর কাছে নতিস্বীকার করলেও, বিজাপুরের সামরিক শক্তির উল্লেখ হয় সম্ভ্রমের সঙ্গে। স্থায়ী সেনাবাহিনীতে আছে আড়াই লক্ষের উপর পদাতিক সেনা, আশী হাজারের মতো অশ্বারোহী। হাতিশালে হাতি আছে পাঁচশোরও উপর।

বিজাপুরের সমৃদ্ধি ঈর্ষার উদ্রেক করে প্রতিবেশী রাজ্যের অধিবাসীদের মনে। কিন্তু সুখ ও সম্পদের এই পরিপূর্ণতার মধ্যে একটি মাত্র অভাব,—পরাক্রান্ত সুলতানের কোনো পুত্রসন্তান নেই।

একদিকে ক্ষমতামত্ত মোগল সাম্রাজ্য, অন্যদিকে সম্প্রসারণ-অভিলাষী গোলকুণ্ডা,—সদা সতর্ক থাকতে হয় বিজাপুরকে। রাজ্যের আফগান, সিদ্দি, মুল্লা এবং সৈয়দ অভিজাতদের মধ্যে প্রবল রেষারেষি, তাদের দমিয়ে রাখতে পারে শুধু পরাক্রান্ত সুলতানের শাসনদক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব। কিন্তু যদি মহম্মদ আদিল শাহ্‌র কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, তখন কিরকম দাঁড়াবে দেশের অবস্থা? রাজ্যের হিতৈষী মাত্রেই দুর্ভাবনা করে এই কথা নিয়ে।

একদিন শোনা গেল, বড়ী সাহিবা, অর্থাৎ সুলতানের প্রধানা বেগম, সন্তানসম্ভবা।

সারা বিজাপুর জুড়ে আনন্দের স্রোত বইলো।

সেদিন সকাল থেকে উৎকণ্ঠার ছায়া নামলো রাজধানী জুড়ে। চওকের বাজার, জমা মসজিদের সামনের রাজপথ, কিলা অর্ক্‌-এর চারপাশের পথঘাট জনতায় জমজমাট। নগরপ্রাকারের বাইরের

দৌলতপুর, খুসরওপুর, জুহ্‌রাপুর, শাহ্‌পুর অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক পরিখা অতিক্রম করে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমের দর্‌ওয়াজাগুলির ভিতর দিয়ে শহরের ভিতর চলে আসছে, ইব্রাহিম রওজা গোল-গম্বুজ পেরিয়ে এসে ভিড় করছে কিলা অর্ক্‌-এর আশেপাশে। শহরের বিভিন্ন স্নানাগারে লোকসমাগম অন্যান্যদিনের থেকে বেশী। অভিজাতপুরুষদের তাঞ্জাম, চৌদোল, পাল্কি বিভিন্ন রাজপথ দিয়ে যাওয়া-আসা করছে অনবরত।

বড়ী সাহিবা আসন্নপ্রসবা।

সবারই মুখে একই প্রশ্ন,—কি হবে বড়ী সাহিবার, পুত্র না কন্যা? নানারকম গুজব লোকের মুখে। জুহ্‌রাপুরের সৈয়দ্‌ শিহাব-উদ্‌-দিন সাহেব নাকি বলেছেন, ছেলে হবে। আর্কট থেকে নাকি এক নামজাদা ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী এসেছে শহরে, সে বলছে যমজ সন্তান হবে,—এক পুত্র, এক কন্যা। বছর দুয়েক আগে আগ্রার শেখ্‌ য়াহিয়া অল চিশতি সুলতানের কোষ্ঠি প্রস্তুত করে পাঠিয়েছিলেন, তাতেও নাকি লেখা আছে পুত্রসন্তান হবে বড়ী সাহিবার। বাজারের জ্যোতিষী যারা আছে, তারা সবাই পথের উপর খড়ি পেতে বসেছে, সবাই বলছে ছেলে হবে। কন্যাসন্তান হবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যাচ্ছে না কারো মুখে। বাজারে, কাটরায় লোকে বাজি ধরছে পুত্রসন্তানের সপক্ষে।

সবারই মুখে নানারকম জল্পনাকল্পনা। পুত্রসন্তান হলে নাকি সাতদিন ধরে উৎসব চলবে রাজ্যের সর্বত্র, আতশবাজির ধুম চলবে সারারাত ধরে। এবছরের মতো খাজনা মকুব হবে রায়তদের। বিখ্যাত দস্যুদলপতি সিদ্দি হাসান আছে কয়েদখানায়, পরশু তাকে কোতল করার কথা, সে বোধ হয় এযাত্রা প্রাণে বেঁচে গেল। কন্যাসন্তান হলে এখন থেকেই হয়ে যাবে আগ্রার কোনো না কোনো শাহজাদার শিশুপুত্রের বাগদত্তা বধূ, এখন থেকেই বিজাপুরের মসনদের কোনো তৈমুরবংশীয় দাবিদার তৈরী রাখা হোলো

মোগলদের, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শাহজাদা আওরং-জেবের উদ্দেশ্য। পুত্রসন্তান হলে মোগলদের এই আশা ফলবতী হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। মনে প্রাণে সবাই চাইছে সুলতানের পুত্রসন্তান হোক।

দিন কেটে গেল, সন্ধ্যা নামলো শহর ঘিরে। আলোকমালায় ঝলমল করে উঠলো চারদিক। তবু হৈ-চৈ, গুজব, জল্পনা-কল্পনার বিরাম নেই। সবাই চারদিকে ঘোরাফেরা করছে অধৈর্য প্রতীক্ষায়। কাফি-সরাই, পথপ্রান্তের খাবারের দোকান, শরবতের দোকানে খুব বিক্রি, খদ্দেরদের চাহিদা মিটিয়ে উঠতে পারছে না দোকান-দারেরা। তাদের খুশির অন্ত নেই। সুলতানের ছেলে হোক, মেয়ে হোক, তাদের তহবিলে একদিনে একসঙ্গে এসে জমা হচ্ছে পাঁচ-ছ-মাসের মুনাফা।

কিলা অর্ক্-এর অভ্যন্তরে হুকুমতের বিভিন্ন দফ্তর, একেবারে কেন্দ্রস্থলে সুলতানের সুরক্ষিত মহল। প্রদীপদীপ্ত অলিন্দগুলো খাদিম, খাদিমান ও অন্যান্য পরিজনবর্গের কলকোলাহলে মুখরিত হয়ে আছে। নিচে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে, দেওড়ির আশেপাশে অপেক্ষা করছে রাজ্যের বিভিন্ন বর্গের অভিজাত সর্দারেরা।

কিন্তু সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ অত্যন্ত বিমর্ষ। নীরবে পদচারণা করছেন গুসলখানার অভ্যন্তরে। সুলতানের নির্দেশে একটির বেশী প্রদীপ জ্বালানো হয়নি। অল্প আলোয় ম্লান হয়ে আছে কক্ষের অভ্যন্তর। বাইরে পাষাণমূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাবসী প্রহরী। গুসলখানায় আজ আর কারোই আসবার হুকুম নেই,—এমন কি স্বয়ং উজীর খাঁ-মহম্মদেরও নয়। আজ সঙ্গে আছে শুধু হামিদ খাঁ, সুলতানের অতি বিশ্বাসভাজন সর্দার। হামিদ খাঁ একসময় ছিলো দারোগা-ই-খওয়াস্, সুলতানের ব্যক্তিগত অনুচরদের অধ্যক্ষ। বছরখানেক হোলো সুলতান মহম্মদ

আদিল শাহ তাকে সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতারূপে নিযুক্ত করেছেন।

হামিদ খাঁও অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে ছিলো গুসলখানার এক কোণে। সুলতানের মর্মবেদনার কারণ সে জানতো।

সুলতানের অতি প্রিয়তমা পরস্‌তার শাম্‌স্‌-উন্‌-নিসাও ছিলো সন্তানসম্ভবা। দেড় ঘড়ি আগে সে জন্ম দিয়েছে এক পুত্রসন্তানের, কিন্তু প্রসূতিকে বাঁচাতে পারেনি অভিজ্ঞ ধাত্রী রাজিয়া বিবি। হাকিম-ই-আলা জিন্দান খাঁর বিশেষ তত্ত্বাবধান এবং ঔষধপ্রয়োগ সত্ত্বেও শাম্‌স্‌-উন্‌-নিসা প্রসবের এক ঘড়ির মধ্যেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে।

সুলতানের পত্নী স্বয়ং বড়ী সাহিবার প্রসব আসন্ন। খবর এসে গেছে যে, প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেছে। রাজ্যের সর্দারেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। পুত্রসন্তান হওয়ার উপর নির্ভর করছে রাজ্যের ভবিষ্যত। সুলতানের নিজের পুত্রসন্তান ছাড়া অন্য কোনো দাবিদারকে বিজাপুরী তখ্‌ত্‌-এর উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করে নিতে রাজী হবে না হিন্দুস্তানের বাদশাহ। নিজামশাহী রাজ্য সম্প্রতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন যে মোগলদের দৃষ্টি পড়েছে বিজাপুর আর গোলকুণ্ডার উপর একথা সর্বজনবিদিত। মোগল-দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শাহজাদা আওরংজেব স্বয়ং যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার স্বাধীনতা হরণ করবার ষড়যন্ত্রজাল রচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এখবরও কারো অজ্ঞাত নয়। সবাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌রও উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা, কিন্তু প্রিয়তমা পরস্‌তার শাম্‌স্‌-উন-নিসার অকালমৃত্যু সুলতানকে মুহ্যমান করে ফেলেছে।

—এবং আজকের দিন বলে, শুধু সুলতান একাই শাম্‌স্‌-উন্‌-নিসার মৃত্যুতে বেদনাতুর। মহলের আর কারো তা নিয়ে বেদনাবোধ করার, শোক প্রকাশ করার অবসর নেই। বড়ী সাহিবার

আসন্ন প্রসবের ব্যাপারে সবাই ব্যস্ত। পরস্তার মহলে এক হত-ভাগিনী যে পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ তুনিয়া থেকে বিদায়গ্রহণ করেছে, সে খবর বিশেষ কেউ জানলোও না।

পায়চারি করতে করতে কিছুক্ষণ পরে ফিরে দাঁড়ালো মহম্মদ আদিল শাহ। হামিদ খাঁর দিকে তাকিয়ে বললো, "শাম্স্-উন-নিসার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কি ব্যবস্থা হয়েছে?"

হামিদ খাঁ উত্তর দিলো, "মহলদার লতিফাবানু তুজন খাদিমের উপর ভার দিয়েছে।"

"নবজাত সন্তানের কি ব্যবস্থা হবে?"

"উপস্থিত আয়েশা নামে এক খাদিমান তার ভার নিচ্ছে। পরে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।"

"একথা মহলদারকে জানিয়ে দেওয়া হোক হামিদ খাঁ, এ আমারই সন্তান। তার পরিচর্যায় যেন কোনোরকমের ত্রুটি না হয়।"

সুলতান বিষণ্নমুখে আবার পদচারণা শুরু করলেন। তিনজন অভিজ্ঞ ধাত্রী বড়ী সাহিবার খেদমতে হাজির আছে সকাল থেকে, হাকিম-ই-আলা জিন্দান খাঁও সকাল থেকে বাইরে বসে আছেন সব কাজ ছেড়ে। কিছুক্ষণ পর পরই খোজা খাদিম এসে জানিয়ে যাচ্ছে বড়ী সাহিবার অবস্থা। তিনি ঔষধের ব্যবস্থা দিচ্ছেন লক্ষণ অনুযায়ী। আজ অন্য কোনোদিকে মন দেওয়ার ফুরসত কারো নেই। তা সত্ত্বেও শাম্স্-উন-নিসার জন্যে তিনজন ধাত্রীর অন্যতম রাজিয়া বিবিকে পাঠানো হয়েছিলো সুলতানের নির্দেশে, শাম্স্-উন্-নিসার অবস্থার অবনতি হতে হাকিম-ই-আলাকে তার জন্যেও ঔষধের ব্যবস্থা করে দিতে হয়েছিলো সুলতানের বিশেষ হুকুমে।

"আমি আমার কর্তব্য করেছি," দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো মহম্মদ আদিল শাহ, "খোদার ইচ্ছে। আমাদের আর কি করবার আছে।"

বাইরের শোরগোল হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠলো। ফিরে দাঁড়ালে সুলতান।

"কি হোলো হামিদ খাঁ?"

হামিদা খাঁও কান পাতলো।

বাইরে এসে উপস্থিত হোলো কয়েকজন। ভেতরে আসার হুকুম কারো নেই। শুধু মহলদার লতিফাবানু ঘরে ঢুকলো নকাব্‌এ মুখ ঢেকে।

"মালিক-এ-জাহাঁ," লতিফাবানু তসলিম জানালো।

"কি হয়েছে? কি খবর?" উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মহম্মদ আদিল শাহ। এক মুহূর্তে ভুলে গেল শাম্‌স্‌-উন্‌-নিসার বিয়োগ বেদনা।

"এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন বড়ী সাহিবা।"

খবর পেয়ে সুলতানের মুখ ঝলমল করে উঠলো।

"উজীর খাঁ-মহম্মদ কোথায়? তাকে ইত্তলা দাও। সেই দেওড়িতে গিয়ে সংবাদ ঘোষণা করবে। না, দাঁড়াও। আগে আমি একবার দেখে আসি।"

দ্রুত পদক্ষেপে গুসলখানা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলে গেল সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ। মহলদার লতিফাবানুও গেল পেছন পেছন।

ঘরের মধ্যে একলা রইলো হামিদ খাঁ। কেটে গেল কিছুক্ষণ সময়। এলোমেলো অনেক কথা মনে পড়ছিলো হামিদ খাঁর। বড়ী সাহিবা তেজস্বী মহিলা, তার সঙ্গে সুলতানের কোনোদিন বনিবনাও হয়নি, তাকে ভালোবাসতেও পারেনি সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ। দেশের রাজনীতিতে যে বড়ী সাহিবা তার ভাই আফজল খাঁর মারফত হস্তক্ষেপ করতো এটাও মহম্মদ আদিল শাহ বরদাস্ত করতে পারতো না। উজীর খাঁ-মহম্মদ এবং সিদ্দি মরজন, সিদ্দি দিলাওয়ার প্রমুখ হাবসী সেনানায়কেরাও যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ

ব্যাপারে বড়ী সাহিবার পরামর্শ নিতো সেটা পছন্দ করতো না সুলতান। কিন্তু তার কিছু করার উপায় ছিলো না। হাবসী এবং আফগান সর্দারদের উপর বড়ী সাহিবা ও আফজল খাঁর প্রভাব খুব। মাহ্‌দবি সম্প্রদায়ের সৈয়দ এবং নওয়াইয়ত্‌ গোষ্ঠির আরব মোল্লা সর্দারেরা সুলতানের নির্দেশে চললেও হাবসী সিদ্দি এবং আফগান সর্দারদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ওরা ছিলো একটু দুর্বল। সুতরাং বড়ী সাহিবাকে বিশেষ কিছু বলতে পারতো না সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ।

বড়ী সাহিবা সুলতানের প্রধানা বেগম, কিন্তু পারিবারিক জীবনে তার কাছ থেকে মহম্মদ আদিল শাহ কিছুই পায়নি। সে অভাব পূরণ করেছিলো শাম্‌স্‌-উন্‌-নিসা। প্রেম ভালোবাসা সুলতান যা কিছু পেয়েছিলো, সব তারই কাছে। বড়ী সাহিবার এতে আপত্তি করার কিছু ছিলো না, বরং সুলতান যে এক এক সময় রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে থাকতো তারই কাছে, তাতে পরম সন্তোষ লাভ করতো বড়ী সাহিবা। শুধু একবার রুখে দাঁড়িয়েছিলো বড়ী সাহিবা, যখন সুলতান শাম্‌স্‌-উন্‌-নিসাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ করে তাকে বেগমের মর্যাদা দেওয়ার সংকল্প করেছিলো। উজীর খাঁ-মহম্মদ বলেছিলো, ওকে বিয়ে করলে ক্ষতি কি? হয়তো তাহলে রাজ্যশাসন উজীরের হাতে ছেড়ে দিয়ে সব সময় ওর মহলেই পড়ে থাকবেন সুলতান। বড়ী সাহিবা দৃঢ়কণ্ঠে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলো, না, সে হতে পারেনা। তাহলে যদি ওঁর ছেলে হয়, সুলতান তাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। তখনো বড়ী সাহিবার ছেলে হয়নি, তাই এ ভয়টা মনে বরাবর ছিলো।

শাম্‌স্‌-উন্‌-নিসাকে হামিদ খাঁ এক সময় চিনতো। বহুকাল আগে তাদের বিয়ের কথাবার্তাও হয়েছিলো। কিন্তু সে সময় হঠাৎ সে সুলতানের নজরে পড়ায় পাল্কি চড়ে সুলতানের মহলে চলে

আসতে হোলো তাকে, হামিদ খাঁর সঙ্গে বিয়ে আর হোলো না। হামিদ খাঁর সঙ্গে আর কোনোদিন দেখাও হয়নি। কিন্তু তাকে ভুলে যায়নি শাম্‌স্‌-উন্‌-নিসা। নিজের খাস খাদিমান আয়েশার মারফত তার খোঁজ খবর করতো। হামিদ খাঁর জীবনের উন্নতির মূলেও সে। তার হয়ে সুলতানকে বলতো বলেই তার উপর এতটা নেক নজর ছিলো সুলতানের।

আজ অনেক পুরোনো ছোটোখাটো টুকরো টুকরো ঘটনা মনে পড়লো হামিদ খাঁর। সেই শাম্‌স্‌-উন্‌-নিসা মারা গেল এমনি ভাবে! আজ মহলের আনন্দ-উৎসবের আয়োজনের মধ্যে তার কথা ভাববার ফুরসতও কারো নেই! হামিদ খাঁর বুক ঠেলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো।

হঠাৎ পদশব্দ শুনে সচকিত হয়ে হামিদ খাঁ ফিরে তাকালো। দেখলো, ফিরে এসেছে সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ। মুখ গম্ভীর, ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত, চোখে গভীর দুর্ভাবনার ছায়া। চুপ-চাপ দাঁড়ালো কক্ষের মাঝখানে।

হামিদ খাঁ বুঝলো গুরুতর কিছু একটা হয়েছে। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো সুলতানের আদেশের প্রতীক্ষায়।

"হামিদ খাঁ," খুব আস্তে, খুব নিচু গলায় ডাকলো সুলতান।

"হুকুম করুন মালিক-ই-জাহাঁ।"

"কাছে এসো।"

হামিদ খাঁ অনুমান করলো খুব জরুরী কথা আছে। সে কাছে সরে এলো।

"হামিদ খাঁ, আমাদের সব আশা ধুলিসাৎ হোলো," খুব মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বললো সুলতান।

"কেন, মালিক-ই-জাহাঁ?"

"বড়ী সাহিবার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার কিছুক্ষণের মধ্যে প্রাণ-ত্যাগ করেছে।"

"সে কি কথা মালিক?" স্তম্ভিত হয়ে হামিদ খাঁ বলে উঠলো। এই সংক্ষিপ্ত সংবাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কতোখানি সেটা সে অনুমান করতে পারলো সঙ্গে সঙ্গেই।

সুলতান চারদিকে তাকালো। ধারে কাছে কেউ নেই। তারপর নিম্নকণ্ঠে বললো, "হামিদ খাঁ, আমি বড়ী সাহিবার ঘরে ঢুকে শিশুকে আর জীবন্ত দেখিনি। তার সারা শরীর নীল হয়ে গেছে।"

হামিদ খাঁ গম্ভীর মুখে চুপ করে রইলো।

"আমি সঙ্গে সঙ্গে হাকিম-ই-আলা জিন্দান খাঁকে ইত্তলা দিয়ে মহলের ভিতর আনিয়ে নিলাম। নবজাত সন্তানকে বড়ী সাহিবার কাছ থেকে তুলে নিয়ে এলাম অন্য একটি প্রকোষ্ঠে। হাকিম-ই-আলা সেখানে তার নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলো। বললো, কিছু করবার নেই।"

হামিদ খাঁ গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছিলো।

"কি ভাবছো হামিদ খাঁ?"

"পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ কে কে জানে?" হামিদ খাঁ জিজ্ঞেস করলো।

"বেশী কেউ নয়, ওই তিনজন ধাত্রী, হাকিম-ই-আলা, মহলদার লতিফাবানু, আর তুমি। আমি জানাবো উজীর খাঁ-মহম্মদকে, তারপরেই অন্য সবাই জানতে পারবে, তার আগে যে কারো কিছু জানবার অধিকার নেই সে তো তুমি জানো হামিদ খাঁ।"

বিজাপুর রাজদরবারের এসব আদব হামিদ খাঁর অজানা ছিলো না। সুলতানপত্নীর মহলে থাকে কড়া পাহারা, কারো প্রবেশ করার হুকুম নেই সেখানে, শুধু ধাত্রী আর মহলদার ছাড়া। সন্তানের জন্ম হলে মহলদার এসে জানাবে সুলতানকে, দেউড়িতে অপেক্ষমান উজীরকে জানাবে সুলতান নিজের মুখে,

শাহী-বুরজ্এ দাঁড়িয়ে উজীর ঘোষণা করবে রাজ্যের প্রধান সর্দার-দের কাছে, তারপর সাধারণভাবে ঘোষণা হবে, জানবে মহলের সবাই আর রাজধানীর প্রজাসাধারণ।

"সংবাদ জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে?" হামিদ খাঁ জিজ্ঞেস করলো।

"বেশীক্ষণ গোপন রাখা সমীচীন হবে না। হাকিম-ই-আলাকে যে মহলের ভিতর ডাকিয়ে আনা হয়েছে, এ সংবাদ বাইরে সবাই নিশ্চয় জেনেছে।"

"আপনি আর আমি ছাড়া জানে শুধু পাঁচজন, তিনজন ধাত্রী, —রাজিয়া বিবি, সলিমা বিবি, সাকিনা বিবি, মহলদার লতিফা-বানু আর হাকিম-ই-আলা জিন্দান খাঁ। এরা সবাই এখন কোথায়?"

"সেই প্রকোষ্ঠে, যেখানে মৃত সন্তানকে এনে রাখা হয়েছে।"

"ওদের কেউ যদি বাইরে চলে আসে তাহলে সংবাদ গোপন রাখার সম্ভাবনা কম। কথাটা জানাজানি হয়ে ছড়িয়ে পড়বে।" হামিদ খাঁ বললো।

"কেউ বাইরে আসতে পারবে না। পাহারাদারকে নির্দেশ দেওয়া আছে। আমি আগেই ভেবে রেখেছি।"

হামিদ খাঁ আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "আমি যে কথা ভাবছি, মালিকও কি সেকথা ভাবছেন?"

সুলতান তাকালো হামিদ খাঁর দিকে। বললো, "বলো।"

"শাম্স্-উন্-নিসার সন্তানও তো আপনারই সন্তান।"

সুলতান তাকিয়ে রইলো হামিদ খাঁর দিকে।

"মালিক-ই-জাহাঁ, বিজাপুর রাজ্যের স্বার্থে বড়ী সাহিবার নব-জাত সন্তান জীবন্ত এবং দীর্ঘজীবি হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

"কি উপায় আছে বলো।"

"শাম্স্-উন্-নিসার সন্তান সম্বন্ধে বিশেষ কেউ কিছু জানে না।

জানে শুধু আয়েশা, লতিফাবানু, আর ওই দুজন খোজা খাদিম।"

"তারপর?"

"খোজা খাদিম দুজন শাম্‌স্-উন্-নিশার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করবে। ইতিমধ্যে দেখা যাবে শাম্‌স্-উন্-নিসার শিশুসন্তান খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মালিক সুলতান খবর পেয়ে হাকিম-ই-আলাকে পাঠাবেন তাকে পরীক্ষা করতে। কিন্তু সে বাঁচবে না। তখন খাদিমেরা শাম্‌স্-উন্-নিসা আর ওর শিশুসন্তান দুজনকেই গোর দিয়ে আসবে। এই শেষ কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় কিনা তার তদারক করতে আমি নিজে সঙ্গে যাবো।"

"আর এদিকে?"

"মালিক-ই-জাহাঁ উজীর খাঁ-মহম্মদকে ইত্তলা দিয়ে শুভসংবাদ জানাবেন। সারা রাজ্যে আনন্দস্রোত বইবে। দেশে দেশে সংবাদ চলে যাবে যে, বিজাপুরের সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। বাদশাহ শাহ্ জাহান ও শাহজাদা আওরংজেব ছাড়া সবাই এ সংবাদ শুনে আনন্দিত হবে। পরে এই সন্তান বড়ো হয়ে সুলতান মালিকের অবর্তমানে তখ্‌ত্-এ-হাসিল্ হবেন।"

মহম্মদ আদিল শাহ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো। বললো, "আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাইছো। কথাটা যে আমিও ভাবিনি তা নয়। তবে তোমার মতো বিশ্বস্ত অনুচরের সহায়তা ছাড়া একলা আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। অত্যন্ত গোপনে করতে হবে সব কিছু, যদি ঘুণাক্ষরেও কথাটা প্রকাশ পায় যে, শাম্‌স্-উন্-নিসা আর বড়ী সাহিবার সন্তান দুটি বদলে দেওয়া হয়েছে, তাহলে তার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হবে।"

"আপনি সব আমার উপর ছেড়ে দিন মালিক-ই-জাহাঁ।"

"কিন্তু হামিদ খাঁ, একটা কথা—"

"কি?"

'আমার সন্তানকে গোর দেওয়া হবে সাধারণ গোরস্তানে ?"

'আমার গুস্তাকী মাফ করবেন মালিক," হামিদ খাঁ আস্তে আস্তে বললো, "আপনার সন্তান বড়ী সাহিবার কোল আলো করে মহলে শুয়ে থাকবেন। আর যাকে গোর দেওয়া হবে তিনি,—তিনি তো বড়ী সাহিবার সন্তান।"

"হ্যাঁ, হাসলো সুলতান, "একেই বলে তকদীর। বড়ী সাহিবা আমার শাম্‌স্‌-উন্‌-নিসাকে বেগম করার বিপক্ষে ছিলো। তার ভয় ছিলো, যদি আমি শাম্‌স্‌-উন্‌-নিসার সন্তানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করি। শাম্‌স্‌-উন্‌-নিসার আত্মা নিশ্চয়ই এখন হেসে খুন হবে। আচ্ছা, তুমি ব্যবস্থা যা করার তাড়াতাড়ি করো হামিদ খাঁ।"

"একটা কথা—।"

"বলো।"

"সলিমা বিবি আর সাকিনা বিবিকে বড়ী সাহিবার কক্ষে পাঠিয়ে দিন। ওরা শাম্‌স্‌-উন্‌-নিসার সন্তানের খবর জানেনা। শুধু হাকিম-ই-আলা আর রাজিয়া বিবি অন্য কক্ষে নবজাত সন্তানের কাছে থাক। কিন্তু, ওরা চিরকাল মুখ বন্ধ করে থাকবে তো ?"

"সে দায়িত্ব আমার," আস্তে আস্তে বললো মহম্মদ আদিল শাহ, "ওদিকে সেই খাদিমান,—কি যেন ওর নাম ?—হ্যাঁ, আয়েশা, সেও তো জানবে সব। সে চিরকাল মুখবন্ধ করে থাকবে তো ?"

"আয়েশার ভার আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন," উত্তর দিলো হামিদ খাঁ।

"বেশ, তুমি তাহলে এসো।"

"মহলদার এসে যখন আপনাকে খবর দেবে যে, মালিক-ই-জাহাঁর সন্তান সুস্থ হয়ে উঠেছে, তখন আপনি উজীর সাহেবকে জানাবেন।"

"তোমার কতক্ষণ লাগবে ?"

"এই ধরুন, এক ঘড়ি সময়।"

"আচ্ছা।"

তসলিম জানিয়ে বেরিয়ে চলে গেল হামিদ খাঁ। তারপর এগিয়ে গেল খাদিমদের মহলের দিকে। সেখান থেকে গুপ্তপথ আছে পরসতার মহলে যাওয়ার, সে পথ পাহারা দেয় হামিদ খাঁর অতি বিশ্বস্ত একজন খোজা খাদিম। বাইরের জগতের সঙ্গে পরসতারদের কোনো যোগাযোগ থাকার কথা নয়, তবু একটা গোপন যোগাযোগ থাকে। কেউ জানে না, শুধু অতিবিশ্বস্ত ভেতরের লোক ছাড়া।

খুব সর্তক দৃষ্টিতে চারদিক একবার তাকিয়ে দেখলো হামিদ খাঁ। কেউ নেই ধারে কাছে।

কিন্তু দূরে এক প্রশস্ত স্তম্ভের ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়েছিলো একজন। সে এক হাবসী খোজা খাদিম, সিদ্দি হানিফ,—মহলের ভিতরে নিযুক্ত খাস হরকরা বা গোপন সংবাদদাতা, খোদ উজীর খাঁ-মহম্মদের নিজের লোক।

হামিদ খাঁ জানলো না যে দূর থেকে ছায়ার মতো তার অনুসরণ করছে সিদ্দি হানিফ।

হামিদ খাঁ চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ পায়চারি করলো সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ। তারপর ইত্তলা দিলো মুল্লা লতিফকে।

মুল্লা লতিফ সুলতানের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের দারোগা। অনতিবিলম্বে সে এসে উপস্থিত হোলো।

"মুল্লা লতিফ," আস্তে আস্তে বললো সুলতান, "চারটি নাম মনে করে রাখো,—হাকিম-ই-আলা জিন্দান খাঁ, রাজিয়া বিবি, হানিফ খাঁ, আর পরসতার মহলের খাদিমান আয়েশা।"

মুল্লা লতিফ তাকালো সুলতানের দিকে। সুলতান মুখে কিছু না বলে গলার উপর আঙুল দিয়ে ছুরি দিয়ে কণ্ঠনালি কর্তনের ভঙ্গি করলো।

মাথা নাড়লো মুল্লা লতিফ।

"যতো তাড়াতাড়ি হয়, দেরি কোরো না।"

"আচ্ছা।" তসলিম জানিয়ে মুল্লা লতিফ চলে গেল।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর একসময় সুলতানের সামনে এসে তসলিম জানালো মহলদার লতিফাবানু। ভাবলেশ-হীন প্রশান্ত গাম্ভীর্যে তার দিকে তাকালো সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ।

"মালিক-ই-জাহাঁ, হাকিম-ই-আলা জিন্দান খাঁ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনার কাছে এই সংবাদ পেশ করছেন যে, বড়ী সাহিবার নবজাত পুত্র সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আর আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।"

হাত দিয়ে ললাটের স্বেদ অপনয়ন করলো সুলতান, তারপর গলদেশ থেকে বহুমূল্য মুক্তাহার উন্মোচন করে লতিফাবানুর হাতে দিলো! লতিফাবানু হার গ্রহণ করে আবার তসলিম জানালো।

"উজীর খাঁ-মহম্মদকে ইত্তলা দাও," আদেশ করলো সুলতান।

লতিফাবানু চলে যাচ্ছিলো। সুলতান ডাকলো পিছন থেকে।

"শোনো।"

লতিফাবানু ফিরে দাঁড়ালো। সুলতান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। মহলদারের চোখে যেন একটু ভয়ের আভাস। সে সহ্য করতে পারলো না সুলতানের দৃষ্টি। চোখ নামিয়ে ফেললো।

"আজ থেকে তুমি মাসে পাঁচশো হুন করে পাবে। তাছাড়া ইনাম হিসেবে তোমাকে দু-হাজার হুন আর একটি হীরার

অঙ্গুশতরি দিয়ে দেওয়ার আদেশ জারি করে দিচ্ছি এখনই। তবে একটা কথা মনে রেখো। স্বর্ণমুদ্রা এমনি এমনি পাওয়া যায় না। যারা স্বর্ণমুদ্রা পায় তারা কোনো কিছু শুনতে পায় না, কিছু দেখতে পায় না, কাউকে কিছু বলে না। যেই মুহূর্তে কারো মনে হবে যে, তুমি শুনতে পাও, দেখতে পাও, আর বলতে পারো, সেই মুহূর্তে পাঁচশো হুন তো বন্ধ হবেই, তাছাড়া তোমার শুনতে পাওয়া, দেখতে পাওয়া, বলতে পারাও চির-কালের জন্যে শেষ হয়ে যেতে পারে। যে গোরস্তানের মাটির নিচে আছে সেও শুনতে পায় না, দেখতে পায়না, কিছু বলতে পারে না,—কিন্তু সে মাসে পাঁচশো হুনও পায় না। বেঁচে থাকার সুখ এখানে,—বধির, অন্ধ আর বোবা হলেও মাসে পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা পেতে পারে। এ বিষয়ে তোমার কি বক্তব্য আমি শুনতে চাই।"

"মালিক-ই-জাহাঁ," আবার তসলিম জানিয়ে লতিফাবানু বললো, "আমি কিছু শুনতে পাই না, কিছু দেখতে পাই না, কিছু বলতে জানিনা।"

সুলতান পরিতুষ্ট হয়ে বললো, "এবার তুমি যেতে পারো। তুমি আজ পনেরো বছর ধরে আমাদের খিদমতে নিযুক্ত আছো। তোমায় আমি বিশ্বাস করি।"

লতিফাবানু চলে গেল।

সারারাত আতশবাজি, উৎসব, ধুমধাম। রজনী অতিক্রান্ত হয়ে প্রভাত হোলো। তখনো জনসাধারণের কোনো ক্লান্তি নেই। নগরপ্রাকারের সমস্ত তোরণদ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, দলে দলে লোক বাইরে থেকে শহরের ভিতরে আসছে, শহর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বেলা বেড়ে উঠতে যেন আরো উদ্দাম হোলো আনন্দ-উৎসবের বন্যা। কিলা অর্ক্‌-এ দান-খয়রাত করা হচ্ছে

ফকির মুসাফিরদের, মিষ্টি ও বস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে হাজার হাজার ভিখারীর মধ্যে। সবাই পরিধান করেছে উৎসবের দিনের রং-বেরঙের বেশ, একটা স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে ঝলমল করছে বিজাপুর শহর।

কিন্তু এই আনন্দউৎসবে যোগদান করবার অবকাশ পায়নি হামিদ খাঁ। শহরতলির একপাশে তার মঞ্জিল, সেখানে সারাদিন দ্বাররুদ্ধ করে থাকতে হয়েছে তাকে।

শাম্‌স্‌-উন্‌-নিসার মৃতদেহ গোর দেওয়া হয়ে গেছে। বেশী কেউ ছিলো না, শুধু পরসতার মহলের পাঁচ ছ-জন খাদিম। খাদিমান আয়েশাবানুর সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতা ছিলো শামস্‌-উন্‌-নিসার। তাই সেও এসেছিলো নকাব্‌এ মুখ ঢেকে।

জটিলতার সূত্রপাত হোলো সেখানে।

গোরস্তানের পাশ দিয়ে সরু পথ ধরে যাচ্ছিলো এক হিন্দু সন্ন্যাসী। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। মৃত শিশুটিকেও আনা হয়েছিলো একই সঙ্গে গোর দেওয়া হবে বলে। সন্ন্যাসী দূর থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলো শিশুটিকে। তারপর হাতছানি দিয়ে হামিদ খাঁকে কাছে ডেকে বললো, "এই শিশু মৃত বলে মনে হচ্ছে না। আমি এখনো ওর মধ্যে প্রাণের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।"

হামিদ খাঁ অবাক হয়ে তাকালো সন্ন্যাসীর দিকে।

"আপনি যদি বলেন তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি ওকে বাঁচানো যায় কিনা।"

হামিদ খাঁ হেসে বললো, "সাধুবাবা, তন্ত্রমন্ত্র জানেন নাকি?"

"তন্ত্রমন্ত্র নয়", সন্ন্যাসী বললো, "সংসারাশ্রমে বৈদ্যবৃত্তি ছিলো আমার পেশা, সন্ন্যাস নিয়েছি বটে, কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্র তো বিস্মৃত হই নি।"

আয়েশাবানুও ইতিমধ্যে খানিকটা কাছে এসে শুনছিলো এদের কথাবার্তা। সে আর হামিদ খাঁ পরস্পরের দিকে তাকালো।

শিশুটিকে আর গোর দেওয়া হোলো না। তাকে নিয়ে হামিদ খাঁ, আয়েশা আর সেই সন্ন্যাসী চলে এলো হামিদ খাঁর মঞ্জিলে।

সন্ন্যাসী নিজের হাতে ঔষধ আর অনুপান প্রস্তুত করে ঝিনুক দিয়ে একটু একটু করে খাইয়ে দিলো শিশুকে। তার নির্দেশে আয়েশা গরম সেঁক দিতে লাগলো শিশুর হাতে পায়ে।

যখন সে প্রথম কেঁদে উঠলো, তখন সূর্য অস্ত গেছে, থালার মতো বড়ো পূর্ণিমার চাঁদের উদয় হয়েছে পূর্ব গগনে।

তার পর থেকেই ভাবনার মেঘ ছেয়ে গেল হামিদ খাঁর মনে। সে ভেবে উঠতে পারলো না, এখন তার কি কর্তব্য। এই সন্তানকে সুলতানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হবে। কিন্তু নিজের কাছেই বা রেখে দেয় কি করে! অনেক ভেবে স্থির করলো যে, সুলতানকে ব্যাপারটা জানানো উচিত। তারপর যা করবার সুলতানই করবেন।

ঘোড়ায় চেপে কিলা অর্ক্-এর দিকে রওনা হলো হামিদ খাঁ।

শহরের যে অঞ্চলে হামিদ খাঁ থাকে, সেখান থেকে কিলা অর্ক্-এর দিকে যেতে হলে ইব্রাহিম রওজা পেরিয়ে যেতে হয়। আজকের এত উৎসব হৈ-চৈ জনতার মধ্যেও এ অঞ্চলটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। বেগম তাজ সুলতানা এবং অন্যান্য সুলতান ও বেগমদের মখবরা আছে এখানে। তাই জনসাধারণ এ অঞ্চলের গাম্ভীর্য ও স্তব্ধতা ভঙ্গ হতে দেয়না কোনো উপলক্ষেই।

আধো-অন্ধকার পথে বড়ো বড়ো বৃক্ষের শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়ে পূর্ণিমার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ঘোড়ায় চেপে নাতিদ্রুত গতিতে পথ চলতে চলতে হামিদ খাঁ শুনতে পেলো রওজার ফোয়ারা ও পয়ঃপ্রণালীর জলের মৃদু কলতান আর মিনারেটের মর্মর-শৃঙ্খলগুলির সুরেলা টুংটাং শব্দ।

হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে ছুটে এলো দুজন অশ্বারোহী, উন্মুক্ত তরবারি হাতে আক্রমণ করলো হামিদ খাঁকে। সে প্রথমটা

বিপর্যস্ত হোলো তাদের আক্রমণে। কিন্তু সে সুদক্ষ যোদ্ধা। চোখের পলকে নিজের অসি কোষমুক্ত করে তাদের দুজনের তরবারির আঘাত একই সঙ্গে প্রতিহত করলো বিদ্যুৎগতিতে। তারপরই পাল্টা আঘাত করলো একজনকে। সে বাঁচাতে পারলো না নিজেকে। গুরুতর আহত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আরো কিছুক্ষণ অসি-চালনার পর অন্যজনকেও নিহত করতে সক্ষম হোলো হামিদ খাঁ। তারপর উন্মুক্ত তরবারি হাতে ঘোড়া থেকে নেমে আহত লোকটির কাছে গিয়ে ঝুকে পড়ে দেখলো হামিদ খাঁ।

চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার মুখের উপর। তাকে চিনতে পেরে চমকে উঠলো হামিদ খাঁ। বলে উঠলো, "মুল্লা লতিফ! তুমি?"

হামিদ খাঁ স্তম্ভিত হোলো। সে আর মুল্লা লতিফ সহকর্মী। হামিদ খাঁ সুলতানের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন পরামর্শদাতা, আর মুল্লা লতিফ সুলতানের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদলের দারোগা। সে কেন এই গোপন আততায়ীর ভূমিকায়?

মুল্লা লতিফ গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। প্রচুর রক্তস্রাব হচ্ছে পেট থেকে। চাঁদের আলোয় পাণ্ডুর দেখাচ্ছে তার মুখ। হামিদ খাঁ বুঝতে পারলো, মুল্লা লতিফের মৃত্যু আসন্ন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "মুল্লা লতিফ, বলো, কার নির্দেশে তুমি আমায় হত্যা করতে চেয়েছিলে?"

মুল্লা লতিফ অতিকষ্টে আস্তে আস্তে চক্ষু উন্মীলিত করলো, তারপর থেমে থেমে বললো, "আমায় মাফ কোরো হামিদ খাঁ। আমি হুকুম তামিল করবার চাকর। তুমি চলে যাও, বিজাপুর ছেড়ে চলে যাও, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও চলে যাও।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো হামিদ খাঁ।

মুল্লা লতিফ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো। সে জানেনা। জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, "ওরাও কেউ বেঁচে নেই। সবাইকে হত্যা করা হয়েছে।"

"ওরা? ওরা কারা? নাম কি ওদের—?"

মুল্লা লতিফের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। অতি কষ্টে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, "রাজিয়া, জিন্দান খাঁ,……আর……আর ……"

"আর কে?" অধৈর্য হয়ে উঠলো হামিদ খাঁ।

"বোধ হয় আয়েশাও, আমি জানি না। ওর তল্লাশ করা হচ্ছে। পালাও, হামিদ খাঁ, তুমি পালাও……"

হঠাৎ ওর মাথাটা এক পাশে ঢলে পড়লো!

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো হামিদ খাঁ। বুঝতে পারলো সব। কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখের ভাব। অসি কোষবদ্ধ করে চড়ে বসলো ঘোড়ার পিঠে। কিলা অর্ক্-এর দিকে আর গেল না। ফিরে চললো নিজের মঞ্জিলের দিকে।

সেদিন রাত্রেই আয়েশাবানু আর ওই শিশুকে নিয়ে গোপনে বিজাপুর ছেড়ে চলে গেল হামিদ খাঁ। আনন্দ উৎসব উপলক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী নগরপ্রাচীরের প্রত্যেকটি দর্ওয়াজাই উন্মুক্ত ছিলো। সবার দৃষ্টির অলক্ষ্যে রাজধানীর বাইরে চলে যেতে কোনো অসুবিধে হোলো না।

কেউ জানলো না, সে চলে গেল কোথায়।

উজীর খাঁ-মহম্মদ খবর পেয়েছিলো শেষ রাত্রেই।

তার রক্তচক্ষুর সামনে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে ছিলো তার খাস হরকরা, খোজা সিদ্দি হানিফ।

খাঁ-মহম্মদ গজরাচ্ছিলো নিজের মনে। "এতক্ষণ চোখে চোখে রাখবার পরও সে তোমার চোখে ধুলো দিয়ে গা-ঢাকা দিতে পারলো? সে বেরোলো কোন দরওয়াজা দিয়ে?"

"দক্ষিণের মঙ্গলি দরওয়াজা দিয়ে।"

"ফিরিঙ্গি বুর্জ থেকে কাউকে ডেকে নিতে পারলে না?"

"কাউকে ডাকার দরকার হোতো না, আমি একাই তাকে আটকে ফেলতে পারতাম—"

"তুমি ওকে চেনো না হানিফ। তোমার মতো দশজনও পারতো না। আমি বার বার বলেছিলাম, ও যেন শহর ছেড়ে চলে যেতে না পারে। তোমার অসাবধানতার জন্যে এরকম হোলো।"

"আমি কি করবো? আমার ঘোড়া যদি অন্ধকারে গর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না যেতো, হামিদ খাঁ কিছুতেই আমার দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেতে সক্ষম হোতো না——"

"যাক, কি হলে কি হোতো সে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই," কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলো খাঁ-মহম্মদ, "এখন যেমন করেই হোক খবর নাও সে কোথায় গেছে। ব্যাপারটা কি, আমার জানা দরকার।"

তারপর নিজের মনে বলে গেল, "আমি বুঝতে পারছি না, কিছুতেই বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার। সুলতানের পুত্রসন্তানের জন্মসংবাদ আমায় জানাতে এত দেরি হোলো কেন? কেন এত কড়া পাহারা ছিলো খাসমহলে? খাদিমদের মহলে হামিদ খাঁর কি দরকার ছিলো? তুমি সত্যি বলছো তুমি মহলের ভিতর পর্যন্ত যেতে পারো নি?"

"আমায় বিশ্বাস করুন মালিক," সিদ্দি হানিফ বললো, "হামিদ খাঁ যে হঠাৎ কোথায় ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল খাদিমদের মহল থেকে, আমি টেরই পেলাম না।"

উজীর খাঁ-মহম্মদ জানতো না যে সিদ্দি হানিফ মিথ্যে কথা বলছে। সে সব কিছু জেনেছিলো, সব কিছু বুঝেছিলো,—কিন্তু অতি বিচক্ষণ সে, রাজ্যের রাজনীতির হাওয়া সে বোঝে। অনেক ভেবে স্থির করেছিলো উপস্থিত কাউকে কিছু না জানানোই বাঞ্ছনীয়। কে জানে, এ গোপন তথ্য সে জানে বলেই ভবিষ্যতে

একদিন তার ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু তার আগে হামিদ খাঁর সন্ধান পাওয়া প্রয়োজন।

"আমি জানতে চাই," খাঁ-মহম্মদ নিজের মনেই বললো, এক সামান্য পরস্তারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় হামিদ খাঁর উপস্থিত থাকার কি প্রয়োজন ছিলো? তার মৃত শিশুপুত্রটিকেই বা গোর দেওয়া হোলো না কেন? তাকে নিয়ে নিজের মঞ্জিলে কেন চলে গেল হামিদ-খাঁ? আয়েশাবানুর মতো একজন সাধারণ খাদিমান কেন তার সঙ্গে ছিলো? আর হিন্দু সন্ন্যাসীর পোশাক পরা লোকটা কে?—এসব সন্ধান তোমায় করতে হবে হানিফ। অবিলম্বে আমার সংবাদ চাই।"

মোগল দাক্ষিণাত্যের সুবাদার বিংশতিবর্ষীয় তরুণ শাহজাদা আওরংজেব সে সময় আওরঙ্গাবাদে। বিজাপুরে কয়েকজন হরকরা নিযুক্ত করেছিলো শাহজাদা, তাদের মারফতে নানারকম খবর এলো তার কাছে। মির আতাউল্লা ছিলো আওরংজেবের অন্তরঙ্গ উপদেষ্টা, তাকে নিজের মজলিসে ডেকে পরামর্শ করতে লাগলো শাহজাদা।

"আমার মনে হচ্ছে এ একটা সাধারণ খাসমহলের গুজব," আতাউল্লা বললো।

"গুজবেরও একটা হেতু থাকে", শাহজাদা উত্তর দিলো।

"কিন্তু সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ নিজে বড়ী সাহিবার সামনে কোরান ছুঁয়ে শপথ করেছে যে আলি তাঁরই সন্তান।

"তাতে কি? মিথ্যাভাষণের অপরাধে সে দোজখ্-বাস করবে মৃত্যুর পর, জীবদ্দশায় তো তার রাজত্ব করার কোনো বিঘ্ন হবে না, তার মৃত্যুর পরও বিজাপুরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু তাতে তো আমাদের চলবে না। তামাম দাক্ষিণাত্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত না হলে আমাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত।"

"কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা," আতাউল্লা বলে উঠলো, "নিজের সন্তানকে সরিয়ে আরেকটি শিশুকে সেখানে আনা হবে কেন? এযে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!"

"যদি বড়ী সাহেবার আসলে কন্যা সন্তান হয়ে থাকে? সুলতানের তো প্রয়োজন পুত্রসন্তানের।"

"তাই বলে এক অজ্ঞাত কুলশীল শিশুকে নিজের বলে চালিয়ে দেওয়া হবে?"

"মির আতাউল্লা, এর নাম রাজনীতি।"

"কিন্তু এ গুজব তো বড়ী সাহেবাও বিশ্বাস করেন না। তিনি মহান, ধর্মপ্রাণ মহিলা, এরকম একটা মিথ্যার মধ্যে তিনি থাকবেন বলে আমার মনে হয় না।"

"আমারও তো খটকা সেখানে," আওরংজেব বললো, "আমার প্রশ্ন হোলো এই,—আমি যা শুনেছি, খাসমহলে জোর গুজব, সন্তান বদল হয়েছে। কেন এই গুজব? না, সাকিনা বিবি নামে এক ধাত্রীর মুখ থেকে শোনা গেছে, যে শিশুর প্রসব করানো হয়েছে, তার বুকে জড়ুল ছিলো, যে রকম আছে সুলতানের বুকে। কিন্তু এই শিশু আলির বুকে কোনো জড়ুল নেই। কোথায় গেল সেই চিহ্ন?"

"সামান্য এক ধাত্রীর কথায় গুরুত্ব দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না," উত্তর দিলো মির আতাউল্লা, "সে হয়তো ভুল করেছে। তা ছাড়া, মেয়েমহলের. গুজব, এসব কথায় কান দিয়ে কি আমাদের কূটনীতি নির্ধারণ করতে হবে?"

আওরংজেবের মুখ লাল হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আপনি আমায় একথা বলুন, বিজাপুরের হাকিম-ই-আলা জিন্দান খাঁ হঠাৎ তার পরদিনই আততায়ীর হাতে নিহত হোলো কেন? প্রধানা ধাত্রী রাজিয়া বিবিকেই বা কোনো অজ্ঞাত আততায়ী গলা টিপে হত্যা করলো কেন? তারপর, মহলের খাদিমান

আয়েশা আর সুলতানের প্রিয়পাত্র হামিদ খাঁ নিখোঁজ হয়ে গেল কেন? তাদের সঙ্গে একটি শিশু ছিলো। সেটি পুত্রসন্তান না কন্যা?”

কথা বলতে বলতে আওরংজেব ঝরোকার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে, তারপর হঠাৎ এদিকে ফিরে বলে উঠলো, “মির আতাউল্লা, হরকরাদের দারোগাকে ডেকে বলুন, ওই হানিফ খাঁর সন্ধান আমার চাই। তা নইলে এ রহস্যের সমাধান হবে না।”

শাহজাদা আর অপেক্ষা করলো না, বেরিয়ে চলে গেল মজলিস-কক্ষ থেকে।

আওরংজেবের প্রথমা পত্নী দিলরস-বানু বেগম সেদিন লক্ষ্য করলো যে, শাহজাদা অন্যান্য দিনের থেকে আজ একটু বেশীরকম গম্ভীর। প্রথমা কন্যা জেব-উন-নিসার বয়েস তখন অল্প কয়েকমাস। তাকে কোলে করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন খাদিমান। কিন্তু শাহজাদা সেদিকে ফিরেও তাকালো না।

“আলিজাকে আজ একটু বেশী রকম চিন্তান্বিত দেখছি,” দিলরস-বানু জিজ্ঞেস করলো, “কি অতো ভাবছেন?”

আওরংজেব ফিরে তাকালো পত্নীর দিকে। অর্ধনিমীলিত নয়নে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর খুব মৃদুকণ্ঠে বললো, “আগ্রায় আলা হজরত শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র কাছে একটা জরুরী নিশান পাঠাতে হবে। মনে মনে তার খসড়া করছি। মুন্সিকে দিয়ে লেখাতে পারবো না। অত্যন্ত গোপনীয়। আমাকে নিজের হাতেই লিখতে হবে।”

“কি ব্যাপার আলিজা?”

আওরংজেব সাধারণত মহলের কারো সঙ্গে রাজনৈতিক বা শাসনকার্য সংক্রান্ত কোনো আলোচনা করতো না। কিন্তু আজ

মনে হোলো মন তার খুব প্রসন্ন। বললো, "আলা হজরতকে আশ্বস্ত করে জানাতে হবে যে, কেন আমরা আলিকে সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্র উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করবো না—তার যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া গেছে। এই আলি সুলতানের সন্তান নয়, এ এক অজ্ঞাতকুলশীল শিশু, যাকে মিথ্যা পরিচয়ে মহলে প্রতিপালিত করা হচ্ছে। বিজাপুর রাজ্য একদিন না একদিন আমাদের দখলে আসবেই।"

কেটে গেল আরো কয়েক বছর।

হামিদ খাঁ, আয়েশা বিবি, কি সেই রহস্যময় শিশু, কারো কোনো সন্ধান কেউ করতে পারলো না,—আওরংজেবও না, বিজাপুরের উজীর খাঁ-মহম্মদও না। ষোলো শো চুয়াল্লিশের প্রথম দিকে আওরংজেব আগ্রা রওনা হোলো দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধা ভগ্নী জাহান্-আরাকে দেখতে। সেবার আর দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসা হোলো না। আওরংজেবের উপর রুষ্ট হয়ে বাদশাহ শাহ জাহান তাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের পদ থেকে অপসারিত করলো।

তারপর,—গুজরাট, মুলতান প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় সুবাদারের পদ অলঙ্কৃত করে, কান্দাহারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, শাহজাদা আওরংজেব আবার যখন দাক্ষিণাত্যে সুবাদার হয়ে ফিরে এলো, তখন আরো অনেক বছর কেটে গেছে।

॥ এক ॥

ষোলো শো ছাপ্পান্ন খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন অপরাহ্ন বেলা মুসম্মন বুর্জ্-এর প্রশস্ত অলিন্দে "সুখশয্যার" উপর সমাসীন হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস অনুযায়ী অবসর বিনোদন করছিলো বাদশাহ শাহ জাহান। দূরে যমুনার পাড়ে শুভ্র তাজমহলের মর্মর গম্বুজের উপর ঈষৎ গোলাপী বর্ণচ্ছটা বিকীর্ণ করে দিয়েছে অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখা। কাছে বসে শাহ-ই-আলিজা দারা শিকো আর গুলদশ্তা শাহজাদী জাহান-আরা গাম্ভীর্যের সঙ্গে বাক্যালাপে নিমগ্ন। কিন্তু তাদের কথোপ-কথনে মন দেয়নি বাদশাহ। নীরবে আনমনে তাকিয়েছিলো সুদূর তাজমহলের দিকে।

"আমার মনে হয়," দারা বলছিলো জাহান-আরাকে, "আওরং-জেবকে এখনই কড়া নির্দেশ দেওয়া উচিত, সে যেন বিজাপুরের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে। আওরঙ্গাবাদে এই মর্মে একটা শাহী ফরমান প্রেরণই বাঞ্ছনীয়। আলা হজরত কি বলেন," বলে দারা তাকালো শাহ জাহানের দিকে।

কথাটা বাদশার শ্রুতিগোচর হোলো। দারার দিকে ফিরে তাকিয়ে উত্তর দিলো, "গোলকুণ্ডার ব্যাপারে আওরংজেবের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আমার মনে হয় না, আমাকে না জানিয়ে সে বিজাপুর সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। সে জানে যে, সুলতান মহম্মদ আদিল শাহকে আমরা আমাদের বন্ধু মনে করি। বিজাপুর রাজ্যের সঙ্গে আমাদের সম্প্রীতি কোনোদিন ক্ষুণ্ণ হয়নি।"

"কিন্তু গোলকুণ্ডাও তো আমাদের মিত্র রাজ্য। আওরংজেব আপনাকে না জানিয়েই গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেছিলো।"

"সেই অনুচিত কার্যের জন্যে আমি তাকে ভর্ৎসনা করেছি, আমারই নির্দেশে সে গোলকুণ্ডা অবরোধ তুলে নিয়ে আওরঙ্গাবাদে ফিরে এসেছিলো। তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাকে না জানিয়ে আমার নির্দেশ অমান্য করে মির জুমলার পুত্র মহম্মদ আমিনকে সপরিবারে কয়েদ করে গোলকুণ্ডার কুতুব-উল-মুল্‌ক অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলো। গোলকুণ্ডার সঙ্গে এই যুদ্ধে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইনি। এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছি, আর পেয়েছি রামগির পরগণা।"

"লাভবান যদি কেউ হয়ে থাকে," জাহান-আরা বললো, "আওরংজেবই হয়েছে, আর কেউ নয়। হায়দরাবাদ লুণ্ঠন করে যে ঐশ্বর্য তার হাতে এসেছে তার বৃত্তান্ত তো গোলকুণ্ডার উকিলের কাছে শুনেছেন।"

"আওরংজেব তো সেকথা অস্বীকার করছে," উত্তর দিলো শাহ জাহান।

"সে তো অস্বীকার করবেই," দারা শিকো বলে উঠলো, "কিন্তু আমাদের হরকরাদের মারফত যে গোপন সংবাদ এসেছে সে সব কথা আমরা অবিশ্বাস করি কি করে?"

"অবিশ্বাস তো করতে বলছি না। সে জন্যেই তো গোলকুণ্ডার কাছ থেকে যে ক্ষতিপূরণ আমরা পেয়েছি, সেটা জমা করে নিয়েছি দৌলতাবাদের খাজিনাহ্‌তে। শুনেছি এ যুদ্ধের আয়োজন করতে আওরংজেবের কুড়ি লক্ষ টাকা ঋণ হয়েছে। সে যদি হায়দরাবাদ লুণ্ঠন করে কিছু পেয়ে থাকে, তা দিয়ে এই ঋণ শোধ করুক।"

জাহান-আরা হাসলো, বললো, "আমার মনে হয়না আমাদের প্রিয় ভ্রাতা নিজের অর্থ দিয়ে মোগল সরকারের ঋণ শোধ করবে।"

"সে তো আলা হজরতের কাছে সে কথাই লিখেছে," দারা উত্তেজিত হয়ে উঠলো, "সে চায় এই ঋণ দৌলতাবাদের খাজিনাহ্ থেকে মিটিয়ে দেওয়া হোক।"

শাহ জাহান একটু বিরক্তির সঙ্গে বললো, "আজ তিন বছর ধরে সে আমার কাছে সব সময় অর্থসাহায্য প্রার্থনা করছে। দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব থেকেই ওখানকার শাসনকার্যের ব্যয় সংকুলান হওয়া উচিত ছিলো। আমি বুঝি না ওর উদ্দেশ্যটা কি।"

"বুঝতে চাইলে বোঝা কঠিন নয়," দারা শিকো উত্তর দিলো অভিমানের স্বরে। "সে শক্তিশালী হতে চায়। সে গড়ে তুলতে চায় এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী। তার জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এজন্যেই বিজাপুর আর গোলকুণ্ডার উপর তার এতখানি নজর।"

দারার কথা শুনে শাহ জাহান একটু হাসলো। তার এই তুই সন্তান একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করে না। সামান্য সামান্য ব্যাপারেও একজন আরেকজনের উপর তুরভিসন্ধি আরোপ করে। এসবে মনে অত্যন্ত কষ্ট পায় বাদশাহ, কিন্তু কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হোক এটা চায় না, যতোদূর সম্ভব তুজনের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। তাড়াতাড়ি এই প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্যে বললো, "যাই হোক, গোলকুণ্ডার সঙ্গে বিরোধের একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। আর এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা নিরর্থক। আমি কয়েকদিনের মধ্যেই ফরমান পাঠাবো আওরংজেবের কাছে, যেন বিজাপুর সম্বন্ধে সে এমন কোনো নীতি গ্রহণ না করে যাতে বিজাপুর রাজ্যের সঙ্গে আমাদের সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তবে এই ব্যাপারে আমাদের উজীর মির জুমলার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নেওয়া প্রয়োজন।"

বাদশাহ্‌র কথা শুনে জাহান-আরা দারার দিকে তাকালো।

মাস চারেক হোলো উজীর এবং ছয়-হাজারী মনসবদার নিযুক্ত হয়েছে মির জুমলা। শাহজাদা আওরংজেবের প্রতি তার যে পক্ষপাতিত্ব খুব বেশী একথা কারোই অজানা নয়। এজন্যে তার নিয়োগে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলো দারা শিকো। কিন্তু তার আপত্তি বাদশাহ গ্রাহ্য করেনি। রাজ্য পরিচালনার জন্যে, বিশেষ করে যে সময় শাহজাদাদের মধ্যে এত বিদ্বেষ ও রেশারেশি, তখন একজন শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান উজীরের অত্যন্ত প্রয়োজন। সে সময় তামাম হিন্দুস্তান ও দাক্ষিণাত্যে গোলকুণ্ডার উজীর মির জুমলার মতো বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ আর কেউ ছিলো না। তাই তাকেই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলো বাদশাহ শাহ জাহান।

দারা শিকো একটু চুপ করে থেকে বললো, "আমার মনে হয় আলা হজরত শাহ-ইন-শাহ নিজের সন্তানকে যে পত্র লিখবেন, সে বিষয়ে মির জুমলার সঙ্গে কোনো আলোচনা না করাই বাঞ্ছনীয়। উনি রাজ্য পরিচালনার জন্যেই উজীর নিযুক্ত হয়েছেন, আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে নয়।"

"হিন্দুস্তানের বাদশাহ দক্কান সুবার সুবাদারের কাছে ফরমান পাঠাবে," শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলো শাহ জাহান, "সুতরাং এ ব্যাপারে হুকুমতের উজীরের সলাহ্ নেওয়া প্রয়োজন।"

দারার কান দুটো লাল হয়ে গেল, কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।

জাহান-আরা দারাকে আশ্বস্ত করার জন্যে বলে উঠলো, "উজীরের পরামর্শ নেওয়া নিশ্চয়ই উচিত। আলা হজরত ঠিকই বলেছেন। মির জুমলা উজীরের পদে সম্প্রতি নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁকে অবজ্ঞা করে কোনো গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন হবে না, বিশেষ করে তিনি যখন দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারে

খুবই ওয়াকিবহাল। তবে উজীর যা পরামর্শ দেবেন, শাহ্-ইন-শাহ বাদশাহ তো সে অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য নন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তিনি নিজে।"

"তা তো বটেই," সায় দিলো শাহ জাহান।

দারা শান্ত হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় মহলদার এসে জানালো—ছোটী বেগমসাহিবা শাহ-ইন-শাহ্‌র পাক কদমে তসলিম জানাতে অভিলাষী।

আসবার অনুমতি পেয়ে একটু পরে সেখানে উপনীত হলো শাহজাদী রোশন-আরা। বাদশাহ্‌র কুশল প্রশ্ন করে সে বসে পড়লো গালিচার একপাশে। তারপর একটি ছোটো মখমলের পেটিকা খুলে শাহ জাহানের হাতে দিয়ে বললো, "উজীর মির জুমলা আজ আমার কাছে এটি উপহার পাঠিয়েছেন।"

"বেশ বড়ো হীরা। কতো ওজন হবে এর?"

"একশো রতি। ভাবছি একটি গল্‌বন্দ্‌ তৈরী করিয়ে নেবো।"

দারা আড়চোখে তাকালো হীরকখণ্ডের দিকে। তারপর জাহান-আরাকে বললো, "আওরংজেব লোক চেনে। তা নইলে এত লোক থাকতে মির জুমলার জন্যে সুপারিশ করে পাঠিয়েছিলো আলা হজরতের কাছে?"

রোশন-আরা বক্র কটাক্ষ করলো দারার দিকে। কিন্তু শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো, "মির জুমলা যে উপযুক্ত ব্যক্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খুব ঐশ্বর্যশালী না হলে হিন্দুস্তানের উজীরের পদে কাউকে নিয়োগ করা ঠিক নয় বলেই জানা গেছে আমাদের এতদিনকার অভিজ্ঞতায়। পূর্বতন উজীর আসফ খাঁ, সাদুল্লা খাঁ, প্রত্যেকেই যে উৎকোচ নিতেন একথা কে না জানে? কিন্তু মির জুমলার সেই প্রবৃত্তি নেই। যার এত ঐশ্বর্য, যার ভাণ্ডারে শুধু হীরেই আছে বিশ মণ, যে গোলকুণ্ডার এতগুলি হীরের খনির মালিক, তার উৎকোচ গ্রহণের প্রয়োজন কি?"

"হ্যাঁ, উৎকোচ সে দেবে। নেবে কেন?" একটু হেসে বললো জাহান-আরা। শাহ জাহান আর দারা তুজনেই হাসলো জাহান-আরার কথা শুনে। রোশন-আরার হাতে হীরে ফিরিয়ে দিলো শাহ জাহান।

রোশন-আরা ঈষৎ অধরদংশন করলো। তারপর বললো, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না জাহান-আরা কি বলতে চাইছে। আলা হজরত, মির জুমলা দিল্লীতে এসে আপনাকে পনেরো লক্ষ টাকা মূল্যের মহার্ঘ উপহার আর তুশো ষোলো রতির এক হীরে দিয়েছিলেন। আপনি কি সে জন্যেই তাঁকে ছয়-হাজারী মনসবদার ও উজীর নিযুক্ত করেছেন?"

"আলা হজরতকে এ প্রশ্ন করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত ধৃষ্টতা," বলে উঠলো দারা শিকো।

শাহ জাহান হেসে সহজ করে দিতে চাইলো ব্যাপারটা। বললো, "তোমরা কি তোমাদের পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছো? না কি দর্শন করতে এসেছো শাহ-ইন-শাহ বাদশাহকে? সামান্য সামান্য কথায় সর্বক্ষণ একজন আরেকজনকে তমিজী আর সুহ্‌বৎ শিক্ষা দিলে তো অবিচার করা হয় আমার উপর।"

দারা, রোশন-আরা ও জাহান-আরা খানদানী ভাষায় রীতিমাফিক মার্জনা চাইলো শাহ জাহানের কাছে। শাহ জাহান হাসতে হাসতে রোশন-আরাকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার প্রিয় ভ্রাতা আওরংজেবের কি খবর? গোলকুণ্ডা থেকে যে অর্থ ক্ষতিপূরণ পেয়েছি সেটা তাকে না দিয়ে দৌলতাবাদের খাজিনাহ্‌তে জমা দেওয়ার হুকুম দিয়েছি বলে সে তো আর রাগ করে ইদানীং কোনো নিশান লেখেনি আমার কাছে।"

"আওরংজেব আমাদের সবারই প্রিয় ভ্রাতা, আলা হজরত। সে যে কী কঠিন অবস্থার মধ্যে আছে সে কথা কেউই বুঝে দেখতে চায় না। উজীর মির জুমলা কিছু কিছু বোঝেন।

কিন্তু আমাদের কোনো ব্যাপারে তিনি কিছু বলতে চান না বলে নীরব থাকেন। তিন-চারদিন আগে আমি আওরংজেবের কাছ থেকে একটা নিশান পেয়েছি।"

"তাই নাকি ? ওর কি খবর ?" দারা জিজ্ঞেস করলো।

"নিশানে বিশেষ কিছুই লেখেনি, শুধু নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা-দের কুশল জানিয়েছে, আমাদের কুশল জানতে চেয়েছে। আর হ্যাঁ, একটা খবর দিয়েছে। বিজাপুরের উকীল সর্দার ইকবাল খাঁ নাকি একবার কথায় কথায় জানতে চেয়েছিলেন সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র পুত্র আলির সঙ্গে আওরংজেবের দ্বিতীয়া কন্যা জিনত-উন-নিসার বিবাহের প্রস্তাব উঠলে আওরংজেব সে প্রস্তাব আলা হজরতের অনুমোদনের জন্যে পেশ করতে রাজী হবেন কিনা।"

"এ সম্বন্ধ তো খুবই বাঞ্ছনীয়," বলে উঠলো দারা শিকো।

রোশন-আরা তাকালো দারার দিকে, কিন্তু ওর কথার কোনো উত্তর দিলো না। শাহ জাহানের দিকে ফিরে বলে গেল, "আওরং-জেব সর্দার ইকবাল খাঁকে উত্তর দিয়েছে যে, হিন্দুস্তানের শাহজাদার কন্যার বিবাহ হতে পারে শুধু শাহী খানদানে আর কোথাও নয়।"

"এভাবে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হয়নি," জাহান-আরা বললো।

"আওরংজেব তো আলিকে মহম্মদ আদিল শাহ্‌র সন্তান বলে স্বীকার করে না," আস্তে আস্তে বললো রোশন-আরা।

"আওরংজেবের নিজস্ব অভিমত যাই হোক, আলি একটি স্বাধীন রাজ্যের তখ্‌ত্‌-এর ওয়ারিশ," বলে উঠলো দারা, "কন্যার বিবাহের ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার আওরংজেবের আছে, কিন্তু তার ভাষা শিষ্টাচারসম্মত হওয়া উচিত ছিলো। বিজাপুর আমাদের মিত্ররাজ্য, আপনিই বলুন আলা হজরত, আমাদের একজন সুবাদার যদি এক মিত্ররাজ্যের

তখ্‌ত্‌-এর ওয়ারিশ সম্বন্ধে এরকম অপমানজনক মন্তব্য করেন, তাহলে কতো জটিলতা এসে যায় বিজাপুর ও হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্কে ?”

“আমি অতো রাজনীতি বুঝি না,” রোশন-আরা উত্তর দিলো মুখ ঘুরিয়ে, “আমি শুধু একটু জানি যে আওরংজেব কোনো-দিন তৈমুর বংশের কোনো অসম্মান হতে দেবে না।”

“এই প্রস্তাবে তৈমুর বংশের প্রতি অসম্মানের কি আছে ?” খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে দারা জিজ্ঞেস করলো।

“আওরংজেব যখন জোর গলায় বলছে আলি সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র সন্তান নয়, তখন নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ আছে,” রোশন-আরা বললো, “আমি আমার ভায়ের কথা বিশ্বাস করবো না ?”

“কারণ নিশ্চয়ই আছে,” বলে উঠলো দারা, “কিন্তু সেই কারণটা আর কিছু নয়, শুধু আওরংজেবের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির একটা চাল। মহম্মদ আদিল শাহ আর বড়ী সাহিবা, দুজনেই যখন একবাক্যে বলছেন আলি তাঁদেরই সন্তান, তখন আওরংজেব সে কথা স্বীকার না করবার কে ? কাল যদি আওরংজেব বলে সুলেমান কি সিপিহ্‌র্‌ আমার ছেলে নয়, ওর সে কথা মেনে নিতে হবে ?”

“আওরংজেবের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে ওকে অনেকে ভুল বোঝে,” খানিকটা উষ্মার সঙ্গে রোশন-আরা উত্তর দিলো, “সে শাহজাদা হয়ে জন্মেছে বটে কিন্তু মনে প্রাণে সে ফকির। রাজনীতিতে তার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। রিয়াসতের স্বার্থই তার স্বার্থ, সে যা করে মোগল সাম্রাজ্যের স্বার্থেই করে। ওর বিচারবুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আমার আছে।”

শাহ জাহানের মুখ বেদনায় একটু ম্লান হোলো। সন্তানদের মধ্যে এই বিদ্বেষ রেষারেষি তাকে চিরকালই ব্যথা দেয়। আস্তে

আস্তে বললো, "বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না রোশন-আরা। ওর উপর বিশ্বাস না থাকলে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার ওর উপর আমি দিতাম না। তবে বিজাপুরের উকিল সর্দার ইকবাল খাঁকে ওকথা তার বলা উচিত হয়নি। কয়েক মাস আগে যখন গোলকুণ্ডার কুত্ ব্-উল-মুল্ক্এর দ্বিতীয়া কন্যার সঙ্গে আওরংজেব তার জ্যেষ্ঠ সন্তান মহম্মদ সুলতানের বিয়ে দিয়ে গোলকুণ্ডার সঙ্গে একটা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছে, তখন বিজাপুরের উকীলকে ওরকম একটা রূঢ় উত্তর দেওয়া তার অন্যায় হয়েছে। কোনো উত্তর দেওয়ার আগে আমাকে জানানো উচিত ছিলো।"

রোশন-আরা বললো, "আওরংজেব লিখেছে, এরকম নাকি সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে, বিজাপুরের সুলতান সিদ্দি মর্জন্-এর নেতৃত্বে বিজাপুরী সৈন্যবাহিনীকে সুসজ্জিত করছে। আমরা যদি আমাদের ফৌজ তৈরী না রাখি ভবিষ্যতে মুশকিলে পড়তে হবে।"

"বাঃ," বলে উঠলো জাহান-আরা, "আওরংজেব নিশান লিখতে জানে বটে।"

রোশন-আরা তার কথায় কর্ণপাত না করে বলে গেল, "কিন্তু গোলকুণ্ডার সঙ্গে বিরোধের পর এখন ওর এত অর্থাভাব হয়েছে যে সে কি করবে কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছে না। সে লিখেছে আলা হজরত তো ওর কথা কানে তুলতে চান না, তাই সে এ বিষয় নিয়ে আপনাকে আর বিব্রত করবে না ঠিক করেছে, তবে আমি যদি ইচ্ছে করি, ওর হয়ে বলতে পারি আপনাকে। কিন্তু, আমি আর কি বলবো। খবরটা আপনাকে জানানোর ছিলো—তাই জানালাম।"

শাহ জাহানের ভুরু কুঞ্চিত হোলো। জিজ্ঞেস করলো, "বিজাপুরের সুলতান তার ফৌজ সুসজ্জিত করছে?"

দারা শিকো হেসে বললো, "তা হলে তো আওরংজেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। সে তো তাই চায়।"

রোশন-আরার মুখ লাল হয়ে গেল। সে দারার কথার একটা

উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, এমন সময় মহলদার এসে জানালো,—জরুরী সংবাদ পাঠিয়েছে আওরঙ্গাবাদের সওয়ানি-নিগার, আর সেই সঙ্গে এসেছে শাহজাদা আওরংজেবের অর্জ-দশ্ত। দারোগা-ই-সওয়ানিহ্ সেগুলো উজীরের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন শাহ-ইন-শাহ্‌র কাছে। আর বলে পাঠিয়েছেন, শাহ-ইন-শাহ যদি জরুরী মনে করেন, ইত্তলা পাওয়া মাত্রেই মির জুমলা বাদশাহ্‌র দিওয়ানে হাজির হবেন।

"কে এসেছে ওগুলো নিয়ে?" জিজ্ঞেস করলো শাহ জাহান্।

"মুশরিফ-ই-খওয়াস্ খোজা মনস্থর খোদ নিজে এসেছেন।"

বাদশাহ্‌র অনুমতি পেয়ে মহলদার খোজা মনস্থরকে সেখানে নিয়ে এলো। সে কুর্নিস করে চিঠি দুটো দিলো মহলদারের হাতে। মহলদার চিঠি দুটো বাদশাহ্‌র হাতে তুলে দিলো।

চিঠি দুটো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলো শাহ জাহান। পড়তে পড়তে মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে গেল। কুঞ্চিত হোলো ভ্রূযুগল। বাইরের দিকে তাকিয়ে একটু ভাবলো, তারপর মহলদারকে বললো, "ওকে জানাও, ও এখন চলে যেতে পারে। উজীর মির জুমলাকে আর এখন প্রয়োজন হবে না। কাল মধ্যাহ্নে দিওয়ান-ই-খাস্এ এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা যাবে।"

তসলিম করে চলে গেল খোজা মনস্থর।

শাহ জাহান চুপ করে বসেছিলো নির্বাক হয়ে। চোখে চিন্তার ছায়া।

দারা, জাহান-আরা ও রোশন-আরাও চুপ করে বসে রইলো। তাদের মনেও প্রচণ্ড কৌতূহল, কিন্তু মুখ ফুটে সেটা প্রকাশ করতে পারছিলো না।

কিছুক্ষণ পরে রোশন-আরা বললো, "একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আওরংজেব তার নিশানে একথাও জানিয়েছে যে, সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ গুরুতর অসুস্থ।"

শাহ জাহান ফিরে তাকালো পুত্রকন্যাদের দিকে, তারপর আস্তে আস্তে জানালো, "সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র মৃত্যু হয়েছে একপক্ষকাল আগে। আওরঙ্গাবাদ থেকে এ খবরটাই এসেছে। বিজাপুরের তখ্‌ত্‌-এ বসেছে মহম্মদ আদিল শাহ্‌র অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র আলি আদিল শাহ।"

"মহম্মদ আদিল শাহ্‌র মৃত্যু হয়েছে!" দারা বলে উঠলো, "খুব মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন তিনি। আজ আঠারো বছর ধরে তিনি আলা হজরতের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখেছেন, অর্বাচীন ব্যক্তিদের নিরলস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দুস্তান ও বিজাপুরের সম্পর্কের অবনতি হতে দেননি," বলে আড়চোখে তাকালো রোশন-আরার দিকে।

"ব্যক্তিগত ভাবে মহম্মদ আদিল শাহ্‌র সম্বন্ধে কারো কিছু বলার নেই," বললো রোশন-আরা, "কিন্তু রাজনীতিতে কে অর্বাচীন কে দূরদর্শী, সেকথা এখন আলোচনা করে লাভ নেই। সেটা লিপিবদ্ধ থাকবে ভবিষ্যতের ইতিহাসে।"

জাহান-আরা জিজ্ঞেস করলো, "আওরংজেব নিশ্চয়ই তার অর্জ্‌-দশ্‌ত্‌এ মহম্মদ আদিল শাহ্‌র মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেছে।"

"না—একেবারেই না," একটু হাসলো শাহ জাহান, "সে জানিয়েছে—মহম্মদ আদিল শাহ্‌র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কিরকম গৃহবিবাদ শুরু হয়েছে রাজ্যের ভিতরে। রাজ্যের বেশির ভাগ সর্দারেরা উজীর খাঁ-মহম্মদ ও বড়ী সাহিবার বিরুদ্ধাচরণ করছে। আলি আদিল শাহ অতি দুর্বলচিত্ত ও অযোগ্য। তার উপর অনেক সর্দারের আস্থা নেই। তার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু বড়ী সাহেবা এবং খাঁ-মহম্মদ সর্দারদের সমর্থনের অপেক্ষা না রেখেই আলিকে মসনদে বসিয়েছে। আওরংজেবের বক্তব্য এই যে, এবার বিজাপুরে ঘোর অরাজকতা শুরু হবে। বড়ী সাহিবা, খাঁ-মহম্মদ এবং আলি আদিল শাহ অত্যন্ত মোগল বিদ্বেষী। দেশের

অরাজক অবস্থায় প্রজাসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি না হয়ে যাতে ওদের মন অন্য সমস্যায় বিব্রত থাকে সেজন্যে বড়ী সাহিবা ও খাঁ-মহম্মদ সিদ্দি মরজনের সহায়তায় মোগল সীমান্তে ব্যাপক হামলা শুরু করার পরিকল্পনা করেছে। মোগল-দাক্ষিণাত্যের নিরাপত্তার জন্যে মোগল ফৌজকে যে কোনো পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত রাখা দরকার। তা নইলে এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে রাজস্বের আদায় আরো কমে যাবে।"

"এবং গোলকুণ্ডাও এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারে," বলে উঠলো রোশন-আরা।

"কিন্তু এসব কথা তো আওরংজেবের। হুকুমতের সওয়ানি-নিগারেরা যতোক্ষণ বিস্তারিত বিবরণ না পাঠাচ্ছে, ততোক্ষণ কি আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে?" দারা জিজ্ঞেস করলো।

"তৈমুর বংশের এক শাহজাদার জবান যাচাই করবার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সওয়ানি-নিগারের সংবাদের জন্যে?" মুখ লাল করে রোশন-আরা জিজ্ঞেস করলো।

"যাই হোক, বিজাপুর একটা স্বাধীন রাজ্য," বললো জাহান-আরা, "বিজাপুরের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কি অন্যায় নয়?"

"এই প্রশ্ন আওরংজেব উল্লেখ করেছে তার অর্জ্-দশ্ত্-এ," জানালো শাহ জাহান, "এবং উত্তরও দিয়েছে। সে বলছে, প্রতি-বেশী মিত্ররাজ্যের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে আমাদের হস্তক্ষেপ করা তখনই অন্যায় নয়, যখন প্রতিবেশী রাজ্যের মৃত অধিপতির সর্বজনস্বীকৃত বৈধ উত্তরাধিকারী না থাকে। তখন হস্তক্ষেপ না করলে আমাদের শত্রুরা তার সুযোগ নেবে। এবং এই আলি সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র সন্তান নয়, সে এক অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি, যাকে শৈশব থেকে সুলতানের হারেমে প্রতিপালিত

করা হয়েছে। এ কথা যে মিথ্যা নয়, সেটা মনে করবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।”

“সেই কারণগুলো আলা হজরত জানতে চাইলে বোধ হয় কারো উপর কোনো অবিচার করা হয় না,” আস্তে আস্তে বললো জাহান-আরা।

“হ্যাঁ, কারণগুলো আমার জানা দরকার,” দৃঢ়কণ্ঠে বললো শাহ জাহান।

দারা ও জাহান-আরার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হোলো।

শাহ জাহান বলে গেল, “কিন্তু ইতিমধ্যে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকলে চলবে না। সত্যি যদি দাক্ষিণাত্যে অরাজকতা হয়, মোগল সীমান্তে হামলা হয়, রাজস্বের আদায় কমে যায়, তাহলে ভাবনার কথা। অবশ্যি মির জুমলার পরামর্শ ছাড়া আমি কিছু করবো না, দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারে সে খুবই ওয়াকিবহাল, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আওরংজেবকে আমার এই হুকুম দেওয়া উচিত যে, বিজাপুরের ব্যাপারে অবস্থানুযায়ী নীতি নির্ধারণ করবে সে নিজে, এবং এ ব্যাপারে তার অবাধ স্বাধীনতা থাকবে।”

এবার আনন্দে উদ্ভাসিত হোলো রোশন-আরার মুখ।

শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র যখন খাস মহলে ফিরে যাওয়ার সময় হোলো, তখন বিদায় নিয়ে উঠে পড়লো দারা শিকো। রোশন-আরা শাহ জাহানের সঙ্গে সঙ্গে গেল খাসমহলের দিকে। জাহান-আরা দারাকে এগিয়ে দিতে সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো আঙ্গুরী-বাগ্‌এ।

আঙ্গুরী-বাগ্‌এর মাঝখানে চতুষ্কোণ মর্মর আঙিনার মাঝখানে প্রশস্ত জলাধারে তখন বিভিন্ন ফোয়ারা থেকে জল ছড়িয়ে পড়ছে নানা ছাঁদে। চারদিকে নিখুঁত জ্যামিতিক ছাঁদে নানা রঙের দেশী বিদেশী ফুলের কেয়ারি। অসংখ্য পাষাণ-স্তম্ভ ও মর্মরের

জালি পর্দা ঘিরে ঘন হয়ে উঠেছে আঙুরলতা। হারেমের ললনারা ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। জাহান-আরার সঙ্গে শাহ-ই-আলিজা দারা শিকোকে দেখে সবাই মুখের উপব নকাব টেনে দূরে দূরে সরে গেল।

একটি নিরিবিলি জায়গায় এসে জাহান-আরা দারাকে জিজ্ঞেস করলো, "পরিস্থিতি কি রকম মনে হচ্ছে।"

"ভালো না," দারা উত্তর দিলো, "আলা হজরত মির জুমলার পরামর্শ চাইবেন। মির জুমলা আওরংজেবের লোক, সে যে কি পরামর্শ দেবে বুঝতেই পারছি।"

"ধরে নাও, আওরংজেব এবার বিজাপুরের সঙ্গে একটা গোল-মাল বাধাবে।"

"আমারও তাই ধারণা," দারা উত্তর দিলো।

"কি করবে এখন ?" জাহান-আরা জিজ্ঞেস করলো।

"এখন তো কিছু করার নেই। আওরংজেব রাজস্ব আদায় হ্রাস পাওয়ার যুক্তিটা ভালো দিয়েছে। ওই এক যুক্তিতে আলা হজরত আওরংজেবের পরিকল্পনার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন।"

"আলি আদিল শাহ্‌র জন্মের ব্যাপারটা তোমার কি মনে হয় ?"

"কিছু একটা গোলমাল নিশ্চয়ই আছে," দারা বললো, "আওরং জেবের হাতে কোনো না কোনো প্রমাণ না থাকলে এত নিশ্চিত হয়ে এ কথা বলার লোক সে নয়। তবে সমস্ত ব্যাপারটা একটা রহস্য। ওই যে লোকটা, সর্দার হামিদ খাঁ, সে নিখোঁজ আজ প্রায় আঠারো বছর। এরকম একটা গুজব আছে যে, এই রহস্যের কিনারা করতে পারে নাকি শুধু সেই হামিদ খাঁ।"

"আমাদেরও উচিত তার খোঁজ করা।"

"আমিও তাই ভাবছি। কারো কারো ধারণা হামিদ খাঁ মারাঠাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন খুব বিচক্ষণ কোনো লোক গোপনে আওরঙ্গাবাদ

পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। সে সেখানে নজর রাখবে আওরংজেবের উপর, এবং নিয়মিতভাবে খবর দেবে আমাদের। আমাদের গোপন প্রতিনিধি হিসেবে যোগাযোগ করবে বিজাপুরের সর্দারদের সঙ্গে, এবং সম্ভব হলে ওই হামিদ খাঁর সন্ধান করবে।"

"আছে ওরকম বিশ্বাসী লোক?" জাহান-আরা জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, আছে একজন। আজ ওরই কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। সে ইয়ার ইসমাইল বেগ, আমার সওয়ানিহ্-নিগার ছিলো রাজমহলে। মহম্মদ শুজার সঙ্গে যে আরাকানের রাজার একটা গোপন যোগাযোগ হয়েছে—এ খবর সে-ই আমার এনে দিয়েছে।"

"পুরোনো লোক?"

"হ্যাঁ, আমার খিদমতে নিযুক্ত আছে অনেক বছর। আমার সঙ্গে কান্দাহারেও গিয়েছিলো। ভাবছি, তাকে পাঠিয়ে দেবো আওরঙ্গাবাদে।"

"কেউ যেন টের না পায়—," বললো জাহান-আরা।

"না। ইয়ার ইসমাইল বেগ খুব অভিজ্ঞ লোক।"

॥ দুই

কেল্লার হাথী-পুল দরওয়াজার কাছাকাছি চওক থেকে একটা নাতিপ্রশস্ত গলি বেরিয়ে গেছে। পথের দুপাশে শৌখীন বিলায়তী জিনিষপত্রের দোকানপাট, ক্রেতাসমাগমে পথ জমজমাট হয়ে থাকে সব সময়। সেই পথ ধরে খানিকটা অগ্রসর হলে মিঞা ইফতিকারউদ্দিনের কাফিখানা। সেখানে বসে বাদশাহ্‌র দুচারজন তরুণ ওয়ালাশাহি ও কয়েকজন আহাদি বসে কাফি খেতে খেতে গন্‌জফা অর্থাৎ তাস খেলছিলো। সমাওয়ারের কাফি ঠাণ্ডা হয়ে যেতে সমাওয়ার বদলে দিয়ে যাচ্ছিলো কাফিখানার খাদিম। টাকা বাজি রেখে খেলা, সুতরাং কলরব হট্টগোলে মুখর হয়ে আছে কাফিখানা। মিঞা ইফতিকারউদ্দিন দূরে এক মর্মর-বেদীর উপর বসে ধূমপান করতে করতে নজর রাখছিলো খদ্দের আর খাদিমদের উপর। হুক্কা টানছিলো খদ্দেরদের মধ্যেও অনেকে। সে সময় ধূমপানের রেওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছে আগ্রায়, দিল্লীতে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর ষোলোশ' সতেরো খৃস্টাব্দে ফরমান জারি করে ধূমপান বেআইনী করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সক্ষম হতে পারেন নি। ধূমপানের নেশা এমন ব্যাপক হয়ে গিয়েছিলো যে, শুধু দিল্লীতেই তামাকুর উপর শুল্ক বাবদ সরকারের আয় ছিলো দিন পাঁচ হাজার টাকা। সুতরাং সন্ধ্যেবেলা কাফিখানাগুলো তামাকুর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে থাকতো।

খেলতে খেলতে তাস ফেলে দিয়ে একজন উঠে দাঁড়ালো। সে খুব সুদর্শন দেখতে, বয়েস আঠারো উনিশের বেশী নয়, আননের

নবোদ্ভুত গুম্ফ ও শ্মশ্রু অতি যত্নে নয়নাভিরাম করে ছাঁটা। বলিষ্ঠ পেশীসংবদ্ধ দেহ, কোমরে ঝুলছে তরবারি।

"একি, এরই মধ্যে উঠে পড়লে ওসমান বেগ?" জিজ্ঞেস করলো আরেকজন আহাদি।

"হ্যাঁ, আম্মাজান অপেক্ষা করে বসে থাকবে। আব্বাজানও ফিরে আসবে এইবার। আমি ফিরলে সবার জন্যে দস্তরখান পাতা হবে।"

"শাহী ফৌজের আহাদি সন্ধ্যে হতে না হতেই বাড়ি ফিরে যেতে চায়, এ তো আশ্চর্য ব্যাপার! কাফি পান করবে, হুক্কা টানবে, গন্‌জফা খেলবে সন্ধ্যেভর, তারপর রুমালিতে আতর মেখে কোনো সুন্দরী তওআয়ফের মজলিসে গিয়ে গান শুনবে, বাড়ি ফিরবে মাঝরাতের পরে,—তা না হলে যে ওয়ালাশাহিদের কি আহাদিদের মুখ থাকে না।"

"না ভাই, ওসব আমার দ্বারা হবে না। আম্মাজান পছন্দ করেন না," ওসমান বেগ উত্তর দিলো।

"মায়ের ভয়েই এই অবস্থা," বলে উঠলো একজন ওয়ালাশাহি, "ঘরে যখন বিবি আসবে তখন কি হাল হবে?"

সবাই সমস্বরে হেসে উঠলো। ওসমান বেগ মিঞা ইফতিকার-উদ্দিনের কাছে গিয়ে কাফির দাম মিটিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে কাফিখানা থেকে বেরিয়ে পথের উপর নেমে এলো। চারদিকে তাকিয়ে অবলোকন করলো জনতার প্রবাহ। তারপর এগিয়ে চললো পথ ধরে।

আকাশ তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঠাণ্ডা লাগছে একটু একটু। পশমের কাবাটা ভালো করে জড়িয়ে নিলো ওসমান বেগ। তারপর হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল। আস্তে আস্তে কমতে লাগলো পথের ভিড়। এসে পড়লো একটি অভিজাত অঞ্চলে। এদিকে বাড়িগুলোতে থাকে দরবারের মাঝারি বর্গের

আমির মনসবদার ও ছোটোখাটো হোমরা-চোমরারা। ত্বপাশের অট্টালিকাগুলোর আলো পথের উপর এসে পড়েছে। ঈষৎ অন্ধকারে পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছে না তেমন। এ অঞ্চল পেরিয়ে গেলে এসে পৌঁছোবে শাহ-ই-আলিজা দারা শিকোর মঞ্জিলের কাছে। সেখানেই কাছাকাছি এক অঞ্চলে দারার অনুগতজনদের বসতি। নিজের বিশ্বস্ত ছোটো বড়ো মনসবদার আহাদি এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীদের অনেককেই দারা শিকো এনে রেখেছে নিজের সান্নিধ্যে। সেখানেই একটি ছোটো বাড়িতে ওসমান বেগ থাকে তার জনক জননীর সঙ্গে।

পথ চলতে চলতে ওসমান বেগ আপন মনে গুণ গুণ করে একটা সুর ভাজছিলো, হঠাৎ লক্ষ্য করলো পথের অন্যদিক থেকে একটা পাল্কি আসছে। পাল্কির সামনে পেছনে চার-পাঁচ জন খোজা খাদিম। পথ অতো প্রশস্ত নয়। পাল্কি কাছে আসতে ওসমান বেগ একটু সরে দাঁড়ালো। পাল্কিবাহক ও খাদিমেরা তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। হঠাৎ পেছন থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে ওসমান ফিরে তাকালো। দেখলো ত্বজন অশ্বারোহী পাল্কির পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। কৌতূহল পরবশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ওসমান বেগ।

"কার মহলের পাল্কি?" জিজ্ঞেস করলো একজন অশ্বারোহী।

খাদিমেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। মনে হোলো যেন পাল্কির ভিতর থেকে কেউ একজন খাদিমকে ডাকলো। সে পাল্কির কাছে এগিয়ে গিয়ে নিচুগলায় ত্ব'চারটা কথা বলে ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনার পরিচয় জানতে চাইছেন আমাদের মালকিন্—।"

"উনি নসরত খাঁ, আসাদ খাঁর পুত্র," উত্তর দিলো অন্য অশ্বারোহী।

আসাদ খাঁ একজন প্রতিপত্তিশালী ওমরাহ, শাহ জাহানের

অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। আগ্রায় একটা কানা ঘুষো চলে যে, আসাদ খাঁ শাহজাদা আওরংজেবের লোক। শাহ্-ই-আলিজা দারার সঙ্গে একটুও বনিবনাও নেই। আসাদ খাঁর পুত্র নসরত খাঁ অত্যন্ত উদ্ধত, দুর্বিনীত ও দুশ্চরিত্র যুবক, তার দুর্ব্যবহারের জন্যে সবাই অত্যন্ত অপছন্দ করে তাকে, কিন্তু প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান বলে ভয় করে, কিছু বলতে সাহস পায় না।

"মালকিন বলেছেন, আপনি যেই হোন্, আপনার কাছে পরিচয় দিতে উনি বাধ্য নন। আপনি আমাদের পথ ছেড়ে দিন।"

"বটে!" হেসে উঠলো নসরত খাঁ, "তাহলে তো তোমাদের মালকিন-এর পরিচয় না নিয়ে আমি পথ ছেড়ে দেবো না। যদি তোমরা যেতে পারো তো চেষ্টা করে দেখ।"

খাদিমেরা নিরস্ত্র, তা-ছাড়া নসরত খাঁকে কিছু বলতে সাহস করবে কে! ওরা হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

"পরিচয় দিতে ভয় কিসের?" জিজ্ঞস করলো নসরত খাঁ, "আমি তো কারো কোনোরকম বেইজ্জতি করছি না। শুধু এই অসময়ে নির্জন পথে জেনানার পাল্কি, তাই একটু কৌতূহল হোলো। পরিচয় জানাতে আপত্তি কিসের? না কি মালিককে না জানিয়ে কোথাও যাওয়া হয়েছিলো, তাই কথাটা জানাজানি হওয়ার ভয় আছে। আমি কসম খাচ্ছি কাউকে বলবো না, কিন্তু—কিন্তু আমার যখন জানবার ইচ্ছে হয়েছে, কে আছে পাল্কিতে আমাকে জানিয়ে যেতে হবে।"

খাদিমেরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। পাল্কির ভেতর থেকে চুড়ি আর [illegible] ঈষৎ শব্দ শোনা গেল। একজন খোজা খাদিম আবার এগিয়ে গেল পাল্কির কাছে, তারপর পাল্কিবাহকদের দিকে ফিরে বললো, "মালকিন্ বলছেন চুপ করে দাঁড়িয়ে না থাকতে। চলো—।"

নসরত খাঁ আর তার সঙ্গী তরবারি কোষমুক্ত করলো।

"তোমরা যদি পরিচয় না দাও," গম্ভীর কণ্ঠে শাসালো নসরত খাঁ, "তাহলে আমায় তোমাদের মালকিনের মুখ দেখে পরিচয়টা আন্দাজ করে নিতে হবে।"

"পথ ছেড়ে দাও," শোনা গেল একটা শান্ত কণ্ঠ।

নসরত খাঁ অবাক হয়ে ফিরে তাকালো। দেখলো, উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে এক যুবাপুরুষ পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"এই পাজিটা আবার কোত্থেকে এসে জুটলো," ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করলো নসরত খাঁ।

"তুমি কে?" প্রশ্ন করলো তার সঙ্গী।

পাজি কথাটা আজকালকার চাইতে অনেক বেশী অপমান-জনক কটূক্তি ছিলো মোগলদের আমলে। ক্রোধে ওসমান বেগ্-এর মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠলো। বলে উঠলো, "তলোয়ার খুলে যে ব্যক্তি নিরস্ত্র খোজা এবং অবলা নারীর সামনে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করে সেই পাজি।"

"তমিজ্-উদ্দিন," সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে গর্জন করলো নসরত খাঁ।

কথা শেষ হওয়ার আগেই তমিজ-উদ্দিন তার ঘোড়াকে দু-কদম এগিয়ে নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে ওসমান বেগকে লক্ষ্য করে তরবারির আঘাত হানলো। হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো সেই আধো-অন্ধকারে, খোজা খাজিমদের মশালের আলো প্রতিফলিত হোলো ওসমানের তরবারিতে। আঘাত প্রতিহত করে চোখের পলকে তমিজ-উদ্দিনের তরবারিতে এমন কৌশলে প্রত্যাঘাত করলো যে সেটি খসে পড়ে গেল তার হাত থেকে। এবং সে সোজা হয়ে উঠে বসার আগেই ওসমান তার জামাহ্‌র সম্মুখ-ভাগ দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরে প্রবল আকর্ষণে তাকে ভূপাতিত করলো। তমিজ-উদ্দিন নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ানোর

সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রবল পদাঘাতে ফেলে দিলো পথপার্শ্বস্থিত নালার মধ্যে।

ব্যাপারটা ঘটে গেল নসরত খাঁ ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই। এবার সে অবতরণ করলো তার অশ্ব থেকে। দৃঢ়মুষ্টিতে তরবারি ভালো করে বাগিয়ে ধরে এগিয়ে এলো ওসমান বেগ এর দিকে। বললো, "তুমি বোধ হয় আগ্রায় নতুন এসেছো। আমাকে চেনো না। তোমাকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।"

পরমুহূর্তেই দ্বন্দ্ব বেধে গেল তুজনের মধ্যে। নসরত খাঁ খুব নাম করা যোদ্ধা। কিন্তু দেখা গেল অসিচালনায় ওসমানও সুদক্ষ। কিছুক্ষণ সেই জনবিরল পথে অসিতে অসির আঘাত প্রত্যাঘাতের ঝন্‌ঝনা ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। রুদ্ধনিশ্বাসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো খোজা খাদিম ও পাল্কি বাহকেরা। পুঁতির রঙিন ঝালর একটুখানি ফাঁক করে পাল্কির ভিতর থেকেও কেউ যেন দেখতে লাগলো অবাক বিস্ময়ে।

হঠাৎ অশ্বক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। তারপরই উচ্চকণ্ঠ হুঙ্কারের সঙ্গে শোনা গেল ক্ষান্ত হওয়ার নির্দেশ। কাছে এসে অশ্বের গতিসংবরণ করে কয়েকজন অবতরণ করলো তাদের সামনে।

"কে তোমরা?" প্রভুত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো একজন।

আগ্রা শহরের কোতোয়াল ইমরাদ খাঁকে চিনতো তুজনেই।

ইমরাদ খাঁও কাছে এসে নসরত খাঁকে চিনতে পারলো। বিস্মিত হয়ে বললো, "আপনি! কি হয়েছে?"

"তেমন কিছু নয়," উদ্ধত কণ্ঠে নসরত খাঁ উত্তর দিলো, "এ লোকটা আমার সঙ্গী তমিজউদ্দিনকে হঠাৎ আক্রমণ করে ওই নালার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।"

"নসরত খাঁ আমায় পাজি বলে গাল দিয়েছেন," প্রত্যাভিযোগ করলো ওসমান বেগ।

"ও কিঞ্চিৎ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলো বলে আমি ক্রোধ সংবরণ করতে পারিনি।"

"কার মহলের পাল্কি?" জিজ্ঞেস করলো ইমরাদ খাঁ।

"সেটাই তো প্রশ্ন," নসরত খাঁ বললো, "আমরা এদিক দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম পাল্কি আসছে। এই সময়ে পাহারাদারহীন পাল্কি দেখে জানতে চাইলাম কার মহলের পাল্কি, খাদিমরা বলতে চাইলো না। তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছিলো। এমন সময় এ লোকটা এসে হঠাৎ হাতিয়ার নিয়ে আমার সঙ্গীকে আক্রমণ করলো।"

পেছন থেকে খোজা খাদিম বলে উঠলো, "আমার মালকিন জানতে চাইছেন, নসরত খাঁর কি অধিকার আছে ওঁর পরিচয় জোর করে জানতে চাইবার, যখন তিনি তাঁকে পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নন।"

নসরত খাঁ প্রভাবশালী অভিজাত বংশীয় হলেও ইমরাদ খাঁ কাউকে খাতির করবার লোক নয়। জিজ্ঞেস করলো, "এরা যা বলছে, তা সত্যি?"

ওসমান উত্তর দিলো, "ওরা দুজন তলোয়ার খুলে পাল্কির পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলো। আমি এই পথ ধরে যাচ্ছিলাম, ওর ব্যবহারের প্রতিবাদ জানালাম বলে আমায় গালাগাল দিলো।"

"তুমি কে?" প্রশ্ন করলো ইমরাদ খাঁ।

"আমার নাম ওসমান বেগ। আমি কিলিচ খাঁর অধিনস্থ একজন আহাদি।"

কিলিচ খাঁ একজন উচ্চবর্গের মনসবদার, শাহ-ই-আলিজা দারা শিকোর বিশেষ অন্তরঙ্গ। ইমরাদ খাঁ ওসমান বেগ ও নসরত খাঁর দিকে একবার তাকালো, তারপর পাল্কিবাহকদের দিকে ফিরে বললো, "তোমরা নির্ভয়ে নিজেদের গন্তব্যস্থানে যেতে পারো। কোতোয়ালের কাছে ছাড়া আর কারো কাছে পরিচয় জানাতে তোমরা বাধ্য নও।"

"বেশ তো, আপনাকেই ওরা পরিচয় জানাক," নসরত খাঁ বললো।

গম্ভীর কণ্ঠে ইমারদ খাঁ উত্তর দিলো, "নেহাৎ সন্দেহজনক মনে না হলে, আমিও কারো পরিচয় জানবার চেষ্টা করতে বাধ্য নই। তবে আপনি আর এই ওসমান বেগ প্রকাশ্য রাজপথে পরস্পরকে তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করে শান্তিভঙ্গ করেছেন। আপনাদের ছুজনকেই আমার সঙ্গে কোতোয়ালিতে আসতে হবে।"

"আমি আসাদ খাঁর ছেলে—নসরত খাঁ। আমাকে যেতে হবে কতোয়ালিতে?" রুষ্ট কণ্ঠে নসরত খাঁ প্রশ্ন করলো।

"আমি আমার কর্তব্য পালন করছি মাত্র," শান্ত কণ্ঠে বললো, ইমরাদ খাঁ, "আপনি কেন, কোনো শাহ্‌জাদা হলেও আমি তাদের গিরফ্‌তার করতাম।"

পাল্কি নিয়ে চলে গেল বাহক ও খাদিমেরা। নসরত খাঁ আর ওসমান বেগ্‌কে নিয়ে ইমরাদ খাঁ চললো কোতোয়ালির উদ্দেশে। ততক্ষণে নালা থেকে উঠে এসেছিলো নসরত খাঁর সঙ্গী তমিজ-উদ্দীন। সেও তাদের অনুগমন করলো।

নিজের মহলে মজলিস কক্ষে বসে শাহ-ই-আলিজা দারা শিকো জরুরী আলোচনা করছিলো নিজের মির-বক্‌শি মির্জা আবত্নল্লার সঙ্গে। এমন সময় দারার মুন্সি এসে জানালো,—ইয়ার ইসমাইল বেগ শাহ-ই-আলিজার খিদমতে হাজির আছেন।

শাহী কেল্লা থেকে ফিরে এসেই দারা শিকো ইত্তলা দিয়েছিলো ইয়ার ইসমাইল বেগকে। তার উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলো।

শাহ-ই-আলিজার সামনে এসে তসলিম করলো ইয়ার ইসমাইল বেগ।

দারা মির্জা আব্দুল্লার দিকে ফিরে বললো; "ইসমাইল বেগ আমাদের একজন অতি বিশ্বস্ত হরকরা।"

"আমি জানি," মির্জা আব্দুল্লা বললো, "ও কিছুদিন আগে রাজমহলে ছিলো। আমাদের অত্যন্ত মূল্যবান সংবাদ এনে দিয়েছে।"

"ওকে একশো আশরফি ইনাম দিতে বলেছিলাম—।"

"হ্যাঁ, দুদিন আগে দেওয়া হয়েছে," উত্তর দিলো মির্জা আব্দুল্লা।

"ওকে এবার আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করবো ভাবছি।"

তসলিম জানালো ইয়ার ইসমাইল বেগ। মির্জা আব্দুল্লা দারার দিকে তাকালো।

দারা বললো, "ভাবছি, এবার ওকে পাঠাবো মুলতান।"

"মুলতানে কেন?" জিজ্ঞেস করলো মির্জা আব্দুল্লা।

"শুনেছি আওরংজেব আমাদের নাইব-সুবাদার বেগ বাহাদুর খাঁ আর মহম্মদ আলি খাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্যে লোক পাঠিয়েছে। ওদের উপর একটু নজর রাখা দরকার।"

এমন সময় মুন্সি আবার এসে জানালো,—কোতোয়ালি থেকে লোক এসেছে।

"কেন?"

"কিলিচ খাঁর অধিনস্থ একজন আহাদি আর আসাদ খাঁর ছেলে নসরত খাঁ পথের মধ্যে অসিযুদ্ধ করছিলো বলে ইমরাদ খাঁ ওদের ধরে কোতোয়ালিতে নিয়ে গেছে। নসরত খাঁকে সাবধান করে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, আসাদ খাঁ উজীর মির জুমলার বন্ধু বলে তাঁর কাছে খবর পাঠাতে উজীর এই নির্দেশই দিলেন। এখন কিলিচ খাঁ আপনার প্রিয়জন বলে তাঁর অধীনস্থ আহাদিকে কি করা হবে ইমরাদ খাঁ আপনার কাছে নির্দেশ চাইছেন।"

দারা বিরক্ত হোলো। মির্জা আব্দুল্লাকে বললো, "স্বজনপ্রিয়তা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখ। দুই অর্বাচীন যুবক পথে

দাঁড়িয়ে ঝগড়া করলো, একজনের পিতা উজীরের বন্ধু এবং আওরংজেবের প্রিয়পাত্র বলে উজীর মির জুমলা স্বয়ং তাকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।” মুন্সির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, “কিন্তু ওরা একেবারে তলোয়ার খুলে পরস্পরের উপর চড়াও হোলো,—ব্যাপার কি ?”

“নসরত খাঁ একটি পাল্কির পথ রোধ করে হামলা করার উদ্যোগ করছিলেন। তাই আমাদের আহাদি পাল্কির মহিলাকে রক্ষা করবার জন্যে তলোয়ার খুলে রুখে দাঁড়ায়।”

“শাবাশ আমাদের আহাদি,” সানন্দে বলে উঠলো দারা শিকো, “একজন পাজির হয়ে যদি উজীর মির জুমলা কোতোয়ালকে নির্দেশ দিতে পারে, তাহলে একজন বীরপুরুষের হয়ে আমি শাহ-ই-আলিজা কিছু বলতে পারবো না কেন ? কোতোয়াল ইমরাদ খাঁকে বলে দেবে কিলিচ খাঁর আহাদিকে এই মুহূর্তে সসম্মানে মুক্তি দেবে।”

মুন্সি চলে যাচ্ছিলো, দারা ডেকে বললো, “ছেলেটির সাহস আছে, তা নইলে নসরত খাঁর মতো এক সুদক্ষ অসিযোদ্ধার মোকাবিলা করে ? নাম কি ওর ? আমার জানা দরকার।”

“ইয়ার ওসমান বেগ্।”

“ওসমান বেগ ? আচ্ছা!” বলে দারা ইসমাইল বেগ্-এর দিকে তাকালো হাসিমুখে।

“ওর কিছু রিশতা লাগে নাকি,” মির্জা আব্দুল্লা জিজ্ঞেস করলো।

“আমার ছেলে। সেনাদলে আহাদি হয়ে যোগদান করার সুযোগ পেয়েছে শাহ-ই-আলিজার দয়ায়।”

মুন্সি চলে গেল। মির্জা আব্দুল্লার দিকে ফিরে দারা বললো, “মুলতানে গিয়ে ইসমাইল বেগ্কে অনেক খরচপত্র করতে হবে। ওকে কালই এক হাজার আশরফি দেওয়া হোক, দু-চার দিনের মধ্যেই রওনা হতে হবে ওকে।”

"শা-ই-আলিজার হুকুম মতো সবই ব্যবস্থা করে দেবো," উত্তর দিলো মির বক্‌সি মির্জা আবদুল্লা।

"আচ্ছা, তুমি এখন গিয়ে বিশ্রাম করতে পারো। আমি ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌কে কিছু গোপনীয় নির্দেশ দিতে চাই।"

তসলিম করে মির্জা আব্দুল্লা বিদায় নিলো। সে চলে যাওয়ার পর দারা ইসমাইল বেগ-এর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

"মুলতানে যাওয়া কি নিতান্তই প্রয়োজন," ইসমাইল বেগ জিজ্ঞেস করলো।

"কেন?"

"বাজারে একটা গুজব শুনলাম, শাহ-ই-আলিজা খবরটা নিশ্চয়ই পেয়েছেন।"

"কি?"

"বিজাপুরের সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র মৃত্যু হয়েছে। তখ্‌ত্‌-এ হাসিল হয়েছেন নতুন সুলতান আলি আদিল শাহ।"

"হ্যাঁ, আজই সংবাদটা এসেছে। নানা কারণে সুলতান আলি আদিল শাহ আমাদের অবাঞ্ছনীয়।"

"শুনেছি এই অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির এবং দুশ্চরিত্র।"

"হ্যাঁ। ব্যাপারটা একটু জটিল। আওরংজেব তাকে মহম্মদ আদিল শাহ্‌র সন্তান বলে মানতে রাজী নয়। বিজাপুর রাজ্য অধিকার করে তার বিপুল ধনভাণ্ডার আর ফৌজ হস্তগত করাই তার ইচ্ছা। কিন্তু স্বাধীন রাজ্য হিসেবে বিজাপুর রাজ্যের অস্তিত্বই আমার কাম্য। তার ধনসম্পদ আর ফৌজ আওরংজেবের হস্তগত হোক এটা আমি চাই না। অথচ এই আলি আদিল শাহ আমার ভাবনার কারণ হয়ে উঠতে পারে।"

"কেন, শাহ-ই-আলিজা?"

"আমি খবর পেয়েছি আলি আওরংজেবের কন্যা জিনত-উন-

নিসার প্রতি অনুরক্ত। আগে আমার কাছে গোপন সংবাদ এসেছে। আজ ছোটী বেগম সাহিবা রোশন-আরার কাছে আওরংজেবের পত্র মারফতও জানলাম যে আওরঙ্গাবাদের বিজাপুরী উকীলের মারফৎ এ ব্যাপারে আওরংজেবের অভিমত জানবার চেষ্টা করা হয়েছে। আওরংজেব অস্বীকার করেছে বটে, কিন্তু আলির এই দুর্বলতার সুযোগ সে যে গ্রহণ করতে চাইবে না সেকথা আমার মনে হয় না। আওরংজেবের এরকম কোনো চাল ব্যর্থ করে দেওয়াই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। এবং এজন্যে তোমায় আওরঙ্গাবাদে পাঠানোর কথা ভাবছি।"

"আমারও আওরঙ্গাবাদ যাওয়ারই বাসনা," উত্তর দিলো ইয়ার ইসমাইল বেগ, "তবে শাহ-ই-আলিজা মুলতান যাওয়ায় কথা বলছিলেন বলে কিছু বলিনি।"

দারা হেসে বললো, "ওকথা মির্জা আব্দুল্লাকে শোনানোর জন্যে। আমি যে আওরঙ্গাবাদে হরকরা পাঠাচ্ছি একথা কাউকে জানতে দিতে চাই না।"

"আমি এতদিন এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম শাহ-ই-আলিজা।"

"এসব তো গেল উপরের কথা, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য আরো গূঢ়। মহম্মদ আদিল শাহ্‌র বৈধ সন্তানকে এবার তখ্‌ত্‌এ বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ শুধু তারই উপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি। এবং সেটা সম্ভব হবে শুধু তোমারই সাহায্যে। দীর্ঘ আঠারো বছর তুমি অপেক্ষা করেছো। আর দেরি নয়, এবার তোমার কাজ শুরু করতে হবে, হামিদ খাঁ।"

শাহ-ই-আলিজা দারা শিকো লক্ষ্য করেনি যে মজলিস কক্ষের পেছন দিকের দেওয়ালের উপর দিকের ঘুলঘুলির পেছন দিকে এক-জন কান পেতে শুনছিলো। মজলিস কক্ষ বেগমমহলের সংলগ্ন।

সেদিক থেকে একটি ঢাকা বারান্দা এসে পড়েছে মজলিস-কক্ষের পেছন দিকে। সেখানে আছে ছোটো ছোটো ঘুলঘুলি। মজলিস কক্ষে শায়রদের কিংবা নাচগানের মাইফিল বসলে মহলের বেগমেরা এসে শোনে।

যে শুনছিলো, সে এক পরমা সুন্দরী তরুণী। ঈষৎরক্তিম শ্বেত-গোলাপের পাঁপড়ির মতো তার বর্ণ, মুখে ভুবনমোহিনী সৌন্দর্য। কিন্তু আয়ত নয়ন কূটবুদ্ধিতে প্রখর, ঈষৎ কুঞ্চিত। অধরোষ্ঠের কোণে এক দৃঢ়তার কাঠিন্য।

হামিদ খাঁ!

তার চোখে মুখে জাগলো বিপুল বিস্ময়ের ছায়া, আয়ত নয়ন মেলে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে।

"হামিদ খাঁ," দারা শিকো বলছিলো, "তুমি কি উপায় অবলম্বন করবে সেটা নির্ধারিত করবে তুমি নিজেই। এ বিষয়ে কোনো পরামর্শ আমি দিতে পারবো না। কারণ, সব কিছু নির্ভর করবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। তবে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল যারা যারা বিজাপুরে এবং আওরঙ্গাবাদে আছে, তাদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করে দেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছি, আওরঙ্গাবাদে আমার যে সব হরকরা আছে তাদের সবার সাহায্য তুমি পাবে। স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র বিশ্বস্ত মনসবদার শাহজী ভোঁসলের শিবা নামে এক পুত্র আছে পুণায়। শুনেছি, সে আওরংজেবের প্রতি অত্যন্ত বৈরীভাবাপন্ন, বিজাপুরের যে সব সর্দার এখন বড়ী সাহিবার পক্ষভুক্ত, ওদের সঙ্গে, বিশেষ করে সর্দার আফজল খাঁর সঙ্গে তার প্রবল শত্রুতা। তার সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। আমার কাম্য শুধু এই যে, বিজাপুরের তখ্‌ত্‌ যার প্রাপ্য, সেই যেন তখ্‌ত্‌এ হাসিল হয়। আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্র হিসেবে বিজাপুর সমৃদ্ধিশালী হোক, এবং

ব্যর্থ হোক আওরংজেবের হীন ষড়যন্ত্র, এর বেশী কিছু আমি চাই না।”

“ওসমানকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো তো?”

“নিশ্চয়ই। এবং আয়েশাকেও নিয়ে যাবে। তবে খুব সাবধান, কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। খবর পেয়েছি আওরংজেব সম্প্রতি উঠে পড়ে লেগেছে তোমার সন্ধান পাওয়ার জন্যে।”

“এই আঠারো বছরে আমার আর আয়েশার চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে,” আস্তে আস্তে বললো ইসমাইল বেগ, “তিপ্পান্ন বছরের এক প্রৌঢ় ইসমাইল বেগ-এর সঙ্গে আঠারো বছরের আগেকার চৌত্রিশ বছর বয়েসের অভিজাত সর্দার হামিদ খাঁর বিন্দু মাত্র সাদৃশ্য নেই। প্রায় চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া ফতিমা বিবিকে দেখেও কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না এ সেই বহুকাল আগেকার সুদর্শনা খাদিমান আয়েশা বানু। শাহ-ই-আলিজার পরিচালিত ফৌজের এক মনসবদারের আহাদি ওই অষ্টাদশ বর্ষীয় ওসমান বেগকে দেখে কে কল্পনা করতে পারবে যে, সে স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র একমাত্র সন্তান?”

“তাকে এইবার তার পিতৃপরিচয় জানানো উচিত।”

“এখনো সময় হয়নি শাহ-ই-আলিজা। যেদিন তাকে তার পিতার তখ্‌ত্‌এ বসানোর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ রূপ নেবে, সেদিনই তাকে জানাবো, তার আগে নয়।”

দারা আস্তে আস্তে বললো, “আশা করি তোমার উদ্যম সফল হবে। সাধারণ পরিবারের পরিবেশের মধ্যে থেকেও সে যে সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পেরেছে, তার জন্যে ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ। তবে, তাকে এবং তোমাকে যে তোমাদের যথোচিত মর্যাদায় রাখবার সুযোগ আমি পাইনি, তার জন্যে একটা কষ্ট আমার মনে আছে।”

“আপনি আমাদের যে মর্যাদা দিয়েছেন, সে মর্যাদা আর কেউ

কোনোদিন দিতে পারবে কিনা জানিনা। আপনি প্রকাশ্যে কাউকে বুঝতে না দিয়ে অন্তরাল থেকে যে ভাবে ওসমানের শিক্ষা-দীক্ষার তদারক করতেন এবং সুযোগ সুবিধা করে দিতেন, স্বয়ং মহম্মদ আদিল শাহ এবং বড়ী সাহিবার তত্ত্বাবধানে থাকলেও এতটা হোতো কিনা সন্দেহ। আর, সাধারণ মানুষের অসচ্ছল পরিবেশে থাকাও তার পক্ষে মস্তো বড়ো শিক্ষা। যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে কোনোদিন বিজাপুরের সুলতানের তখ্ত্ অলঙ্কৃত করতে পারে, তাহলে সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট বুঝতে সে সক্ষম হবে। আপনার দয়া আমি কোনোদিনই ভুলতে পারবো না শাহ্-ই-আলিজা। ওসমানও যেদিন জানবে, তার শিরও সেদিন ঝুঁকে পড়বে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায়।"

"কিন্তু হামিদ খাঁ, ওসমানের জন্যে তুমি যা করেছো, তার তুলনা নেই। নিজের উচ্চাশা, উন্নতি সব কিছু তুমি ত্যাগ করেছো তার জন্যে।"

হামিদ খাঁ একটু আনমনা হয়ে গেল। বোধ হয় মনে পড়লো অনেক পুরানো কথা, স্মৃতির আবেশে ভাবময় হয়ে গেল চোখ দুটো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আল্লা আমার উপর একটা দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, আমি শুধু সেই দায়িত্ব পালন করছি মাত্র। সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্কে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম, তাঁর প্রতি আমার একটা গভীর কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা ছিলো। সেই হিন্দু ফকির যখন মৃতকল্প শিশুকে পুনরুজ্জীবিত করলো, তখন আমি সুলতানের নির্দেশের জন্যে তাঁরই কাছে ফিরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যখন জানতে পারলাম সুলতান নিজেই তাঁর দেহরক্ষীদলের দারোগা মুল্লা লতিফকে নিয়োজিত করেছেন আমাকে গোপনে হত্যা করবার জন্যে, মনে অত্যন্ত আঘাত পেলাম। ভাবলাম, আমি মালিক সুলতানের খিদমতে আমার জীবন উৎসর্গ করেছি, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সেবা করেছি, তিনি আমায় বিশ্বাস করতে পারলেন না?

তাঁর সন্তানের জন্মবৃত্তান্তের গোপন কথাটা যে আমি জানি, শুধু এই অপরাধে আমার এতদিনকার বিশ্বস্ততা এক মুহূর্তে ভুলে গেলেন? আমার জবান বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে আমায় হত্যা করার হীন ষড়যন্ত্র করতে পারলেন তিনি? সেদিন আমার সমস্ত উচ্চাশা, উচ্চাভিলাষ, আত্মোন্নতির সব স্বপ্ন দূর হোলো হৃদয় থেকে। ধিক্কার এসে গেল রাজনীতির উপর। একবার ভাবলাম ফকির হয়ে মক্কায় চলে যাবো। কিন্তু পারলাম না, ওই অসহায় শিশুর দায়িত্ব আমার উপর। ওই শিশুকে তার ন্যায্য অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যাবো শুধু এই আশা নিয়ে এতদিন কাটিয়ে দিয়েছি। যেদিন আমার কাজ শেষ হবে, সেদিন আমি চলে যাবো হিন্দুস্তান ছেড়ে। আমার জীবনে আর কোনো বাসনা কামনা নেই।”

“সেই আঠারো বছর আগেকার কথা আমার আজো মনে পড়ে,” দারা বললো আস্তে আস্তে, “একদিন আগ্রায় এসে আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে তুমি সব খুলে বললে আমায়, আমার আশ্রয় চাইলে। তোমার মতো বিশ্বস্ত ও যোগ্য ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। তোমায় এই সামান্য কাজে নিযুক্ত করে রাখার ইচ্ছে আমার ছিলো না, আমি এতে মনে মনে নিতান্ত লজ্জিত বোধ করতাম। আমি তোমায় আমার সেনাবিভাগে উচ্চ পদ দিয়েই রাখতে চেয়েছিলাম হামিদ খাঁ।”

“আপনার এই করুণার জন্যে আমি চিরকাল আপনার খাদিম হয়ে থাকবো শাহ-ই-আলিজা। কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না আপনার ফৌজে কোনো মনসব গ্রহণ করা, কারণ তাহলেই আগ্রার বিজাপুরী উকীল এবং তার হরকরাদের চোখে পড়ে যেতাম। এভাবে আত্মগোপন করে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হোতো না।”

দারা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর আস্তে আস্তে বললো, “হামিদ খাঁ, যদি কোনোদিন প্রয়োজন বোধ করো, আমার কাছে

ফিরে আসতে দ্বিধাবোধ কোরো না। তোমার, কি আয়েশাবান্নুর, কি ওসমানের যদি আপন বলতে এ দুনিয়ায় কেউ নাও থাকে, মনে রেখো একজন অন্তত নিশ্চয়ই আছে। তার নাম দারা শিকো।"

হামিদ খাঁর নয়ন আর্দ্র হয়ে উঠলো, কোনো উত্তর বেরোতে পারলো না গলা ঠেলে। নীরবে অবনত হয়ে তসলিম জানালো।

"হামিদ খাঁ—।"

"হুকুম করুন শাহ-ই-আলিজা!"

"ওসমানকে এপর্যন্ত আমি দেখিনি, শুধু অপ্রত্যক্ষভাবে তার তত্ত্বাবধানই করেছি। তোমরা রওনা হবার আগে ওকে একবার দেখতে চাই।"

"তার পক্ষে কি সেটা নিরাপদ হবে শাহ-ই-আলিজা?"

দারা হাসলো। তারপর বললো, "আমাদের অনুগতজন ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌এর দুর্বিনীত পুত্র এবং আমাদের অধীনস্ত মনসবদার কিলিচ খাঁর ফৌজের একজন আহাদি ইয়ার ওসমান বেগ সম্মানিত ওমরাহ আসাদ খাঁর পুত্র নসরত খাঁর সঙ্গে প্রাকাশ্যে রাজপথে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করেছে। যদিও এক সম্ভ্রান্ত নারীর শরম্‌ রক্ষার প্রয়োজনে তার উদ্দেশ্য ছিলো মহৎ, তবু তাকে ভৎর্সনা করে দেওয়া প্রয়োজন, কারণ নসরত খাঁ আসাদ খাঁর পুত্র, তার নামে কোতোয়ালিতে নালিশ করা চলে, তলোয়ার উন্মুক্ত করে তাকে আক্রমণ করা চলে না।" বলে হামিদ খাঁর দিকে তাকিয়ে দারা চোখ টিপলো, "তাই স্থির করেছি, কিলিচ খাঁকে হুকুম করবো, এই আহাদি ওসমানকে যেন মজলিসে আমার সামনে উপস্থিত করা হয় কাল সকাল বেলা।"

হামিদ খাঁ তসলিম জানিয়ে বিদায় নিলো।

মজলিস্‌-কক্ষের পেছন দিকের উঁচু বারান্দা থেকে ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে যে-সুন্দরী যুবতী গোপনে এদের কথোপকথন শুনছিলো

সে এবার তাড়াতাড়ি বারান্দা ধরে হাঁটতে শুরু করলো দারার বেগম-মহলের দিকে। সেদিকে লোকজন কেউ ছিলো না, তাই খানিকটা পথ দেখা হোলো না কারো সঙ্গে। যে ভাবে সে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাচ্ছিলো তাতে মনে হোলো যেন কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার জন্যে সে উৎসুকও নয়। কিন্তু মহলের দিকে মোড় ফিরতেই আচমকা একজনের সামনাসামনি পড়ে গেল। সে দারার মহলের প্রধান খোজা খাদিম মকবুল।

"তুমি এদিকে কি করছো," জিজ্ঞেস করলো খোজা মকবুল।

যেই সহজ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে সে প্রশ্ন করলো তাতে বোঝা গেল যে, এই সুন্দরী যুবতী মহার্ঘ বসনভূষণসজ্জিতা হলেও বেগম কি শাহজাদীদের সমপদস্থ কেউ নয়।

মকবুলকে দেখেই সেই নারীর মুখভাবের পরিবর্তন ঘটেছিলো। শিশুর মতো সরল তার মুখমণ্ডল, হরিণীর মতো স্বচ্ছ তার নিষ্পাপ দৃষ্টি। মধুক্ষরা কণ্ঠে উত্তর দিলো, "মকবুল, দেখতে গিয়েছিলাম শাহ-ই-আলিজা আজ এত বিলম্ব করছেন কেন।"

"হে বেওকুফ্ নারী," মকবুল হেসে বললো, "নিজের মনের অধীরতা কোনোদিন শাহজাদাদের জানতে দেবে না।"

"আমি তো জানতে দিইনি," সুন্দরীও হাসলো, "শুধু দূর থেকে একটু দেখতে গিয়েছিলাম। তাও পেলাম কই। নিচের দরজায় শাহ-ই-আলিজার দুজন খাস চৌকি পাহারা দিচ্ছে। আমি আর নিচে নামলাম না। বারান্দা ধরে খানিকটা এগিয়ে আবার ফিরে এলাম। তুমি আবার শাহ-ই-আলিজাকে বলে দিও না মকবুল।"

মকবুল হাসতে হাসতে উত্তর দিলো, "কি বলবো? শাহ-ই-আলিজা, আপনার প্রিয়তমা ব্যাকুল হয়ে আপনার তল্লাশ করে বেড়াচ্ছে? সামান্য খাদিম তো শাহজাদাদের সঙ্গে এরকম রসালাপ করে না ভাই।"

সেই নারী যেন একটু আশ্বস্ত হোলো মকবুলের কথা শুনে।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু শাহ্-ই-আলিজা আজ আর আরাম-গাহ্‌তে যাবেন না?"

"তোমায় প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই যথাসময়ে ইত্তলা দেবেন," বলে মকবুল চলে গেল।

সুন্দরী হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লো বেগম-মহলের ভেতরে। মহলের যেদিকে দারার পরিবারের মহিলারা থাকে সেদিকে না গিয়ে অন্য পথ ধরলো সে, যে পথ চলে গেছে পরস্‌তার-মহলের দিকে।

এমন সময় একজন খাদিমান এসে দাঁড়ালো তার সামনে। বললো, "উদিপুরীবাঈ, পাক-নিহাদ-বানু বেগম আপনাকে ইত্তলা দিয়েছেন।"

ফিরে দাঁড়িয়ে বেগম-মহলের দিকে ফিরে চললো দারার প্রিয়তমা পরস্‌তার উদিপুরীবাঈ।

তখন কে জানতো এই সুন্দরী নারী শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ আওরংজেবের প্রিয়তমা বেগম উদিপুরীমহল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। সে ক্রীতদাসী হয়ে এসেছিলো শাহজাদা দারা শিকোর অন্তঃপুরে, নিজের রূপে গুণে দারার হৃদয় জয় করে একসময় সে পেয়েছিলো দারার পরস্‌তার অর্থাৎ উপপত্নীর মর্যাদা। তার গায়ের রঙের অনন্যসাধারণ শুভ্রতার জন্যে অনেকের ধারণা ছিলো তার জন্মস্থান মধ্য এশিয়ায়। দারার শত্রুপক্ষেরা রটনা করতো যে সে খৃস্টান ধর্মাবলম্বী এবং তারই প্রভাবে খৃষ্টধর্মে অনুরক্ত হয়েছে দারা শিকো। একথা সত্যি যে, উদিপুরীবাঈ দারার নজরে পড়েছিলো যে সময়, তারই কিছু পরে দারা খৃস্টধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলো, কিন্তু সেটা হয়েছিলো আসলে ফাদার ম্যালপিকা পেড্রো, যুজারটে, ফাদার আঁরি বুজিও ও হাইনরিখ্‌ রথ নামে চারজন জেসুইট পাদ্রীর প্রভাবে। মাসির-ই-আলমগিরী প্রমুখ তৎকালীন ঐতিহাসিক রচনায় উল্লেখ আছে যে

উদিপুরী কাশ্মিরী হিন্দু এবং অন্যান্য হিন্দুনারীর মতো তাকেও উল্লেখ করা হয়েছে "বাঈ" বলে।

পরস্‌তারদের সঙ্গে বেগমদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বা মেলামেশা তৎকালীন সামাজিক রীতিসম্মত ছিলো না। কিন্তু এর কিছু ব্যতিক্রম ছিলো দারার মহলে। সেখানে দারার উদার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আদবকায়দার বাড়াবাড়ি ছিলো একটু কম। উদিপুরীর স্বভাবেরও একটা মাধুর্য ছিলো। এজন্যে তার সঙ্গে দারার পত্নী নাদিরাবানু এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা পাক-নিহাদ-বানুর সঙ্গে খানিকটা হৃদ্যতা ছিলো। বিশেষ করে পাক-নিহাদ-বানু নানা ব্যাপারে উদিপুরীর পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রহণ করতো। তার প্রখর বুদ্ধির বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিলো দারা শিকোর মহলে।

"আমায় ইত্তলা দিয়েছেন বেগম সাহেবা," উদিপুরী এসে পাক্-নিহাদ-বানুকে তসলিম করে বললো।

পাক-নিহাদ-বানু এসময় ষোড়শী যুবতী, তার অঙ্গে অঙ্গে প্রথম যৌবনের ঢল নেমেছে। চুড়িদার পাজামার উপরে পড়েছে মহার্ঘ রেশমের ফরশ্-ই-চন্‌দানি, তার উপর রঙিন মখমলের বন্দি। মাথার দোপাট্টা কাঁধের উপর খসে পড়েছে, মাটিতে লুটোচ্ছে তার একপ্রান্ত। পায়ে লাল চামড়ার পাদুকা, তাতে সোনালী জরিতে ফুলপাতার নক্‌সা। বিচলিত মনে কক্ষের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পদচারণা করছিলো পাক-নিহাদ-বানু বেগম। ঝাড়লণ্ঠনের আলো পড়ে মাঝেমাঝে ঝকমক করে উঠছিলো কপালের উপরকার কোত্‌বিলদর্‌এর ছোটো ছোটো হীরেগুলো।

উদিপুরীকে দেখে পাক-নিহাদ-বানু দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর উঠে এলো তার দিকে, বললো, "উদিপুরীবাঈ, তোমায় আমার অত্যন্ত প্রয়োজন।"

"ভবানীদাসজী কি বললো ?" উদিপুরী একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"আমি যে ওঁর কাছে গিয়েছিলাম, কেউ জানতে পারবে না তো?" আশঙ্কাভরে প্রশ্ন করলো পাক-নিহাদ-বানু।

"না, বেগম সাহিবা, আপনি যতক্ষণ ফেরেননি, আমি ততক্ষণ আমার নিজের কক্ষে প্রদীপ না জ্বালিয়ে চুপ করে বসেছিলাম।"

"আমার খাস খাদিমান নার্গিস মহলের পেছনে গোলাপ-বাগে চুপচাপ লুকিয়ে বসেছিলো। মা জানতেন আমি ওরই সঙ্গে সেখানে বেড়াতে গেছি। নার্গিস বললো, আমার খোঁজ পড়েনি একবারও। আমার এমন ভয় করছিলো! যদি কেউ টের পেতো যে, তোমার নাম লেখা দস্তক নিয়ে তোমারই জন্যে ব্যবস্থা করা পালকিতে চড়ে আমি মহলের বাইরে গিয়েছিলাম। আমি শুধু বকুনি খেতাম মায়ের কাছে, কিন্তু তোমার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হোতো।"

"আমি সানন্দে সেই শাস্তি মাথা পেতে নিতাম বেগম সাহিবা। এতো কিছুই নয়, আপনার জন্যে আমি আমার জান কুরবান দিতে পারি।"

"মহলের দেউড়ির চৌকির কাছেও তো ধরা পড়তে পারতাম।"

পাক-নিহাদ-বানু বেগমের কথা শুনে উদিপুরী মনে মনে বিরক্তি বোধ করলো। লুকিয়ে মহলের বাইরে যাওয়ার সময় তো এত কথা মনে আসেনি। এখন নিরাপদে ফিরে আসার পর সমস্ত রকম বিপদের সম্ভাবনাগুলো মনে মনে কল্পনা করে একরকম ভাবনাবিলাসের আনন্দ নেওয়া হচ্ছে।

মুখে খুব মিষ্টি করে বললো, "দেউড়ি-চৌকিতে যাতে ধরা না পড়েন সেজন্যেই তো খোজা মহম্মদ লতিফকে সঙ্গে দিয়েছিলাম। সে আমার খুব বিশ্বস্ত। দেউড়ি চৌকির সবাই জানে যে আমি যখনই বাইরে যাই তাকে সঙ্গে নিয়ে যাই।"

পাক-নিহাদ বানু শাহজাদা দারার জ্যেষ্ঠা কন্যা। বয়ঃপ্রাপ্তা হয়েছে, তাই ইদানিং তার বিয়ের কথাবার্তা উঠছিলো। শাহ জাহানের ইচ্ছে, শুজার ছেলে বুলন্দ্ আখ তারের সঙ্গে তার বিয়ে

হোক। জাহান-আরা কিংবা দারা এই প্রস্তাবে সায় না দিলেও নাদিরা বানুর খুব উৎসাহ ছিলো এই প্রস্তাবে। কিন্তু আওরংজেবের নির্দেশে রোশন-আরা বিরোধিতা করছিলো এই সম্বন্ধের। সে চেষ্টা করছিলো পাক-নিহাদ-বানুর যেন বিয়ে হয় শাহ জাহানের ভ্রাতা সুলতান পারভিজের পুত্রের সঙ্গে। দারা ও শুজার বৈবাহিক সম্বন্ধ আওরংজেবের স্বার্থে অবাঞ্ছনীয়। সুলতান পারভিজের পুত্রের সঙ্গে হলে সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

এই কূটনৈতিক টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়ে হাঁফিয়ে উঠেছিলো পাক-নিহাদ-বানুর মন। সে সুশিক্ষিতা মেয়ে, সাম্প্রতিক কবিদের জনপ্রিয় দিওয়ানগুলো প্রায় তার মুখস্থ। জীবন সম্বন্ধে তার একটা রঙীন কল্পনাবিলাস আছে। তার মন কোনো এক স্বনির্বাচিত স্বপ্নজগতের আশিকের জন্যে দিওয়ানা হয়ে আছে। চায় না সে শাহী খানদান, ধন দৌলত ঐশ্বর্য। মর্মর-মহলের এক অবজ্ঞাত লায়লা সে,—খুঁজে পেতে চায় তার খোয়াবের মজনুকে। তার মনের কথা সে অনেক সময় খুলে বলতো উদিপুরীকে, আর উদিপুরীও দিওয়ান আবৃত্তি করে করে ইন্ধন যোগাতো তার সুখস্বপ্নে।

দারার ব্যক্তিগত জ্যোতিষী ভবানীদাসের খুব নামডাক, —আর জ্যোতিষে সে সময় অগাধ বিশ্বাস ছিলো মোগল অভিজাত বংশীয়দের। স্বয়ং আওরংজেবেরও জ্যোতিষে খুব বিশ্বাস। উদিপুরীকে একজন জ্যোতিষী হাত দেখে বলেছিলো,—তুমি রাজরাণী হবে। তার পর থেকে জ্যোতিষীদের উপর উদিপুরীরও অসীম শ্রদ্ধা। সে কিছুদিন আগে পাক-নিহাদ-বানুকে বলেছিলো, ভবানীদাসজীকে দেওড়িতে ডাকিয়ে এনে তার কাছে কোষ্ঠিবিচার করিয়ে নিতে। জ্যোতিষীর কাছে ভবিষ্যত জেনে নেওয়ার প্রস্তাব পাক-নিহাদ-বানুর মন্দ লাগেনি কিন্তু তাকে মহলে ডাকিয়ে আনায় তার আপত্তি ছিলো। কারণ, তাকে খবর দিতে হলে মহলদারকে জানাতে হবে, সে যখন দেওড়িতে আসবে, তখন দেওড়ির দারোগাও জানবে।

সুতরাং খবরটা জানাজানি হয়ে নাদিরা বেগম এমন কি, স্বয়ং দারা শিকোর কানে ওঠাও বিচিত্র নয়। উদিপুরী তখন দিলো গোপনে মহলের বাইরে যাওয়ার বুদ্ধি। সে মাঝে মাঝে খাঁ-ই-সামান আলা-উল্-মুল্ক-এর হাবেলিতে যায় এক পরিচিতার সঙ্গে দেখা করতে। সুতরাং সেই ছুতো দেখিয়ে মহলের বাইরে যাবার অনুমতি নেবে মহলদারের কাছ থেকে। মহলদার পাল্কির ব্যবস্তা করে দেবে। কিন্তু বোরখা পরে পাল্কিতে উঠবে পাক-নিহাদ-বানু। পাল্কির সঙ্গে থাকবে উদিপুরীর বিশ্বস্ত খোজা খাদিম মহম্মদ লতিফ। সুতরাং দেওড়িতে কারো সন্দেহ করার কারণ থাকবে না। নাদিরা-বানু জানবে কন্যা তার খাস খাদিমান নার্গিসের সঙ্গে মহলের পেছন দিকে গোলাপবাগে তফরি করতে গেছে। ঘণ্টা দেড়েকের ব্যাপার, জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ভবানীদাসজীর সম্বন্ধে ভাবনা নেই, কোষ্ঠিবিচার করে সোনার আশরফি কামানোই তার বৃত্তি, কে তার কাছে গোপনে এলো, কে প্রকাশ্যে এলো, তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। আর, সে যে দারার কন্যা একথাও সে জানবে না। তবে, তার সামনে বেরোনো চলবে না পাল্কি থেকে, সুতরাং নিজের একজন বিশ্বাসী হিন্দু খাদিমানকেও সঙ্গে দিয়ে দিলো উদিপুরীবাঈ।

ওর খুব কৌতূহল হচ্ছিলো ভবানীদাস কি বলেছে জানবার জন্যে, কিন্তু নিজের থেকে জিজ্ঞেস করাটা আদব নয়। তাই চুপ করে রইলো উদিপুরী।

পাক-নিহাদ-বানু নিজের থেকে বললো। "জানো উদিপুরী বাঈ—, বিয়ের কথা ভবানীদাসজী পরিষ্কার কিছু বললো না। বললো,—একটু গোলমাল আছে। তবে,—তবে—," শেষ করতে পারলো না পাক-নিহাদ-বানু। তার মুখ আরক্তিম হয়ে উঠলো।

"তবে কি, বেগম সাহিবা?"

"কাউকে বলবে না উদিপুরী? জানো ভবানীদাসজী কি

বলেছে ? কোনো এক শাহজাদার সঙ্গে নাকি আমার প্যার হবে। সেই শাহজাদা নাকি বিদেশী। আমাদের মতন চাখ্‌তাইয়া নয়।"

উদিপুরী হাসলো। বললো, "সে তো খুব ভালো কথা বেগম সাহিবা।"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো পাক-নিহাদ-বানু। বললো, "সে কি করে সম্ভব ? হতে পারে না। এই আগ্রা শহরে বিদেশী শাহজাদার সঙ্গে আমার পরিচয় হবে কি করে ? আমার মনে হয় ভবানীদাসজীর গণনায় হয়তো বা ভুল হয়ে থাকবে।"

"উনি তো ভুল করেন না। স্বয়ং শাহ-ই-আলিজার খুব বিশ্বাস ওঁর উপর।"

"তুমি জানোনা উদিপুরীবাঈ। আমি ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরে মা আমায় ইত্তলা দিয়েছিলেন।"

"কিছু বললেন হজরত বেগম সাহিবা ?"

"হ্যাঁ। শাহীমহল থেকে ফিরে এসে মজলিসে যাওয়ার আগে আলিজা মায়ের কাছে এসেছিলেন। মাকে বলেছেন, শাহজাদা আওরংজেব নাকি ওঁর কন্যা জিনত-উন-নিসার সঙ্গে বিজাপুরের নতুন সুলতান আলি আদিল শাহ্‌র বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। আলিজা মায়ের কাছে জানতে এসেছিলেন বিজাপুর সুলতানের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে মায়ের আপত্তি আছে কিনা। মা বললেন আলি আদিল শাহ অল্প বয়স্ক, কিন্তু এই বয়েসেই নাকি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল। আলিজা তখন বললেন,—সে সব শোনা কথা, সংবাদের যথার্থতা নির্ণয় না করে কিছু করা হবে না। এবং আওরংজেবের সঙ্গে বিজাপুর দরবারের যেই বিরোধ চলছে, সে সম্বন্ধেও আলা হজরত শাহ-ইন-শাহ্‌র চূড়ান্ত মনোভাব না জেনে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে না। লেগে যাবে ছয় সাত মাস সময়। এর মধ্যে বিজাপুর থেকে কোনো

একটা শুভসংবাদ এসে পড়বে বলে তিনি আশা করছেন। যা করবার তারপর হবে।"

"হুঁ।" নির্বিকার মুখ করে চুপচাপ শুনলো উদিপুরী। তারপর বললো, "ভালোই তো। বেগম সাহিবা একটা স্বাধীন রাজ্যের অধিশ্বরী হবেন।"

"না," মাথা নাড়লো পাক্-নিহাদ-বানু, "স্বাধীন রাজ্যের মালিক আমি হতে চাই না। আজ ভবানীদাসজীর কাছে না গেলে হয়তো এ প্রস্তাবে আমার আপত্তি থাকতো না। কিন্তু আমার নিয়তিই আজ আমায় মহলের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলো। আমার পক্ষে আর কাউকে বিবাহ করা সম্ভব নয়,—শুধু একজনকে ছাড়া। সে আমার জীবনে এসে গেছে।"

উদিপুরীর অত্যন্ত কৌতূহল হোলো, "সে কি? এ কি করে সম্ভব বেগম সাহিবা?"

"যা অসম্ভব, যা কল্পনাতীত, শেষ পর্যন্ত তাই সম্ভব হয়েছে," পাক্-নিহাদ-বানু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো, "উদিপুরীবাঈ, তোমায় আমার বন্ধু বলে মানি, যা কাউকে বলবার নয়, তা শুধু তোমায় বলতে পারি। সে জন্যেই তোমায় ইত্তলা দিয়েছি।"

"কে সে, বেগম সাহিবা?"

"সে একজন খুব সামান্য, সাধারণ আহাদি," বলতে বলতে পাক্-নিহাদ-বানুর মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়ে উঠলো, "কিন্তু সংসারে কোনো শাহজাদাই তার মতো সুন্দর নয়, তার মতো বীর নয়, তার মতো মহান নয়। একজন নারীর সম্মান রক্ষা করতে সে এগিয়ে এসেছিলো নিজের জীবন বিপন্ন করে।"

উদিপুরী অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হোলো দারার কন্যার কথা শুনে। বলে উঠলো, "একজন নারীর সম্মান রক্ষা করতে? কার? আপনার?"

"হ্যাঁ, শাহ-ই-বুলন্দ-ইকবাল শাহ-ই-আলিজা দারা শিকোর কন্যার হৃদয় আজ এক সামান্য আহাদির কাছে বিকিয়ে গেছে।"

সন্ধ্যার ঘটনাটা খুলে বললো পাক্-নিহাদ-বানু বেগম। ফেরার পথে নির্জন সড়কে নসরত খাঁ আর ওর এক অনুচর পাল্কির পথ আটকেছিলো। তখন তাদের নিরস্ত করতে এগিয়ে এসেছিলো ইয়ার ওসমান বেগ নামে একজন আহাদি।

"কী বাহাদুর, ভেবে দেখ উদিপুরী! আসাদ খাঁর ছেলে নসরত খাঁকে বড়ো বড়ো মনসবদারেরাও কিছু বলতে সাহস করে না, আর তার মোকাবিলা করতে গেল ফৌজের একজন সাধারণ আহাদি!"

"ইয়ার ওসমান বেগ!" নিজের মনে বললো উদিপুরী।

"তুমি ওকে চেনো?"

"না," উদিপুরী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো।

"ওঁর সন্ধান নাও। আমি ওঁর সঙ্গে মিলিত হতে চাই।"

"কাজটা অত্যন্ত কঠিন বেগম সাহিবা।"

"আমি জানি। কিন্তু যতই কঠিন হোক্, ওঁকে আমি আবার দেখতে চাই। আমি ধন চাই না, দৌলত চাই না, তখ্ত্ চাই না, কিছুই চাই না উদিপুরী,—আমি শুধু ওঁকে আরেকবার দেখতে চাই।"

উদিপুরীবাঈ মনে মনে খুব কৌতুকবোধ করলো। ভাবলো—পাক্-নিহাদ-বানু বেগম, তুমি মরেছো।

মুখে বললো, "দেখি বেগম সাহিবা, কি করতে পারি। আর কারো জন্যে না হোক, আপনার জন্যে তো নিশ্চয়ই যথাসাধ্য করবার চেষ্টা করবো।"

॥ তিন ॥

বছর দুয়েক আগে রোশন-আরাকে লেখা আওরংজেবের একটি নিশান উদিপুরী কৌশলে হস্তগত করেছিলো। সেই নিশানে মোগল সাম্রাজ্যের তখ্‌ত্‌ সম্পর্কে আওরংজেবের উচ্চাভিলাষের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিলো এবং সেজন্যে সেই নিশান শাহ জাহান কি দারার হাতে যাতে না পড়ে সে সম্পর্কে তৎপর ছিলো আওরংজেব এবং রোশন-আরা।

সেটি উদিপুরীর কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করার জন্যে রোশন-আরা যখন তাকে এবং খোজার ছদ্মবেশধারী নজিবউল্লা খোরাসানী নামে তার এক অনুরক্ত আহাদিকে ষড়যন্ত্র করে কেল্লার ভিতরে এনে আটক করেছিলো তখন তাদের সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে সহায়তা করেছিলো শাহ জাহানের তৃতীয় কন্যা গওহর-আরা।*

সে সময় থেকে গওহর-আরার সঙ্গে উদিপুরীর একটা সখ্যতা গড়ে উঠেছিলো। শাহজাদীর সহেলী বলে খাসমহলে অবাধ যাওয়া আসার একটা সুবিধে পেয়েছিলো উদিপুরীবাঈ।

সেদিন মধ্যাহ্নের এক ঘড়ি পরে এক খাদিমান এসে গওহর-আরাকে জানালো উদিপুরীবাঈ বেগম সাহিবার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

গওহর-আরা তখন শিশ্‌মহলের হামামে স্নান করছে। সেদিন শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র শরীর একটু অসুস্থ। দরবার হয়নি। গুসলখানায় উজীর মির জুমলা এবং অন্যান্য প্রধান ওমরাহদের সঙ্গে বসে প্রয়োজনীয় কিছু কাজ সেরে নিয়ে ফিরে গেছে খাসমহলে।

---

*এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আছে লেখকের "শাহজাদা" উপন্যাসে।

বাদশাহ যখন স্নান করতে আসে, তখন সঙ্গে থাকে দুই জীবিতা বেগম, আকবরাবাদীমহল আর ফতেপুরীমহল এবং অন্যান্য পরস্‌-তারেরা। কন্যারা থাকে না। ওরা আসে বাদশাহ স্নান করে ফিরে যাওয়ার পরে। সেদিন বাদশাহ শিশমহলে আসবে না বলে স্নান করতে এসেছিলো শুধু গওহর-আরা এবং তার বৈমাত্রেয় ভগ্নী পর্‌হুনর-বানু। জাহান-আরা গেছে শাহ জাহানের পরিচর্যা করতে। খাসমহলের দেওড়ির মর্মর-জাফরির ওপাশে উজীর মির জুমলা এসেছে রোশন-আরার সঙ্গে দেখা করতে। জাফরির অন্তরাল থেকে নিজের বিশ্বস্ত খাদিম খোজা লিয়াকত হোসেনের মারফতে গোপন আলোচনায় লিপ্ত হয়ে শিশমহলে আসবার অবকাশ পায়নি রোশন-আরাও।

উদিপুরীকে সেখানেই ডেকে পাঠালো গওহর-আরা। সে এসে যখন তসলিম জানালো তখন গওহর-আরার খাদিমান ওর গায়ে গস্থুল্‌ অর্থাৎ একরকমের তরল সাবান মাখিয়ে দিচ্ছে। উষ্ণ জলধারার প্রবাহ এসে পড়ছে এক প্রশস্ত মর্মর চৌবাচ্চায়। সেখানে নেমে গেল গওহর-আরা।

"কি খবর উদিপুরীবাঈ," গওহর-আরা মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলো।

রঙীন মর্মরের মেঝেতে নানারকম মাছের কারুকার্য। চৌবাচ্চার একপাশে মেঝের উপর বসে পড়লো উদিপুরী, তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। একটু দূরে স্নান করছে শাহ-জাহানের কন্যা পর্‌হুনর-বানু বেগম, তিন চারজন খাদিমান ব্যস্ত তাকে নিয়ে। চারদিকের দেওয়ালে আর ঘরের চালে সোনালী রূপালী কারু-কার্যের মাঝখানে অসংখ্য ছোটো ছোটো কাচ, প্রত্যেকটি কাচে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে স্নানরতাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। উপর থেকে ঝোলানো রয়েছে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রদীপ। তারই সামান্য আলো চারদিকে সহস্র সহস্র কাচখণ্ডে প্রতিফলিত হয়ে শতসহস্রগুণ বেশী

আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে সেই শিশমহল। নিচু অংশের মেঝের মর্মরে নানা ছাঁদের খোদাই। তার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে স্নানের জলের অবিরাম প্রবাহ। আলোকরশ্মির প্রতিফলন আর নির্মল বারিধারার প্রবাহে একটা অবর্ণনীয় অপরূপ হিল্লোল ছন্দময় হয়ে জেগে উঠেছে সেই মেঝের উপর। চারদিকে ফোয়ারা থেকে নির্গলিত হচ্ছে সুরভিত স্নানের জলের অসংখ্য ধারা। বর্ণে গন্ধে আলোকরশ্মিতে চারদিকে এক অপরূপ শোভা।

পর্হুনর-বানু বেশ একটু দূরে। উদিপুরী নিচু গলায় গওহর-আরাকে বললো, "বেগম সাহিবা, আপনার কাছে একটা জরুরী দরকারে এসেছি।"

গওহর আরা উঠে এলো গরম জলের চৌবাচ্চা থেকে। খাদিমান শুভ্র মলমল দিয়ে পুঁছে দিলো শাহজাদীর অঙ্গ।

"পেশ করো তোমার আরজ্," হাসি মুখে বললো গওহর-আরা।

"ব্যাপারটা একটু গোপনীয়," নিচু গলায় জানালো উদিপুরী।

গওহর-আরা চকিতদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো চারদিকে। গরম জলে স্নান হয়ে গেছে। এবার স্নান করতে হবে সুগন্ধ জলে। খাদিমানের হাত থেকে সাবুনী-ই-চামেলি, অর্থাৎ চামেলির নির্যাস-সুরভিত সাবান নিয়ে নিলো গওহর-আরা। সাবান মাখিয়ে দেওয়ার কাজ খাদিমানের, কিন্তু নিজেই সাবানটা নিয়ে অন্য দিকের একটি গোলাপজলের ফোয়ারার পাশে গিয়ে বসলো, আর সঙ্গে ডেকে নিলো উদিপুরীকে। নিচু মেঝের পাশে উঁচু মেঝেতে বসে পড়লো উদিপুরী।

গায়ে সাবুনী-ই-চামেলি মাখতে মাখতে গওহর-আরা বললো, "বলো, কি ব্যাপার?"

"আপনার কাছে এই আরজ্ নিয়ে এসেছি যে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করে আওরঙ্গাবাদে শাহজাদা আওরংজেবের কাছে

একটি নিশান লিখবেন। শাহী ডাক-চৌকির মারফত বেগম সাহিবার নিশান অতি দ্রুত পৌঁছে যাবে।”

“খুব জরুরী খবর ?”

“অত্যন্ত জরুরী।”

“কি লিখতে হবে বলো,” গোলাপ জলের ফোয়ারার নিচে দাঁড়িয়ে সারা অঙ্গ থেকে সাবুনী-ই-চামেলির শুভ্র ফেনপুঞ্জ ধুতে ধুতে বললো গওহর-আরা। শুভ্র দেহের উপর জলধারার প্রবাহের হিল্লোল যেন ম্লান করে দিলো ঘরের মেঝের খোদাই করা কারুকার্যের উপর স্নানের জলের প্রবাহের নানা ছন্দের বৈচিত্র্য।

চারদিকে আবার তাকিয়ে দেখলো উদিপুরীবাঈ। তারপর বললো, “একথা শাহজাদাকে জানাতে হবে যে আঠারো বছর আগে এক বিজাপুরী চিড়িয়ার বাসা থেকে ডিম খোয়া গিয়েছিলো বলে এদ্দিন সেই চিড়িয়া তা’ দিয়েছে নকল ডিমে। আসল ডিম কোথায় কার কাছে আছে তার হদিশ জানে উদিপুরীবাঈ। এই আসল ডিম হাতে পাওয়ার আগে শাহজাদার শিকারীরা যেন চিড়িয়ার বাসা গাছ থেকে পেড়ে আনবার চেষ্টা না করে। উদিপুরীবাঈ জানতে চায় শাহজাদা কি ইনাম দেবে ?”

গওহর-আরার মুখে একটা গাম্ভীর্যের ছায়া খেলে গেল এক-পলকের জন্যে। তারপর আবার হাসিমুখেই নিচু গলায় বললো, “তুমি কি বলতে চাইছো আমি বুঝতে পেরেছি। এ গুজব আমিও শুনেছি। কিন্তু কি ঝুঁকি তুমি নিজের উপর নিচ্ছো তুমি জানো না। এই খবর অনেকেই চায়। যদি জানতে পারে যে, তুমি জানো, বিপদে পড়ে যেতে পারো। যারা এখবর গোপন রাখতে চায়, ওরা তোমায় হত্যা করতেও পশ্চাদপদ হবে না।”

“আমি সবই জানি, বেগম সাহিবা।”

“তুমি সত্যি সত্যিই এর সন্ধান জানো ?”

“বেগম সাহিবা,” উদিপুরীর ঠোঁটের কোণে একটা জটিল হাসি

স্ফুরিত হোলো. "এই আসল ডিম ফুটে যে চিড়িয়া বেরিয়েছে সে আমার খাঁচায় বাঁধা পড়ে যাবে সোনার শিকলে, আর উড়ে পালাতে পারবে না।"

গওহর-আরার স্নান শেষ হোলো। ইসারা পেয়ে ওর খাদিমান কাছে এসে শুভ্র মস্‌লিন দিয়ে অঙ্গ পুঁছে দিয়ে, সারা গায়ে মাখিয়ে দিলো শ্বেতচন্দনকাষ্ঠের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ। নিচু মেঝে থেকে উঁচু মেঝেতে উঠে এলো গওহর-আরা। বসনগুলো নিয়ে এলো আরেকজন খাদিমান। পরিয়ে দিলো একটির পরে একটি। খুশ্‌বু-খানার দারোগার কাছ থেকে ইতর-ই-জাহাঙ্গিরী নামক মহার্ঘ আতর নিয়ে এসেছে আরেকজন খাদিমান। কয়েক ফোঁটা হাতে মেখে নিলো গওহর-আরা। তারই সৌরভে আমোদ হয়ে উঠলো সারা শিশমহল।

"আমি একটা কথা ভাবছি," গওহর-আরা জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কিছু মনে কোরো না, তোমায় আমার সহেলী বলে মান দিয়েছি, তাই জিজ্ঞেস করছি। তুমি থাকো শাহ-ই-আলিজার সঙ্গে, এ খবর আওরংজেবকে জানানোয় তোমার কী স্বার্থ?"

"কোনো স্বার্থই নেই বেগম সাহিবা," শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো উদিপুরীবাঈ, "আমরা শুধু ইতিহাসের প্রতি কর্তব্য পালন করছি। আমি আমার নারীর মন দিয়ে বুঝতে পেরেছি ইতিহাসের আগামী পরিচ্ছেদের নায়ক শাহজাদা আওরংজেব। আপনি, আমি, আমরা সবাই শাহজাদা আওরংজেবের খাদিমান। তাঁর খিদমত করা আমাদের কর্তব্য। এবং তাঁর একথা অবগত হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

অপরাহ্ন হতে না হতেই ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে পশ্চিম থেকে। নিজের কক্ষে চুপচাপ বসে ছিলো রোশন-আরা বেগম। একজন খাদিমান হুসেন সনাইএর দিওয়ান পড়ে শোনাচ্ছিলো। জরির কাজ করা মস্‌নদে ঠেস দিয়ে শুনছিলো

রোশন-আরা, কিন্তু মন ছিলোনা কবিতায়। নানারকম চিন্তা জট পাকিয়ে উঠেছিলো মনের মধ্যে। বিজাপুরের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্যে দারা যে চেষ্টা করছিলো, সেটা সফল হয়নি। আওরংজেবকে মোগল ফৌজ নিয়ে বিজাপুর আক্রমণ করতে দেওয়ার হুকুম দেওয়া বাঞ্ছনীয়, উজীর মির জুমলার এ পরামর্শ শাহ জাহান মেনে নিয়েছেন। কিন্তু মির জুমলা নাকি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে দারা বিজাপুরের বর্তমান সুলতানের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করার কথা বিবেচনা করছেন। দারার মহলে মির জুমলার যে খোজা গুপ্তচর আছে তারই কাছে পাওয়া গেছে এই সংবাদ। একথা শুনে অবধি রোশন-আরার ভাবনা হয়েছে। দারা যদি এ ব্যাপারে শাহ জাহানের অনুমোদন পায়, তাহলে বিজাপুর সম্বন্ধে আওরংজেবের বর্তমান নীতি একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। দারার এই পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে হবে, যে করেই হোক। কি ভাবে কি করা যায়, চোখ বুজে বসে তাই ভাবছিলো রোশন-আরা।

এমন সময় মহলদার নিজে এসে জানালো, শাহজাদী পর্‌হুনর-বানু বেগম ছোটী বেগম সাহিবাকে তসলিম জানাবার জন্যে তশরিফ আনছেন।

"ওঁকে গিয়ে জানাও আমি খুব আগ্রহভরে তাঁর প্রত্যাশায় বসে আছি," দরবারী কেতা অনুযায়ী উত্তর দিলো রোশন-আরা। একটু বিরক্ত হোলো মনে মনে। এসময় কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অভিলাষ তার ছিলো না।

পর্‌হুনর্‌-বানু ঘরে ঢুকে রোশন-আরার সামনে গালিচার উপর বসলো। খাদিমান ওর দিকে আরেকটি মস্‌নদ্‌ এগিয়ে দিয়ে দিওয়ান বন্ধ করে উঠে পড়লো। শাহ জাহানের দুই কন্যা যখন নিভৃতে কথাবার্তা বলবে, তখন খাদিমানের সেখানে বসে থাকা আদব নয়।

যথারীতি কুশল বিনিময় হোলো খানদানী ভাষায়। ফারসী ছিলো দরবারের ভাষা কিন্তু মহলের ভিতর এরা বলতো হিন্দি আর ফারসীর এক মিশ্র ভাষা, যার আটপৌরে রূপ ফৌজী উর্দু বা ছাউনিতে উর্দু নামে পরিচিত ছিলো, কিন্তু যার অতি-মার্জিত অভিজাত ভঙ্গি শাহী মহলে পরিচিত ছিলো হিন্দুস্তানী নামে। সবে গড়ে উঠেছে এই ভাষা, সাহিত্যের নতুন ভাষার সমৃদ্ধি নিয়ে। তাই তার মধ্যে অভিজাত সংলাপের সামাজিক ব্যাকরণের আড়ষ্টতা ছিলো না, কিন্তু সংলাপ-শৈলীর একটা মাধুর্যময় লালিত্য ছিলো।

তারপর কথা প্রসঙ্গে পর্‌হুনর্‌-বানু বললো, "শুনছি, আলা-হজরত নাকি বিজাপুর আক্রমণে সম্মতি দিয়ে রাজী হয়েও একটু দ্বিধায় পড়েছেন।"

"এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে একটু সময় লাগে," উত্তর দিলো রোশন-আরা। পর্‌হুনর-বানুর কথা শুনে মনে কৌতুহল হলেও মুখের ভাবে বা ভাষায় কিছু প্রকাশ করলো না।

"জাহান-আরা তো সারা তুপুর আলা হজরতের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন," বলে গেল পর্‌হুনর-বানু, "আলা হজরত অসুস্থ বোধ করছেন শুনে আমি সাক্ষাৎ করবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু মহলদার জানালো, আলা-হজরত নিরিবিলিতে বিশ্রাম করতে চান, দেখা করতে চান না কারো সঙ্গে।"

রোশন-আরা তির্যক দৃষ্টিতে তাকালো তার বৈমাত্রেয় ভগ্নীর দিকে, তারপর একটু হেসে বললো, "এই মহলের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এখানে কোনো কথা গোপন থাকবার উপায় নেই। আলা হজরত নিরিবিলিতে বসে বিশ্রাম করছেন, শুধু জাহান-আরা আছে সেখানে, আর কারো যাওয়ার অনুমতি নেই, তবু তোমার একথা জানতে বিলম্ব হয়নি, ওরা কি বিষয়ে আলোচনা করছেন।"

মাপা হাসি হাসলো পর্‌হুনর-বানুও। উত্তর দিলো," "আলা হজরত ও উজীর মির জুমলার সঙ্গে সারা সকাল আলাপ আলোচনার

পর দারা গুসলখানা থেকে বেরিয়ে ভেতরে এসে জাহান-আরার সঙ্গে নিভৃতে কথা বললো অনেকক্ষণ। দারা চলে যাওয়ার পর জাহান-আরা সোজা চলে গেল আলা হজরতের কাছে। ইতিমধ্যে অসুস্থ বোধ করছেন বলে আলা হজরতও ইত্তলা দিয়েছেন জাহান-আরাকে। কিন্তু এ খবর পাওয়ার আগেই জাহান-আরা পৌঁছে গেছে আলা হজরতের কাছে। ওরা বসে আছেন মুসম্মন বুর্‌জএ। সবাই দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে যে ওঁরা কথা বলেই চলেছেন তখন থেকে। আলা হজরতের জন্যে যে ভোজন সামগ্রী গেছে, সেসব অসুস্থ লোকের খাদ্য নয়! এর পর, ওঁর কী অসুখ, ওরা কি নিয়ে আলোচনা করছেন, সেসব অনুমান করে নেওয়া, এমন কি আর শক্ত!"

"যাই হোক, বিজাপুর সম্বন্ধে যার যাই নীতি হোক, আমার কি?" নিস্পৃহভাব দেখাবার চেষ্টা করলো রোশন-আরা।

পর্‌হুনর-বানুও নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, তা তো বটেই। আমরা যখন শিশমহলে স্নান করছিলাম, সেখানেই খবর এলো যে উজীর মির জুমলা গুসলখানা থেকে বেরিয়ে এসে খাস-মহলের দেওড়িতে উপস্থিত হয়েছেন তোমায় তসলিম জানাবার জন্যে। আমি আর কি করে জানবো। আমাদের প্রিয় ভগ্নী গওহর-আরা বলছিলো ওর সহেলা উদিপুরীবাঈকে। তাই শুনতে পেলাম।"

রোশন-আরা সোজা হয়ে উঠে বসলো।

"উদিপুরীকে একথা জানিয়েছে গওহর-আরা?"

"হ্যাঁ, তাই তো শুনতে পেলাম।"

"উদিপুরীবাঈ শিশমহলে এসেছিলো?"

"গওহর-আরাই ওকে সেখানে ডাকিয়ে নিয়েছিলো।"

"হুঁ। আর কি কথাবার্তা হোলো ওদের মধ্যে?"

"বিশেষ কিছু শুনতে পাইনি," পর্‌হুনর-বানু উত্তর দিলো, "শুধু দেখলাম উদিপুরীবাঈ এলো, চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, তারপর

গলা নামিয়ে কিছু যেন বললো গওহর-আরাকে। গওহর-আরা ওকে সঙ্গে নিয়ে একটু দূরে একটা ফোয়ারার দিকে চলে গেল। অনেকক্ষণ নিচু গলায় কি যেন আলাপ আলোচনা হোলো ওদের মধ্যে। গওহর-আরার মতো হাসিখুশি মেয়েকেও দেখলাম একটু গম্ভীর, একটু চিন্তান্বিত।”

রোশন-আরা আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না, কপালের উপর আস্তে আস্তে ফুটে উঠলো একটা গভীর ভ্রূকুটি।

পর্‌হুনর্‌-বানু মনে মনে খুশি হোলো। মহলের অনেকেই জানতো উদিপুরীবাঈকে সহ্য করতে পারে না রোশন-আরা, কথাই বলে না ওর সঙ্গে। আসল কারণটা কেউই অবগত ছিলো না। তবে এরকম একটা অনুমান সবাই করতো যে কোনো একটা অজ্ঞাত ব্যাপারে উদিপুরীবাঈ রোশন-আরার কূটবুদ্ধি বানচাল করে দিয়েছিলো বলে এই পারস্পরিক জুগুপ্সা।

বিজাপুরের ব্যাপারে মহলের ভিতর যে একটা জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে একথা আঁচ করতে পেরেছিলো অনেকেই। এ ব্যাপারে দারা এবং জাহান-আরা যে আওরংজেব ও রোশন-আরার প্রতিপক্ষ, এটা বুঝতে কারো বিলম্ব হয়নি। পর্‌হুনর্‌-বানু অন্য এক বেগমের কন্যা, সুতরাং মহলে তার কোনো গুরুত্ব ছিলো না জাহান-আরা বা রোশন-আরার মতো, সে তার দুই বৈমাত্রেয় ভগ্নীর মধ্যে কখনো এর কখনো ওর মন যুগিয়ে চলবার চেষ্টা করতো। উদিপুরী যে কোনো গুরুতর ব্যাপারে গওহর-আরার কাছে এসেছিলো, এটা সে অনুমান করেছিলো। তাই ভেবেছিলো রোশন-আরা জানতে পারলে খুশী হবে।

পর্‌হুনর-বানু চলে যাওয়ার পর রোশন-আরা ইত্তলা দিলো তার বিশ্বস্ত খাদিম খোজা লিয়াকত হোসেনকে।

“আজ শাহ-ই-আলিজার বাঁদী সেই উদিপুরী এসেছিলো গওহর-আরা বেগম সাহিবার কাছে।”

"হ্যাঁ, ছোটী বেগম সাহিবা।"

"কেন এসেছিলো, আমার জানা দরকার।"

"আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। তবে শুনেছি কিছুক্ষণ আগে নাকি বেগম সাহিবা একটা নিশান পাঠিয়ে দিয়েছেন ডাক-চৌকির দারোগার কাছে। ওই নিশান আজ সন্ধ্যার জরুরী শাহী ডাকে চলে যাবে।"

"কে, গওহর-আরা? নিশান পাঠিয়েছে? কার কাছে?

"আওরঙ্গাবাদে আমাদের শাহজাদার কাছে।

"আচ্ছা! গওহর-আরা আওরংজেরকে দেখাতে চাইছে ও আমার চাইতে আওরংজের অনেক বেশী আপন? বোকা মেয়ে, ওই পাজী উদিপুরীকে তো চেনে না, পড়েছে ওর ফাঁদে। শোনো, তুমি গিয়ে দেখা করো শাহ-ই-আলিজার মহলের খোজা মকবুলের সঙ্গে, ওকে বোলো ও যেন একটু নজর রাখে উদিপুরীর উপর। আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। কি হচ্ছে ব্যাপারটা, আমার জানা দরকার।"

সারাদিন ধরে ইয়ার ওসমান বেগ্‌এর মনটা ছিলো খুব খুশী-খুশী।

ইয়ার ইসমাইল বেগ্ তাকে ভর্ৎসনা করেছিলো আগের দিন রাত্তিরে, নস্‌রত খাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়েছিলো বলে। একজন সম্ভ্রান্ত নারীর সম্মান রক্ষা করবার জন্যে যে তাকে বাধ্য হয়ে তলোয়ার বার করতে হয়েছিলো খাপ থেকে, তার এই কৈফিয়ত শুনতে চায়নি ইয়ার ইসমাইল বেগ্। বলেছিলো,—আমরা সাধারণ লোক। ওই বড় ঘরানার লোকদের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। আমি চাইনা যে আপাতত তুমি কোনো গোলমালে জড়িয়ে পড়ো। বড়ো কাজ করার সুযোগ জীবনে অনেক পাবে। তবে এখন কিছুদিন চুপ করে ধৈর্য ধরে থাকো। কোনোরকম হঠকারিতা করবার সময় এটা নয়।

ইসমাইল বেগ্‌কে সে নিজের পিতা বলেই জানতো। অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমীহ করতো তাকে, ভয় পেতো, ভালোও বাসতো। ইসমাইল বেগ্‌ নিজে অসি চালনায় অত্যন্ত সুদক্ষ, নিজের হাতে তাকে অসিবিদ্যা শিখিয়েছে। ওসমানের ধারণা তার পিতা ফৌজে থাকলে খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করতো। কিন্তু সে যে কেন যুদ্ধবিদ্যাকে নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেনি, একথা বুঝতে পারতো না। সে যে দারার অধীনে খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত আছে, এটা জানতো, তবে সে কাজ যে সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন নয়, একথাও বুঝতে পারতো। মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হোতো, কেন ইসমাইল বেগ্‌ কারো সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতে চায় না, তার জননী ফতিমারও সেই স্বভাব। প্রতিবেশী নারীদের সঙ্গে কোনো সখ্যতা নেই। পরিচয় ও করতে চায় না কারো সঙ্গে। ওসমানকেও কারো সঙ্গে বেশী মিশতে দেয়নি। সে বড়ো হওয়া অবধি তো ইসমাইল বেগ্‌ তাকে সব সময় সঙ্গে সঙ্গেই রাখতো। বড়ো হওয়ার পর ফৌজে আহাদি হয়ে যোগদান করার পর তার খানিকটা মেলামেশা করার স্বাধীনতা হয়েছে। তবু তার উপর ইসমাইস বেগ্‌ আর ফতিমা বিবির যথেষ্ট খবরদারি। সব সময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয় কোন সময় কোথায় ছিলো, কার সঙ্গে ছিলো।

অপছন্দ করলেও রাগ হয় না ওসমানের। ভাবে, বোধহয় বেশী বয়েসে হয় এরকম একটু খুঁতখুঁতে স্বভাব, বিশেষ করে সে ছাড়া তাদের আর কেউ নেই বলে। তাকে যেন বড় বেশী ভালোবাসে ইসমাইল বেগ্‌ আর ফতিমা বিবি। তার চেনাজানা অন্য কোনো ছেলেকে পিতামাতার স্নেহ এত বেশী পেতে দেখে নি ওসমান। খুব সাধারণ ভাবে থাকে ওরা, কিন্তু কোনোদিন কোনো অভাব সে নিজের বাড়িতে দেখেনি। তার সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ওদের সজাগ দৃষ্টি সব সময়,—কিন্তু আদর দিয়ে আয়েসী করে তোলেনি, নষ্ট হতে দেয়নি। সদ্বংশের ছেলেদের মতো সুশিক্ষিত করে তুলেছে

তাকে। চরিত্রে এতটুকু খাদ পড়তে দেয়নি। তার চেনাজানা সবাই তার সম্বন্ধে খুব উচ্চাশা পোষণ করে। বলে, সে নাকি এক দিন মনসবদার হবে। তারও তাই স্বপ্ন,—কিলিচ খাঁর মতো পাঁচ হাজারী মনসব তাকে পেতে হবে একদিন। মনে মনে ভাবে, তখন আর ইসমাইল বেগ্‌কে কাজ করতে দেবে না, হজ করতে পাঠিয়ে দেবে মক্কা শরীফে। ফতিমা বিবিকেও আর নিজের হাতে কাজ করতে দেবে না, দশটা বাঁদী রাখবে তার জন্যে। অন্তত একজন বাঁদী যে এখনো রাখতে পারে না, তা নয়, কিন্তু ফতিমা শুনবে না কিছুতেই। ঠাট্টা করে বলে, তুমি যদি কোনোদিন বাদশাহ হও, তাহলে আমার জন্যে বাঁদী রেখো। তার আগে নয়।

আগের দিন রাত্তিরের একটা কথা তার মনে বিঁধছিলো খচ্‌খচ্‌ করে। রাত্তিরে ঘুম হয়নি অনেকক্ষণ। পাশের ঘরে শুয়ে নিচু গলায় কথা বলছিলো ইসমাইল বেগ্‌ আর ফতিমা। কথাগুলো এত চাপাকণ্ঠে যে ওসমানের কানে আসেনি কিছু। শুধু এক সময় শুনতে পেলো, ইসমাইল বেগ্‌ বলছে,—আয়েশা, ব্যবস্থা তো সব হয়েছে, এর পর কি হবে না হবে সব খোদার মর্জি।

আয়েশা! ফতিমাকেই কি সম্বোধন করে বলছিলো ইসমাইল? আয়েশা কেন? ওর মায়ের নাম তো ফতিমা। আয়েশা কে?

মনে মনে অনেক ভেবেও এর কোনো সদুত্তর পায়নি ওসমান। স্থির করলো এক সময় মাকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।

সকালবেলা মন ছিল অসোয়াস্তিতে ভরা। কিন্তু একসময় মনসব্‌দার কিলিচ খাঁর একজন মির-দহ্‌ এসে জানালো কিলিচ খাঁ তাকে ইত্তলা দিয়েছে। কিলিচ খাঁর সঙ্গে দ্বিপ্রহরে যেতে হবে শাহ-ই-আলিজার মহলে। শাহী কেল্লা থেকে ফিরে এসে শাহ-ই-আলিজা দর্শন দেবেন তাঁদের দুজনকে।

কিলিচ খাঁর সঙ্গে যখন দারার মজলিস্‌-কক্ষে উপনীত হোলো ওসমান বেগ্‌, তখন আর কেউ সেখানে ছিলো না। নিজের

মুন্সিকেও চলে যেতে বললো দারা। অধীনস্থজনের সঙ্গে এরকম সাক্ষাতে প্রত্যক্ষভাবে কথোপকথন করা শাহজাদাদের রেওয়াজ নয়, কথাবার্তা হয় যে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তারই মারফতে। কিন্তু দারা সোজাসুজি কথা বললো তারই সঙ্গে।

শুরু করলো ভৎর্সনা করে।

"তুমি ইয়ার ওসমান বেগ্ ?" ঈষৎ হাস্য স্ফুরিত বদনে তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো দারা শিকো। "কর্তব্যনিষ্ঠ আহাদি বলে তোমার প্রশংসা আমি শুনেছি আমাদের বিশ্বাসভাজন মনসব্দার কিলিচ খাঁর কাছে। তোমাকে শিগ্গিরই মির দহ্র পদে উন্নত করবো ভাবছিলাম।"

ওসমান বেগ্ তসলিম জানালো।

"কিন্তু কাল তোমার সম্বন্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ এসেছে। নসরত খাঁ একজন মনসবদার। তুমি একজন আহাদি। তাঁর সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করা তোমার উচিত হয়নি।"

"আমি শুধু মাত্র অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলাম," কর্ণমূল আরক্তিম হোলো ওসমানের।

"হ্যাঁ। শুধু সেটা বিবেচনা করেই আমি কোতোয়ালিতে নির্দেশ দিয়েছিলাম তোমায় মুক্তি দিতে। তবে একথা মনে রেখো, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে অকারণ শত্রু সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

"তার জন্যে কি অন্যায় সহ্য করতে হবে শাহ-ই-আলিজা ?"

"না। তবে যা করবে একটু বুদ্ধিমানের মতো করবে, গোঁয়ারের মতো নয়। আর একটা কথা,—স্ত্রীলোকের বিপদে সাহায্য করতে যাওয়া প্রকৃত যোদ্ধার কাজ, কিন্তু তুমি কি ঠিক জানো সেই পাল্কিতে কোনো স্ত্রীলোক ছিলো কিনা ?"

"চোখে দেখে সে কথা যাচাই করা তো সম্ভব ছিলো না আলিজা।"

"তা বটে। কিন্তু তুমি গলার আওয়াজও শোনোনি। সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া নারী পর্দানশিন হতে পারে, কিন্তু বিপদাপন্ন নারীর আর্তকণ্ঠ তো আর পর্দানশিন নয়।"

"পাল্কির সঙ্গে যে খাদিমেরা ছিলো, ওদের একজন বলছিলো।"

"ওইটুকু প্রমাণে ধরে নিলে যে পাল্কির ভিতর একজন স্ত্রীলোক ছিলো? নাও তো থাকতে পারতো। মনে করো যদি তুমিই থাকতে পাল্কির ভিতর,—কে জানতে পারতো?"

"কেরামৎ কেরামৎ," হাসতে হাসতে বলে উঠলো কিলিচ খাঁ।

দারাও হাসলো। "অবশ্য, এসব কথার কথা। শুধু তর্ক করে একটা অন্য সম্ভাবনার কথা জানাচ্ছি মাত্র। হয়তো সেই পাল্কিতে ছিলো একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা, কোনো না কোনো কারণে নিজের পরিচয় জানাতে চায়নি। এবং জোর করে পরিচয় জানতে চাওয়ার অধিকারও নসরত খাঁর নেই। সে অধিকাব আছে শুধু কোতোয়ালের। আমি শুধু তোমায় বলতে চাই একথা যে,—নিশ্চিত না জেনে কোনো নারীর সাহায্যে অগ্রসর হোয়ো না, এবং কখনো কোনো অপরিচিতা নারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ কোরো না। অনেক সময় তার জন্যে বিপদে পড়তে হয়। তোমাকে আমি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে বাইরে পাঠাচ্ছি। এজন্যে তোমায় সতর্ক করে দেওয়া তোমার হিতৈষী এবং মালিক হিসেবে আমার কর্তব্য।"

ওসমান আবার তসলিম করলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আমায় বাইরে পাঠাচ্ছেন আলিজা?"

"হ্যাঁ। আমি ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌কে এমন একটা কাজের ভার দিয়েছি, যাতে তোমার সাহায্য প্রয়োজন। যা কিছু নির্দেশ সব তার কাছেই পাবে। কাজটা খুব গোপনীয়। এতে অসীম সাহস এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দুটোই দরকার। তুমি দু-চার দিনের মধ্যেই ইসমাইল বেগ্‌এর সঙ্গে আগ্রা ত্যাগ করবে।"

ওসমান খুব বিস্ময়াপন্ন হোলো, কারণ ইসমাইল বেগ্ তাকে এ সম্বন্ধে কোন আভাসই দেয়নি। তবে কিছু বললো না সে, খুশিই হোলো মনে মনে।

দারা বলে গেল, "আমি তোমার কর্তব্যনিষ্ঠা এ পর্যন্ত বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। এবং যা শুনেছি তোমার সম্বন্ধে, তাতে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেছি। আজ তোমাকে একটা বিশেষ ইনাম দেবো বলেই তোমাকে ইত্তলা দিয়েছি।"

একপাশে রাখাছিলো একটি তরবারি। দারা সেটি তুলে নিলো। দারার ইসারা পেয়ে কাছে এগিয়ে গেল ওসমান, গ্রহণ করলো দারার হাত থেকে।

"এটা সমরকন্দের বিখ্যাত তরবারি-নির্মাতা উস্তাদ রফিউদ্দিন আগার নিজের হাতে তৈরি। আমি বিশ্বাস করি তোমার হাতে এই তরবারির অমর্যাদা হবে না।"

"কক্ষনো না, শাহ্-ই-আলিজা," বলে উঠলো ওসমান বেগ্। তসলিম করলো দারাকে। তারপর খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বার করলো। চিকন ইস্পাতের উপর আলোর প্রতিফলনে ঝক-মক করে উঠলো সেই তরবারি। দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে ধরে অস্ত্রের ওজন অনুভব করলো ওসমান। অতি হাল্কা, কিন্তু ক্ষুরের মতো কঠিন নির্মল, শীতল, ধারালো। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওসমানের মুখমণ্ডল।

দারাকে তসলিম করে বিদায় গ্রহণ করলো ইয়ার ওসমান বেগ্।

হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলো ওসমান, বাড়ির কাছাকাছি গলির বাঁকে একটি লোক তার সামনে এসে দাঁড়ালো। সালাম করে সম্বোধন করলো,—"ইয়ার ওসমান বেগ্!"

"কে তুমি?" বিস্মিত হয়ে ওসমান জিজ্ঞেস করলো।

"আমায় চিনতে পারছেন না?"

"না তো—।"

"পরশু সন্ধ্যের পর আমাদের মালকিনের পাল্কির সঙ্গে আমাকে দেখেন নি?"

"ও—।" এতক্ষণে ওসমানের মনে পড়লো। এ লোকটাই পাল্কির মহিলার হয়ে উত্তর দিচ্ছিলো নসরত খাঁর প্রশ্নের।

"কি চাও তুমি?" ওসমান জিজ্ঞেস করলো।

"আমাদের মালকিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।"

"সাক্ষাৎ করতে চান!" বিস্মিত হোলো ওসমান। "কেন?"

"তিনি নিজের মুখে আপনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চান।"

হঠাৎ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলো ওসমান। তার মাত্র আঠারো উনিশ বছর বয়েস, এক অপরিচিতা যুবতীর প্রশংসাভাষণ মনে একটু আত্মপ্রসাদ এনে দিলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তৎকালীন সমাজে সম্ভ্রান্ত ঘরের হারেম-ললনা প্রায় অসূর্যম্পস্যা, কিন্তু সমস্ত রকম পারিবারিক বা সামাজিক কড়াকড়ি সত্ত্বেও যে অনাত্মীয় তরুণ-তরুণীদের গোপনে সাক্ষাৎ হয় না, তাও নয়। তবু ওসমান একটু অসোয়াস্তি বোধ করলো। বললো, "কিন্তু এভাবে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কি ঠিক হবে? উনি যে আমাকে স্মরণ রেখেছেন, আমি তাতেই কৃতার্থ। ওঁকে আমার সালাম জানাবেন আর বলবেন মার্জনা করতে।"

খোজা মহম্মদ লতিফ শান্ত কণ্ঠে বললো, "ওমমান বেগ্! আমার মালকিন যে শুধু সৌজন্য করবার জন্যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান তা নয়। কোনো বিশেষ কারণে তিনি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। তিনি বিশ্বাস করেন যে, শুধু আপনার মতো একজন অকুতোভয় বীরপুরুষই তাঁর উপকার করতে সক্ষম। আপনার মতো একজন মহৎ ব্যক্তি যে তাঁকে নিরাশ করবেন না এটাই তাঁর দৃঢ় ধারণা।"

"আমার সাহায্যপ্রার্থী তিনি? কোনো বিশেষ কারণে? সেই কারণটা কি?" জিজ্ঞেস করলো ওসমান।

"আমি সঠিক জানি না, ওসমান বেগ্। সাক্ষাতে তিনিই সব খুলে বলবেন।"

একটু ভাবলো ওসমান, তারপর রাজী হয়ে গেল। এ পর্যন্ত ইব্রাহিম বেগ্ আর ফতিমা বিবির কড়া তত্ত্বাবধানে দিন কেটেছে, এরকম অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। দেখাই যাক না কি ব্যাপার,—ভাবলো সে,—তুদিন পর তো চলেই যাচ্ছি আগ্রা থেকে, মনে রাখবার মতো একটা নতুন কিছু অভিজ্ঞতা হলে ক্ষতি কি?

"বেশ, কোথায় সাক্ষাৎ হবে তাঁর সঙ্গে?"

"সন্ধ্যেবেলা মমতাজ-আবাদে তাজমহলের দক্ষিণের সির্‌হি দরওয়াজার কাছে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। আমি এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো আপনাকে," বললো খোজা মহম্মদ লতিফ।

সারাদিন কেটে গেল একটা অনির্বচনীয় পুলকের আবেশে। খুব ভালো লাগছিল ওসমানের। নানারকম কল্পনার জাল বুনলো মনে মনে। কে জানে কিরকম দেখতে এই অপরিচিতা নারী, নিশ্চয়ই বুলবুলের মতো মধুর তার কণ্ঠ, আশ্চর্য শান্ত তার সুর্মা আঁকা আনত নয়ন। কিন্তু তার মুখ হয়তো দেখতে পাবেনা সে, বোরখা না পরুক, নকাব্এ মুখ ঢেকে রাখবে নিশ্চয়ই। কি বলবে সে? জনপ্রিয় কবিদের শেরগুলো ওসমানের মনে পড়তে লাগলো।

সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করলো না। অপরাহ্ন হতে না হতেই বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে। কে জানে শেষ মুহূর্তে ইসমাইল বেগ্ কি ফতিমার কোনো না কোনো ফরমায়েশে যদি আটকে যায়। তলোয়ার নিলো না সঙ্গে, যৌবনের প্রথম অভিসারে সশস্ত্র হয়ে বেরোনো তার কাছে অত্যন্ত হাস্যকর মনে হোলো। হাতে

অনেক সময়, হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল তাজ্‌এর পূর্বদিকে ফতেহ্‌-আবাদের দিকে। সেখানে সাধারণ লোকের ঘন বসতি বাজার দোকানপাটে ঠাসাঠাসি। একটি ছোটো কাফিখানায় বসে কাফি পান করলো কিছুক্ষণ, তারপর গিয়ে বসলো যমুনার পাড়ে। অস্ত-গামী সূর্যের আলোয় তখন এক অপরূপ শোভা ধারণ করেছে তাজমহলের মর্মর গম্বুজ। নদীর উপরে মেহ্‌তাব-বাগে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সান্ধ্যভ্রমণ করতে এসেছে অভিজাতবংশীয় যুবাপুরুষেরা। জলের বুকে ভেসে যাচ্ছে কোনো এক ওমরাহ্‌এর মোর-পংখ্‌ বজরা। সেখানে নাচ গানের মাইফিল বসেছে, শ্রোতের কলতানের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে কোনো এক কিন্নরকণ্ঠী তওআয়ফএর সুমার্জিত কণ্ঠ।

ও এক অন্য দুনিয়া,—একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ওসমান ভাবলো,—ও কি কোনোদিন আমারও হবে!

একটু একটু করে অন্ধকার নামছে পূবের আকাশে।

সময় হয়ে এলো। প্রহর শেষের নাকাড়াধ্বনির মৃদু রেশ ভেসে এলো সুদূর পশ্চিমের শাহী কেল্লা থেকে। আস্তে আস্তে উঠে পড়লো ওসমান বেগ্‌। হাঁটতে হাঁটতে ফতেহ্‌-আবাদ পেছনে ফেলে এসে পড়লো মমতাজ্‌-আবাদ অঞ্চলে, তারপর জনাকীর্ণ অঞ্চল অতিক্রম করে চলে এলো তাজ্‌এর সির্‌হি দরওয়াজার কাছে।

এদিকটা বেশ নির্জন। পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি বহু পুরাতন বটবৃক্ষ। তার নিচে ঘন ছায়া। ওসমান দেখতে পেলো, সেই ছায়ায় নামানো রয়েছে একটি পাল্কি। বাহকেরা দাঁড়িয়ে আছে ছায়ার অন্তরালে।

ওসমানকে আসতে দেখে ছায়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো একটি লোক, উঠে এলো রাস্তার উপর। ওসমান বেগ্‌ কাছে এসে দেখে, সকালের সেই লোকটি। সে ওসমানকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে

গেল পাল্কির কাছে। পাল্কির দরজায় নানারঙের কাচের পুঁতির ঝালর। আধো অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো ওসমান, যদি পাওয়া যায় অন্তরালবর্তিনীর একটুখানি আভাস, যদি শোনা যায় চুড়-কঙ্কনের ঈষৎ শব্দ।

"এবার ঢুকে পড়ুন পাল্কির ভিতর," খোজা মহম্মদ লতিফ বললো।

"পাল্কির ভিতর!" বিস্মিত হোলো ওসমান বেগ।

"হ্যাঁ, কেউ দেখতে পাওয়ার আগে। চটপট।"

"কিন্তু—কিন্তু পাল্কির ভেতরে যিনি আছেন, এটা কি তাঁর প্রতি বেআদবী হবে না?" অনিশ্চিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ওসমান।

"ভেতরে কেউ নেই," মহম্মদ লতিফ উত্তর দিলো, "পাল্কি আপনার জন্যেই আনা হয়েছে। আপনাকে আমরা নিয়ে যাবো আমাদের মহলে। প্রকাশ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই এ ব্যবস্থা।"

বিনাবাক্যব্যয়ে পাল্কির ভিতর উঠে বসলো ওসমান বেগ্। পাল্কিবাহকেরা পাল্কি তুলে নিয়ে রওনা হোলো। পাল্কির ভিতর অন্ধকার, আর আতরের মৃদু সৌরভ। এতেই যেন সেই অপরিচিতার সান্নিধ্য অনুভব করতে পারলো ওসমান। কিন্তু সোয়াস্তি বোধ করছিলো না মোটেও। বুকের স্পন্দন হঠাৎ খুব দ্রুত হয়ে উঠেছে। ভয়ে নয়, কারণ ওসমান অসমসাহসী, ভয় কাকে বলে জানে না। কিন্তু কেন, বুঝতে পারলো না কিছুতেই।

অনির্দিষ্ট পথ ধরে পাল্কি দ্রুত চলছিলো হেলতে দুলতে। হঠাৎ থেমে গেল। শোনা গেল ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ এগিয়ে আসছে।

খোজা মহম্মদ লতিফ চলছিলো পাল্কির পাশে পাশে। নিচু গলায় বলে উঠলো, "সর্বনাশ, নসরত খাঁ আসছে।"

চুপ করে রইলো ওসমান। ভাবলো, তলোয়ারটা সঙ্গে আনলে হোতো।

নসরত খাঁ আসছিলো একাই। পাল্কির পাশ কাটিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ লাগাম কষে থেমে পড়লো।

"ওহে, তোমায় চিনি চিনি মনে হচ্ছে! তুমি ছিলে না সেই পাল্কির সঙ্গে পরশুদিন? তোমার মালকিন প্রত্যেকদিন মাশুকের সঙ্গে মিলতে বেরোন বুঝি?"

খোজা মহম্মদ লতিফ চুপ করে রইলো নসরত খাঁর কথা শুনে। পাল্কির ভেতরে ওসমান কৌতুকবোধ করলো। মনে পড়লো শাহ-ই-আলিজা দারা শিকোর সকাল বেলার কথাগুলো।

—তুমি কি করে জানো, ওসমান বেগ্, যে পাল্কির ভিতর ছিলো এক নারী?—তার কণ্ঠস্বর শুনেছো?—তার চুড়ির আওয়াজ শুনেছো?—তাহলে?

শাহ-ই-আলিজা উপস্থিত থাকলে পরিস্থিতিটা খুব উপভোগ করতেন,—ওসমান ভাবলো।

নসরত খাঁর মেজাজটা আজ একটু ভালো। হাসতে হাসতে বললো, "তোমার মালকিনকে আমার সালাম জানিও। আজ আর তোমাদের পথ আটকাবো না, পরিচয় জিজ্ঞেস করে বিব্রত করবো না। সময় নেই, আমার মাশুক বসে আছে পথ চেয়ে, আর তোমরা তো আজ একেবারে নিঃসহায়। সেদিনকার সেই পাজী বাহাদুর আহাদিটাতো ধারে কাছে নেই। থাকলে অবশ্যি আজ ওকে একবার দেখে নিতাম।"

নসরত খাঁ চলে গেল ঘোড়া ছুটিয়ে। পাল্কি রওনা হোলো গন্তব্যস্থলের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নানা কণ্ঠের শোরগোল ওসমানের কানে এলো। বুঝতে পারলো যে কোনো একটা মহলের প্রাঙ্গনে ঢুকছে। চিৎকার করে পথ ছেড়ে দিতে বলতে লাগলো বাহকেরা।

এক জায়গায় পাল্কি থেমে গেল। কে যেন জোর গলায় হেকে উঠলো,"—হুকুমদার! কে যায় পাল্কিতে?"

খোজা মহম্মদ লতিফ উত্তর দিলো, "কে আবার? আমাকে সঙ্গে নিয়ে কে যায় সব সময়?"

"জিজ্ঞেস করাই রেওয়াজ, তাই জিজ্ঞেস করি," উত্তর এলো সেই কণ্ঠে, "দেওড়ি-চৌকি তো কোনো প্রশ্ন না করে পাল্কি ছেড়ে দিতে পারে না। দেখি মহলদারের দস্তক্।"

মহলদারের অনুমতিপত্র দেখালো খোজা মহম্মদ লতিফ।

কিন্তু পাল্কির ভেতর ওসমান বেগ চমকে উঠলো। দেওড়ি-চৌকি! মহলদারের দস্তক্! এই রেওয়াজ তো শুধু শাহী কেল্লার ভিতর শাহ-ইন-শাহ্ বাদশার খাসমহলে, আর এদিকে যমুনার পাড়ে শাহ-ই-আলিজা দারা শিকোর মহলে। কোথায় এলাম আমি?—বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলো ওসমানের কপালে।

পাল্কি চলে গেল মহলের ভিতর।

মহলের পেছন দিকে গোলাপবাগে একটি ফুলের কেয়ারির আড়ালে বসে ছিলো দারার কন্যা পাক-নিহাদ-বানু বেগম আর উদিপুরীবাঈ। দুজনের মুখই নকাব্এ ঢাকা।

উদিপুরী বললো, "আপনি এখান থেকে নড়বেন না বেগম সাহিবা। আগে আমি গিয়ে ওঁর অভ্যর্থনা করি, তারপর নিয়ে আসবো আপনার কাছে।"

মোগল শাহজাদীদের কাছে এ খেলা নতুন নয়, কিন্তু পাক-নিহাদ-বানু বেগমের এ অভিজ্ঞতা প্রথম। এতদিন শুধু শুনেই এসেছে অন্যদের সম্বন্ধে। চাপা গলায় বললো, "আমার ভয় করছে উদিপুরীবাঈ।"

"ভয়ের কি আছে, আমি তো আছি," আশ্বাস দিলো উদিপুরী, —"একবার যখন দেওড়ি-চৌকি পার করে নিয়ে আসতে পেরেছি,

তখন নিশ্চিন্ত। এখানে আর কেউ টের পাবে না।"

"যদি ধরা পড়ে যাই!"

উদিপুরী হাসলো। বললো, "আপনাকে কেউ কিছু বলবে না।"

পাল্কির ভিতর ওসমান অনুভব করলো, পাল্কি এসে থেমে পড়েছে এক জায়গায়।

"এবার বেরিয়ে আসুন," ডাকলো খোজা মহম্মদ লতিফ।

পাল্কির বাইরে এসে ওসমান দেখলো সন্ধ্যার অন্ধকার ছেয়ে গেছে চারদিকে। একটু একটু কুয়াশা, আকাশের তারাগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। সে যেখানে দাঁড়িয়ে সেটি একটি নিরিবিলি লতাবিতান।

পাল্কিবাহকেরা পাল্কি তুলে নিয়ে চলে গেল। খোজা মহম্মদ লতিফ ওদের পেছন পেছন মিশে গেল সন্ধ্যার অন্ধকারে। দূরে একটি মহল, আলো জ্বলে উঠেছে তার প্রত্যেকটি বাতায়নে। নারীকণ্ঠের দূরাগত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো সন্ধ্যার কনকনে হাওয়ায়, আর সেই হাওয়া কাঁপন ধরিয়ে দিলো ওসমানের সারা শরীরে।

পেছনে একটা মৃদু আওয়াজ শোনা গেল ঘনপত্রাবলীর মধ্যে। ওসমান বেগ্‌ ফিরে তাকালো। সন্ধ্যার হাওয়ায় লতাপুঞ্জের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারীমূর্তি। সেই আবছায়াতেও বোঝা গেল তুষারশুভ্র তার গায়ের রং, নিখুঁত ভাস্কর্যের মতো তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব। ঘনপক্ষ্মভার আয়তনেত্র গভীর দীর্ঘিকার মতো শান্ত। মুখের উপর একটা পাতলা রেশমের নকাব্‌।

ওসমানের মনে হোলো কথা আরম্ভ করতে হয় তাকেই। কি বলবে ভেবে পেলো না। ক্ষণিক নীরবতার পর বললো, "আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে এতখানি ঝুঁকি নেওয়া আপনার উচিত হয়নি।"

"আমার সম্মান রক্ষা করবার জন্যে এর থেকে অনেক বেশী ঝুঁকি আপনি নিয়েছিলেন," উত্তর দিলো সেই নারী।

"ও কথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না। আমি আমার কর্তব্য করেছি।"

"আপনি আজ আমার আমন্ত্রণ স্বীকার করবেন, আমি আশা করতে পারিনি।"

"আমি আপনার বান্দা." উত্তর দিলো ওসমান বেগ, "আমি আপনার হুকুম তামিল করেছি মাত্র।"

"আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে—।"

"আপনার যে কোন অনুরোধ আমি আদেশ বলে গ্রহণ করবো। বলুন, কি আপনার——"

কথা শেষ করতে পারলো না ওসমান। হঠাৎ পৃষ্ঠদেশে অনুভব করলো তরবারির অগ্রভাগ। সেই নারীর মুখ থেকে নির্গত হোলো একটা অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দ। সে দু-পা পেছনে সরে গেল।

"প্রতিরোধ করবার চেষ্টা কোরো না," পেছন থেকে বলে উঠলো এক পুরুষকণ্ঠ, "তলোয়ার পিঠের উপর আমূল বসিয়ে দেবো।"

আরো তিনজন সশস্ত্র খোজা সামনে এসে দাঁড়ালো।

"একে কেল্লার কয়েদখানায় নিয়ে যাও," বললো সেই নারী। ওসমান স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকালো, একেবারে বদলে গেছে নারীর কণ্ঠস্বর। তার সেই কোমল কৃতজ্ঞ ভাব আর নেই, কণ্ঠে ফুটে উঠেছে এক প্রভুত্বব্যঞ্জক কাঠিন্য।

"আমার সঙ্গে এই ছলনা করার কী প্রয়োজন ছিলো!" রুদ্ধ আক্রোশে বলে উঠলো ওসমান, "আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি?"

ওর কথার কোনো উত্তর দিলো না সে। আরেকজনকে বললো, "এ লোকটিকে তাড়াতাড়ি বার করে নিয়ে যাও মহল থেকে, কেউ যেন এর মুখ দেখতে না পায়। কয়েদখানার দারোগাকে জানাবে যে, এখান থেকে নিয়ে গেছ। তাহলে সে আর প্রশ্ন করবে না, একে আগে কোতোয়ালিতে নিয়ে যাওয়া হোলো না কেন। খবরদার, কোতোয়ালির কেউ যেন জানতে না পারে—।"

"এর প্রতিফল আপনাকে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই দেবো," দাঁতে দাঁত ঘষে ওসমান বেগ্ বললো।

নকাবের পেছন থেকে একটু শীতল হাসি শোনা গেল, খোজারা ওসমানকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলো আরেকজন। এবার বেরিয়ে এলো। সে খোজা মহম্মদ লতিফ।

"ওকে ফাঁদে ফেলা এত সহজ হবে ভাবতে পারিনি," বললো সে, "কি জানি একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় সে এলো কোন ভরসায়?"

"যে ভরসায় পতঙ্গ ছুটে যায় চিরাগ্ এর শিখার দিকে। এটা এই বয়েসেরই ধর্ম," উত্তর দিলো উদিপুরীবাঈ, "খোজা মকবুল কয়েদখানার দারোগাকে ঠিকমতো বোঝাতে পারবে তো? কোতোয়ালিতে জানতে পারলে ওরা শাহ-ই-আলিজাকে জানাবে। আর শাহ-ই-আলিজা জানতে পারুক এটা আমি চাই না।"

"মকবুল সব ঠিক করে নেবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"আমি এবার পাক-নিহাদ-বানুর কাছে যাই। সে হয়তো তার আশিকের প্রত্যাশায় বসে বসে মশকদংশন সহ্য করছে।"

খোজা মহম্মদ লতিফ একটু হাসলো।

ফুলের কেয়ারির পাশেও তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। অধীর আগ্রহে সেখানে অপেক্ষা করছিলো পাক-নিহাদ-বানু বেগম। ঘাসের উপর লঘু পদশব্দ শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো উদিপুরীবাঈ ত্বরিত-গতিতে ফিরে আসছে,—একাই।

"কি হোলো উদিপুরীবাঈ? তিনি কোথায়?" ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো পাক-নিহাদ-বানু।

"সর্বনাশ হয়েছে বেগম সাহিবা," ত্রস্তকণ্ঠে উদিপুরী উত্তর দিলো, "মহলের প্রহরীরা তাঁকে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে গেছে।"

"সে কি!" গালে হাত দিলো পাক-নিহাদ-বানু, "টের পেয়ে গেল কি করে?"

"জানি না, আমি ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম, হঠাৎ দেখি খোজা মকবুল তিনজন খোজা প্রহরী সঙ্গে নিয়ে ছুটে আসছে। ওঁকে সাবধান করে দেওয়ার আগেই ওরা এসে ওঁকে ধরে ফেললো।"

"সর্বনাশ! তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করলো না?"

"না, তার আগেই আমি অন্ধকারে লুকিয়ে পড়েছিলাম।"

"এখন কি হবে!" মাথায় হাত দিয়ে ঘাসের উপর বসে পড়লো পাক-নিহাদ-বানু। হতভাগ্য যুবকের কথা ভেবে তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। বললো, "আমারই মূর্খতার জন্যে ওঁর এই বিপদ ঘটলো। কেন আমি ওঁকে দেখতে চেয়েছিলাম! উনি আমার ইজ্জত বাঁচিয়েছিলেন একদিন, আর এই তার পুরস্কার? আমারই অপরাধে কঠিন শাস্তি পেতে হবে ওঁকে? উদিপুরীবাঈ, যদি ওরা ওঁকে কোতল করে?"

একটু চুপ করে রইলো উদিপুরী, তারপর পাক-নিহাদ-বানুর হাত ধরে ওকে টেনে তুললো, সান্ত্বনা দিয়ে বললো, "মহলে ফিরে চলুন, বেগম সাহিবা, এখানে বসে থেকে কোনো লাভ নেই। দেখি, আমি কি করতে পারি।"

"তুমি ওঁকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করো উদিপুরীবাঈ।"

"আমি নিশ্চয়ই আপ্রাণ চেষ্টা করবো বেগম সাহিবা।"

মহলের দিকে এগিয়ে চললো ওরা দুজনে। কি যেন ভাবছিলো পাক-নিহাদ-বানু। হঠাৎ থেমে পড়ে বললো, "আচ্ছা উদিপুরী-বাঈ, শাহ-ই-আলিজাকে আমি নিজে বলবো? আমার অনুরোধ উনি ঠেলতে পারবেন না।"

"না, না," ব্যস্ত হয়ে উঠলো উদিপুরী, "শাহ-ই-আলিজাকে কক্ষনো জানাবেন না একথা, তাহলে উল্টো ফল হবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না ওকে।"

শাহ-ই-আলিজা ঠিকই বলেছিলো,—ভাবলো ওসমান বেগ্—নিশ্চিত না জেনে কোনো নারীর সাহায্যে অগ্রসর হোয়ো না, এবং কখনো কোনো অপরিচিতা নারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ কোরো না, অনেক সময় তার জন্যে বিপদে পড়তে হয়। দারা শিকোর কথা যে এ ভাবে দিনে দিনেই ফলে যাবে কে জানতো!

কয়েদখানার দারোগা দবির আহ্মদ ভুঁড়ির উপর দু-হাত রেখে তাকিয়ে দেখলো ওসমান বেগ্কে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার নাম কি?"

একটু ভাবলো ওসমান বেগ্। মনে হোলো, তার আসল নাম এখানে জানানো উচিত হবে না। বললো, "আব্দুল হাকিম।"

"আব্দুল হাকিম! কি করো তুমি?"

"কিছু না, আমি একজন সামান্য মুসাফির।"

"শাহ-ই-আলিজার মহলে ঢুকেছিলে কেন?"

শাহ-ই-আলিজার মহলে! আকাশ থেকে পড়লো ওসমান। এতক্ষণে তার অপরাধের গুরুত্বটা সম্যক উপলব্ধি করলো। ভাবলো, আত্মপক্ষ-সমর্থনে এখানে কিছু না বলাই বাঞ্ছনীয়। সে যে কোনো একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে সেকথা বেশ বুঝতে পারলো। সত্যি কথা খুলে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না তার কথা।

কোনো উত্তর না পেয়ে দবির আহ্মদ বললো, "চুপ করে আছো যে! বোবা কয়েদীকে কি করে কথা বলাতে হয় আমরা খুব ভালো করেই জানি। দেখতে চাও আমাদের কৌশল?"

ওসমান চুপ করে রইলো।

"এ লোকটা সাধারণ ছিঁচকে চোর নয়," দবির আহ্মদ বললো খোজা মকবুলকে, "নিশ্চয়ই কারো চর। খুব খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে মহলে ঢুকেছিলো। দেখি, এর পেট থেকে কি করে কথা বার করা যায়। আজ কয়েদখানায় থাক। কাল একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

বিবিবাজারে দবির আহ্‌মদের জন্যে অপেক্ষা করছে এক তওআয়ফ্‌। একজন কয়েদীর পেছনে বেশী সময় নষ্ট করা সম্ভব নয় দবির আহ্‌মদের পক্ষে। প্রহরীদের বললো, "একে দক্ষিণ-দিকের কুঠুরিতে একলা রেখে দাও। এ এক অন্য জাতের কয়েদী। সবার সঙ্গে একে রাখা ঠিক হবে না।"

সন্ধ্যা অতীত হওয়ার দু-ঘড়ি পরে রোশন-আরা অনুমতি পেয়েছিলো শাহ জাহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার। সেখানে জাহান-আরা উপস্থিত ছিলো। তাই সাধারণ দু-চারটা কুশল প্রশ্ন করা ছাড়া অন্য কোনো কথাবার্তার সুযোগ হোলো না। রোশন-আরার খুব ইচ্ছে ছিলো বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার পর আওরংজেবকে সহায়তা করবার জন্যে মির জুমলাকেও দক্ষিণে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করা এবং সুলতান পারভিজের পুত্রের সঙ্গে দারার কন্যা পাক-নিহার-বানুর বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। কিন্তু জাহান-আরার জন্যে বেশী কথা বলার অবকাশ হোলো না। মনের রাগ মনে চেপে বাদশাহ্‌র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসতে হোলো রোশন-আরাকে।

নিজের মহলে ফিরে এসে দেখে খোজা লিয়াকত হোসেন অপেক্ষা করছে।

"কোনো সংবাদ আছে লিয়াকত হোসেন?"

"হ্যাঁ, ছোটী বেগম সাহিবা। সন্ধ্যার কিছু পরে শাহ-ই-আলিজার মহলদার জুলেখাবানু লোক পাঠিয়েছিলো আমার কাছে। একটু আগে খোজা মকবুলও আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে।"

"কিছু জানা গেছে?"

"আজ সন্ধ্যেবেলা শাহ-ই-আলিজার মহলের পেছন দিকের গোলাপ-বাগে এক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে বন্দী করেছে খোজা মকবুল এবং মহলের আর কয়েকজন খোজা। উদিপুরীবাঈ-

য়ের নির্দেশে তাদের আগের থেকে খবর দিয়ে রেখেছিলো উদিপুরী-বাঈয়ের খাদিম খোজা মহম্মদ লতিফ।"

"উদিপুরী কি করে জানতো যে সে লোকটি আসবে?"

"মহম্মদ লতিফের সাহায্যে উদিপুরীবাঈই তাকে ছলনা করে নিয়ে এসেছিলো গোলাপ-বাগে।"

"আচ্ছা! লোকটি এখন কোথায়? কোতোয়ালিতে?"

"না বেগম সাহিবা। উদিপুরীবাঈয়ের কড়া নির্দেশ ছিলো ওকে যেন কোতোয়ালিতে না পাঠানো হয়। ওকে কয়েদখানার দারোগা দবির আহ্‌মদের হেপাজতে রাখা হয়েছে।"

"কেন?" নিজের মনে বললো রোশন-আরা, "কোতোয়ালিতেই তো পাঠানোর কথা। কয়েদখানার দারোগার কাছে তো সোজা পাঠানোর কথা নয়! দবির আহ্‌মদ দারার লোক। শহর কোতোয়াল ইমরাদ খাঁ আমাদের লোক, আওরংজেবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সে জন্যেই কি?—নাম কি এই লোকটার?"

"কয়েদখানার দারোগাকে সে আব্দুল হাকিম, এই নামই জানিয়েছে। সত্যি কি মিথ্যে বলতে পারিনা।"

"ওর পেশা কি?"

"দবির আহ্‌মদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছে, সে একজন সামান্য মুসাফির। মকবুল বললো, ওর কথা শুনে মনে হয় সে আসল পরিচয় গোপন করছে। দবির আহ্‌মদের ধারণা, ও কারো চর।"

"হুঁ।" নিজের মনে একটু ভাবলো রোশন-আরা। তারপর বললো, "আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে। যার লোকই হোক, মনে হয় শাহ-ই-আলিজার লোক নয়। উদিপুরী যখন এত কৌশল করে তাকে আটকে ফেলেছে, তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো একটা ব্যাপার আছে। ওকে আমি বিশ্বাস করি না। ও শাহজাদা আওরংজেবকে জানতে দিয়ে চায় যে সে তারই শুভাকাঙ্খী। কিন্তু আসলে সে অত্যন্ত সুবিধাবাদী।"

একটু অস্থির হয়ে উঠেছিলো রোশন-আরা। দু-একবার পায়চারি করলো ঘরের মধ্যে, তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, "লিয়াকত, এই আব্দুল হাকিম লোকটাকে আমার চাই। ওকে দখলে রাখা যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে উদিপুরীর দখলে থাকার চাইতে আমার দখলে থাকাই বাঞ্ছনীয়।"

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সায় দিলো খোজা লিয়াকত হোসেন।

রোশন-আরা বলে গেল, "দবির আহ্‌মদ নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাড়ি ফিরে গেছে। আব্দুল হাকিমকে যেমন করে হোক বার করে নিয়ে আসতে হবে। তবে কয়েদখানার চৌকি যেন জানতে না পারে কে ওকে বার করে নিয়ে এসেছে, এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে। কি করে সেটা করবে, তোমায় নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না?"

"কোথায় আনবো তাকে?"

"মহলের নিচে তহ্‌খানায়। খুব ভালো করে চোখ বন্ধ করে দেবে। আমাকে খবর দিও। আমি সেখানে আসবো।"

"আপনি!" একটু যেন বিস্মিত হোলো লিয়াকত হোসেন।

"হ্যাঁ। আমি জানতে চাই লোকটা কে,—যাও, দেরি কোরো না।"

আরাম-গাহ্‌তে যাওয়ার আগে দারা শিকো কিছুক্ষণের জন্যে এলো নাদিরা-বানু বেগমের মহলে। এ সময় পুত্রকন্যারাও মিলিত হয় পিতার সঙ্গে। সেখানে সুলেমান শিকো, সিপিহ্‌র্ আর জাহাঁজেব্-বানুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলো পাক-নিহাদ-বানুও।

দারার মন সেদিন একটু অস্থির। নিশ্চিত জানা গেছে যে, শাহ জাহান আওরংজেবকে বিজাপুর আক্রমণ করবার নির্দেশ দিতে মনস্থির করেছে। দারা স্ত্রীপুত্রকন্যাদের সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা

বলার চেষ্টা করলেও কারো বুঝতে বাকি রইলো না দারার মানসিক অবস্থা। সহজ সাধারণ ঘরোয়া কথাবার্তা বলে দারার মন একটু হাল্কা করে দেওয়ার চেষ্টা করলো নাদিরা-বানু, কিন্তু বিশেষ সফলকাম হোলো না। নানা কথার মাঝখানে একসময় বললো, "জানেন আলিজা, আজ মহলের গোলাপ বাগে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি লুকিয়ে প্রবেশ করেছিলো। খোজা মকবুল আর অন্যান্য কয়েকজন খোজা ওকে দেখতে পেয়ে ধরে ফেলেছে।"

"তাই নাকি ? কোথায় সেই লোকটি ?"

"ওকে কেল্লার কয়েদখানায় নিয়ে গেছে।"

ভ্রূকুটি দেখা দিলো দারার ললাটে। বললো, "মহলের ভেতর এসেছিলো কি উদ্দেশ্যে ? প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে ঢুকতে পারলো কি করে ?"

"কি উদ্দেশ্য জানা যায়নি," উত্তর দিলো নাদিরা-বানু, "তবে মহলের পাহারা আরো বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। পরিস্থিতি ক্রমশ যেরকম জটিল হয়ে উঠছে, তাতে আপনার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমাদের আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে।"

"জানতে হবে লোকটার কি উদ্দেশ্য ছিলো। দবির আহ্‌মদ আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত। কাল ওকে ইত্তলা দেবো। বন্দীরা ওর কাছে কোনো কথা গোপন রাখতে পারে না। এসব ব্যাপারে কেল্লার কয়েদখানার ব্যবস্থাগুলি খুবই নিখুঁত।"

বিবর্ণ হয়ে গেল পাক-নিহাদ-বানুর মুখমণ্ডল। সুলেমান ভগ্নীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার শরীর কি সুস্থ নয়, পাক-নিহাদ-বানু ?"

অস্ফুট উত্তর দিলো পাক-নিহাদ-বানু। জানালো যে তার কিছুই হয়নি, সুস্থই আছে তার শরীর।

দারা সস্নেহে তাকালো কন্যার দিকে।

*

ওসমান বেগ্ বুঝতেই পারলো না তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার চোখ পুরু কাপড় দিয়ে খুব ভালো করে বেঁধে দেওয়া। দুপাশে দুজন তার হাত ধরে হাঁটছিলো দ্রুতপদে, সামনে একজন, পেছনে তিনচারজন। সবাই স্তব্ধ, কারো মুখে কোনো কথা নেই। এক জায়গায় একটি লোহার দরজা খোলার শব্দ হোলো। সে ভিতরে ঢুকলো সবার সঙ্গে। কঠিন পাথরের উপর দিয়ে খানিকটা হেঁটে গিয়ে তারপর সরু ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যেতে হোলো। আরো কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর সবাই এক জায়গায় এসে থামলো। তালা খোলার আওয়াজ হোলো, তারপর খুলে গেল আরেকটি লোহার দরজা। তাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলো সবাই।

ওসমান সাহসী পুরুষ, ভয় পায়নি একটুও। কিন্তু তার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে ফৌজের একজন সাধারণ আহাদি, কাল অপরাহ্ণ পর্যন্ত তার জীবনে কোনো জটিলতা ছিলো না। ফৌজের কুচকাওয়াজে যোগ দিতো, যখন মনসবদার কিলিচ খাঁর কেল্লার চৌকির পালা পড়তো, তাকে যেতে হোতো কেল্লায়, এক সপ্তাহের জন্যে। এসব ছাড়া আর কোন বৈচিত্র্য তার জীবনে ছিলো না, কোনো যুদ্ধও সে দেখেনি এপর্যন্ত। অবসর সময়ে অন্য আহাদিদের সঙ্গে কাফিখানায় বসে কাফি খেতো, গন্‌জফা খেলতো, আর অন্য সময় বাড়িতে ফতিমা বিবির স্নেহলালিত জীবন অতিবাহিত করতো নিশ্চিন্ত আরামে। কিন্তু গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনার পর ঘটনা এমন দ্রুত গতিতে এলো যে, সে যেন আর ভাবতেই পারছে না কিছু, লোপ পেয়ে যাচ্ছে তার বিচার বুদ্ধি। কী কুক্ষণে কাল সন্ধ্যে নাগাদ বেরিয়ে পড়েছিলো কাফিখানা থেকে! পথে নসরত খাঁর সঙ্গে কলহ, তারপর কোতোয়ালিতে ঘণ্টাখানেকের কয়েদ, আজ সকাল বেলা স্বয়ং শাহ-ই-আলিজার

সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সন্ধ্যের পর তাঁর মহলে গোপন অভিসার, এক অপরিচিতা সুন্দরীর সঙ্গে ক্ষণিকের আলাপ, তারপর কেল্লার কয়েদখানায় দুঘণ্টা কারাবাস,—আর আবার এখন এই অপহরণ। এবার তাকে কোথায় আনা হোলো কে জানে!

কিরকম বিদ্যুৎগতিতে ঘটে গেল এই শেষের ব্যাপারটা। কয়েদখানার কুঠুরির ভিতর খড়ের গাদার উপর গা এলিয়ে দিয়ে সে ভাবছিলো ফতিমা বিবির কথা। তার বাড়ি ফেরার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে ফতিমা বিবি। ওর কথা ভেবে ওসমানের বুক টনটন করে উঠলো। ফতিমা বিবি কি ইসমাইল বেগ্ তাকে বেশীক্ষণ চোখের আড়াল করে থাকতে পারে না। ফতিমা বিবি নিশ্চয়ই এখন চিরাগ হাতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে পথের দিকে তাকিয়ে। হয়তো ইসমাইল বেগ্ও বাড়ি ফিরে এসেছে এতক্ষণে, হয়তো তার খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়েছে।

কিন্তু তাকে খুঁজবে কোথায়? জানেনা তো সে কোথায় গেছে। স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না সে পড়ে আছে এইখানে। হয়তো জানতে পারলে ইসমাইল বেগ্ শাহ-ই-আলিজার মুন্সির সঙ্গে কি জিলওদারের সঙ্গে যোগাযোগ করতো, হয়তো চেষ্টা করতে পারতো তাকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু শাহ-ই-আলিজা যদি জানতে পারেন যে তাকে বন্দী করা হয়েছে তাঁরই মহলের উদ্যানে, তাহলে তিনি কি ক্ষমা করবেন তাকে? কি কৈফিয়ত সে দেবে? কে বিশ্বাস করবে তার কথা? তার জন্যে হয়তো চরম বেইজ্জতি হবে ইসমাইল্ বেগ্এরও। না, না, এ হতে দেওয়া সম্ভব নয় ওসমানের পক্ষে। সে একলাই ভোগ করবে তার অবিমৃষ্যকারিতার ফলাফল। কেন সে শোনেনি শাহ-ই-আলিজার সকাল বেলার পরামর্শ, তাহলে এরকম বিপদে পড়তে হোতো না। না, এখান থেকে উদ্ধার পেতেই হবে, এবং তার উপায়ও ভাবতে

হবে। রাগে আঙুল কামড়াতে লাগলো ওসমান। কেন সে তলোয়ার সঙ্গে নিয়ে বেরোলো না! সঙ্গে হাতিয়ার থাকলে তাকে বন্দী করা সহজ হোতো না কারো পক্ষে। এত বছর ধরে অসিযুদ্ধে সে তালিম নিয়েছে, কিন্তু যেদিন প্রয়োজন হোলো, সেদিন তার কাছে আর তলোয়ার নেই। ভাগ্যের পরিহাস এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে।

এসব কথাই শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো ওসমান বেগ্। হঠাৎ লোহার গরাদ দেওয়া দরজায় বাইরে চোখ পড়লো। বাইরে মুক্ত কৃপাণ হাতে দুজন প্রহরী ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ওরা লক্ষ্য করেনি যে একটু দূরে থামের আড়াল থেকে একটি ছায়া সরে গিয়ে আরেকটি থামের আড়ালে চলে গেল। কৌতূহলভরে তাকিয়ে রইলো ওসমান বেগ্, কিন্তু নড়াচড়া করলো না একটুও।

হঠাৎ দুজন লোক দুদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রহরী দুজনের উপর। ওরা চিৎকার করার সুযোগ পেলো না। কাপড় দিয়ে বাঁধা হোলো তাদের মুখ হাত পা,—অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার সঙ্গে। আরো চারজন লোক বেড়িয়ে এলো আড়াল থেকে। প্রত্যেকের হাতে খোলা তলোয়ার, মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা।

প্রহরীর কাছ থেকে চাবির গোছা নিয়ে একজন এসে খুলে দিলো লোহার গরাদ দেওয়া দরজা। বললো, "কোনো আওয়াজ কোরো না। চুপচাপ চলে এসো আমাদের সঙ্গে।"

ওসমান কিছু বুঝে ওঠার আগেই একজন পুরু কাপড় দিয়ে তার চোখ বন্ধ করে দিলো।

খাসমহলের ভেতরেই সবারই চর ঘুরছে প্রতিপক্ষের উপর নজর রাখবার জন্যে। জাহান-আরার কাছেও খবর পৌঁছে গেল।

জাহান-আরা শুতে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণের জন্যে এসেছিলো খোলা ছাতে। প্রশস্ত আঙিনার ওপারে রোশন-আরার মহল।

তাকিয়ে দেখলো জাহান-আরা। সেখানে আলো নেই। মুক্ত কৃপাণ হাতে পাষাণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে তাতার প্রহরিণী।

জাহান-আরা যখন ফিরে যাচ্ছে, হঠাৎ গলার সাড়া পেলো পেছন থেকে।

"বড়ী বেগম সাহিবা," রুদ্ধ নিশ্বাসে বললো জাহান-আরার খাদিমান নিশাদ বানু, "খবর আছে।"

"ভেতরে এসো," নিম্নকণ্ঠে আদেশ করলো জাহান-আরা।

ওর পেছন পেছন নিশাদ বানু প্রবেশ করলো কক্ষের ভিতর।

"জরুরী?"

"জানিনা বেগম সাহিবা। কাল সকালে জানাতাম আপনাকে, কিন্তু দেখলাম, আপনি জেগে আছেন। তাই ভাবলাম আপনাকে এখনই জানিয়ে দি।"

"কি হয়েছে?"

"ছোটী বেগম সাহিবাব খাদিম খোজা লিয়াকত হোসেন ওর অধীনস্থ চার-পাঁচজন খোজা সঙ্গে নিয়ে কয়েদখানা থেকে অপহরণ করে এনেছে এক বন্দীকে।"

"কে বললে?"

"আমাদের খোজা হাসান আলি।"

"কে সেই বন্দী?"

"সেটা জানা যায়নি। তার চোখ বন্ধ করে তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।"

"এখানে!" বিস্মিত হোলো জাহান-আরা, "কোথায় রাখা হয়েছে তাকে?"

"খাসমহলের নিচের তহ্‌খানায়।"

"তার পর?"

"খবর পেয়ে ছোটী বেগম সাহিবা নিজে তহ্‌খানায় গেছেন।"

"বটে! কে এই মহাসম্মানিত ব্যক্তি যার জন্যে ছোটী বেগম

সাহিবাকে স্বয়ং যেতে হচ্ছে তাঁর কাছে? খোঁজ নাও নিশাদ বানু। কাল সকালে জানিও।"

নিশাদ বানু চলে যাচ্ছিলো। জাহান-আরা ডাকলো, "শোনো। চৌকির নজর এড়িয়ে ওকে ভেতরে আনলো কি করে?"

"খিজিরির পাশে যে গুপ্তপথ আছে, সেদিক দিয়ে ঢুকিয়েছে।"

"হাসান আলিকে বলো খুব কড়া নজর রাখবে ওদের উপর। তারপর দেখা যাবে কাল সকাল বেলা।"

তসলিম করে নিশাদ বানু চলে গেল।

নিজের ভাবনায় তন্ময় হয়ে ছিলো ওসমান বেগ্, হঠাৎ শুনলো একজনের মৃদু কিন্তু আজ্ঞাবাচক কণ্ঠস্বর,—বা আদব বা মুলায়জা হুশ্য়ার......

আবার এ কোন খানদানী আগন্তুক,—মনে মনে ভাবলো ওসমান।

......হজরত ছোটী বেগম সাহিবা তশরিফ আনছেন।

হজরত বেগম সাহিবা! ছোটী! কে,—রোশন-আরা বেগম? ছোটী বেগম সাহিবা তো বলা হয় তাঁকে।

এবার ঘামতে শুরু করলো ওসমান বেগ্। আল্লা মেহেরবান, এক দিনের মতন যথেষ্ট হয়েছে,—আর নয়। এবার ছোটী বেগম সাহিবা, এর পর বেহশ্ত্এর হুরী আসতে শুরু করবে। সে আর মাথা ঠিক রাখতে পারবে না। মমতাজগঞ্জ থেকে শাহ-ই-আলিজার মহলের গোলাপবাগ, সেখান থেকে কেল্লার কয়েদখানা, আবার সেখান থেকে এখানে, একেবারে বাদশার খাস্‌মহলে!

কোনো একজন গুরুজন স্থানীয় লোক তাকে একবার বলেছিলো মনে যতো বিস্ময়ই হোক, স্ত্রীলোকের সামনে কোনোদিন প্রকাশ করবে না সেই বিস্ময়। আজ সেই পরামর্শ পালন করা বাঞ্ছনীয় মনে করলো ওসমান বেগ্। নির্বিকার হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

হাল্কা পায়ের সাড়া পাওয়া গেল। মহার্ঘ আতরের সৌরভ এলো অল্প একটু দূর থেকে। পায়ের সাড়া থামলো।

সামনে ঝুঁকে তসলিম জানালো ওসমান বেগ্।

খোজা লিয়াকত হোসেনের মারফতে প্রশ্ন করতে লাগলো রোশন-আরা। এত নিচু বেগম সাহিবার কণ্ঠস্বর, ওসমানের কানে কিছু এলো না। পুরু কাপড় দিয়ে চোখ বন্ধ। কিছু দেখতেও পেলো না।

"তোমার নাম কি ?"—প্রশ্ন এলো লিয়াকত হোসেনের কণ্ঠে।

"আব্দুল হাকিম।"

"পেশা কি ?"

"কিছু না। আমি সামান্য মুসাফির।"

"তুমি কি আগ্রার লোক ?"

একটু ভেবে ওসমান উত্তর দিলো, "না।"

"তুমি কোথাকার লোক ?"

"কোথাও আমার স্থায়ী বসবাস নেই।"

"তুমি কি আগ্রায় আসার আগে আওরঙ্গাবাদে ছিলে ?"

"না।"

একটু চুপচাপ। কেউ যেন চুপি চুপি কিছু বলছে অন্য একজনকে। তারপর আবার প্রশ্ন।

"আওরঙ্গাবাদে ছিলে কখনো ?"

"আমার মনে নেই," উত্তর দিলো ওসমান। আগ্রা শহরের অভিজাত মহলে অনেক কূটনীতির ঘোরপ্যাঁচ চলছে আজকাল। সোজা উত্তর না দেওয়াই ভালো মনে করলো ওসমান বেগ্।

"দেখ," খোজা লিয়াকত হোসেন বললো, "তুমি হজরত ছোটী বেগম সাহিবার সামনে দাঁড়িয়ে আছো। সুতরাং তুমি নির্ভয়ে কথা বলতে পারো। শাহ-ই-আলিজার দলভুক্ত লোকেরা এখানে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

"হজরত ছোটী বেগম সাহিবা বড় মেহেরবান। তিনি ওদের হাত থেকে আমায় উদ্ধার করেছেন, তার জন্যে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আমার মালিকের নির্দেশ আছে আমি যেন নিজের সম্বন্ধে বেশী কথা না বলি।"

অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লো ওসমান বেগ্। এবার ব্যাপারটা একটু একটু পরিষ্কার হতে লাগলো তার কাছে। তার সম্বন্ধে সবারই কোথাও না কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। আগ্রায় শাহ-ই-আলিজা ও শাহজাদা আওরংজেবের পক্ষভুক্ত দু-দলের মধ্যে একটা কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব চলছে, শহরের আর দশজনের মতো সেও এখবর রাখতো। হয়তো কোনো কারণে শাহ-ই-আলিজার পক্ষীয় কেউ কোনো ভুল করেছে তাকে নিয়ে, এবং তার ফলে এখন রোশন-আরার লোকেরা তাকে শাহজাদা আওরংজেবের লোক মনে করেছে, এবং সেই ধারণা সত্যি কি মিথ্যে যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার পরও একটা বিস্ময় থেকে গেল তার মনে,—নিজের দলের সবাইকেও এরা চেনে না! কিছুই বিচিত্র নয়, অনেক হরকরা বা গুপ্তচর থাকে, যাকে স্বয়ং মালিক ছাড়া আর কেউ চেনে না।

"ছোটী বেগম সাহিবাকে বললে কোনো ক্ষতি হবে না," বললো লিয়াকত হোসেন।

ওসমান বেগ্ চুপ করে রইলো।

"আর, না বললে আমরা অন্য ভাবে জানতে চেষ্টা করবো, এবং যতদিন নিশ্চিত জানতে না পারছি, তদ্দিন তোমাকে এখানেই আটক থাকতে হবে।"

ওসমান কোনো উত্তর দিলো না।

"উদিপুরীবাঈ তোমাকে ছলনা করে গোপনে শাহ-ই-আলিজার মহলে নিয়ে গিয়েছিলো কেন? ওর ফাঁদে পড়লে কি করে? ওকে চেনো কি করে?"

কে উদিপুরীবাঈ ?—ভাবলো ওসমান। এ নাম সে শোনেনি কোনোদিন। শাহজাদাদের পরস্‌তার্‌দের নাম সাধারণ লোকে বড় একটা জানেনা। সেই মেয়েটির নামই উদিপুরীবাঈ !—ওসমানের কৌতূহল হোলো। বাঈ ! হিন্দুর মেয়ে ?

ওসমান একটু হাসলো কিছু বললো না।

রোশন-আরা খোজা লিয়াকত হোসেনকে বললো,—"এ লোকটা এখন এখানেই থাক। ওর সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কাল দেখা যাবে। শিকাঞ্জায় না বাঁধলে ওর কাছে থেকে কথা বেরোবে না।"

একথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পেলো ওসমান বেগ্‌। শিকাঞ্জা কয়েদখানার একরকম নিপীড়নের যন্ত্র। ওর বুক কেঁপে উঠলো একমুহূর্তের জন্যে।

খোজা লিয়াকত হোসেনও বিস্মিত হয়ে তাকালো রোশন-আরার দিকে।

রোশন-আরা ফিরে চললো নিজের মহলে। সঙ্গে সঙ্গে এলো লিয়াকত হোসেন। বললো, "ছোটী বেগম সাহিবা !"

"কি ?"

"এই আবদুল হাকিম যখন আওরঙ্গাবাদের লোক, তখন ভালো করে জেনে না নিয়ে কি ওকে শিকাঞ্জায় চড়ানো ঠিক হবে ?"

"কে বললে, ও আওরঙ্গাবাদের লোক," রোশন-আরা একটু হাসলো, "তাই হলে উদিপুরী ওর কোনো ক্ষতি করতো না। উদিপুরী যে ইদানীং শাহজাদা আওরংজেবের নজরে পড়ার চেষ্টা করছে। বছর দুয়েক আগেকার ওই নিশান চুরির ব্যাপারটা তোমার মনে নেই ?"

"ও আওরঙ্গাবাদের লোক নয় ?" অবাক হোলো লিয়াকত হোসেন, "তাহলে কার লোক আব্দুল হাকিম ?"

"জানিনা, হয়তো দারার লোক," উত্তর দিলো রোশন-আরা,

"তা নইলে অন্য কারো। তবে নিশ্চয়ই এ এমন একটা কিছুতে জড়িত আছে, যার জন্যে একে আটকে রাখা আওরংজেবের স্বার্থে প্রয়োজনীয়। আর সেই জন্যেই উদিপুরী তাই করেছে, যাতে আওরংজেবের কাছ থেকে এর কোনো প্রতিদান আদায় করে নিতে পারে। এই আমার অনুমান। এজন্যেই সে এসেছিলো গওহর-আরার কাছে, এজন্যেই গওহর-আরার নিশান গেছে আওরঙ্গাবাদে। এখন আমার জানা প্রয়োজন এ লোকটা কে। আব্দুল হাকিম ও কখনো নয়। ওটা মিথ্যা পরিচয়, ওর চেহারা কথাবার্তা শুনে আমার মনে হচ্ছে, ও খুব সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে সেটাই জানতে হবে।"

খানিকটা পথ এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো রোশন-আরা। নিজের মনে বললো,—সুন্দর চেহারা! অল্প বয়েস! আচ্ছা!—খোজা লিয়াকত হোসেনকে বললো, "শোনো, অন্য খোজাদের সবাইকে পাঠিয়ে দাও উপরে। শুধু দুজন খোজা ওর কুঠরির বাইরে পাহারায় থাক। ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও। আমি ফিরে যাচ্ছি ওর কাছে। হ্যাঁ, তুমিও ঢুকবে না ঘরের ভিতর। বাইরে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। মনে রেখো, কেউ যেন ঘরে না ঢোকে।"

রোশন-আরার জিদ্‌এর সঙ্গে পরিচয় ছিলো খোজা লিয়াকত হোসেনের। এতদিন ধরে তার খিদ্‌মত্‌ করছে, ছোটী বেগম সাহিবাকে সে ভালো করেই চেনে। কোনো প্রশ্ন করলো না সে।

ওরা ফিরে চললো তহ্‌খানার দিকে।

ক্লান্ত পদক্ষেপে ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌ ফিরে এলো। মুখ তার বিমর্ষ, বিপুল দুর্ভাবনায় ভ্রূযুগল কুঞ্চিত।

জানলার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো ফতিমা বিবি, দরজার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, "কোথাও ওর খবর পেলে না?"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো ইসমাইল বেগ্।

ভয়ার্ত কণ্ঠে ফতিমা বললো, "ওর তো এত দেরি হয় না। ছেলে আমার কোনো বিপদে পড়ে নি তো?"

"আমিও তো তাই ভাবছি। সাধারণভাবে কোনো বিপদ তার হওয়ার কথা নয়, তার শক্তি সাহস দুইই আছে, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"আমরা যা ভয় করছি যদি তাই হয়?"

"কি?"

"যদি কেউ ওসমানের আসল পরিচয় জেনে গিয়ে থাকে?

"সে কি করে সম্ভব? তুমি আমি আর শাহ-ই-আলিজা ছাড়া আর তো কেউ জানে না! কারো মনে তো কোনো সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। আঠারো বছর আগে সুদূর বিজাপুরে কি গুজব সৃষ্টি হয়েছিলো, সে কথা তো এদ্দিন পরে কারো মনে থাকবার কথা নয়

"একজন ভোলে নি, আজও মনে রেখেছে।"

"কে?"

"শাহজাদা আওরংজেব, তার লোক আজো ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার আর তোমার সন্ধানে।"

ফতিমার চোখ জলে ভরে এলো।

"আয়েশাবানু!"

এ ডাক শুনে সে কেঁদে ফেললো। খুব অন্তরঙ্গ মুহূর্ত ছাড়া তাকে এ নামে ডাকা হয় না, তাও চুপিচুপি, অত্যন্ত গোপনে। হামিদ খাঁ আর আয়েশা নিজেদের নামও মনে রাখবার চেষ্টা করেনি এত বছর, অভ্যেস করে করে ইয়ার ইসমাইল বেগ্ আর ফতিমা, এই নাম দুটোই গেঁথে ফেলেছিলো মনের মধ্যে।

"আয়েশাবানু, ঘাটের কাছে এসে কি তরী ডুববে? এদ্দিন তো শুধু এই স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থেকেছি যে ওসমানকে তার

ন্যায্য অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে যাবো। যদি না পারি আয়েশা ?”

ফতিমা ইসমাইল বেগ্‌এর হাত ধরলো, বললো, “হামিদ খাঁ, ওকথা বোলো না। এই স্বপ্নের উপরই তোমার আমার জীবন গড়ে উঠেছে, এখান থেকেই শুরু হয়েছে তোমার আমার ভালোবাসা, তা নইলে তুমি এক খানদানী সর্দার, আমার কি যোগ্যতা ছিলো তোমার পায়ে ঠাঁই পাওয়ার ? আমাদের স্বপ্ন সার্থক হতেই হবে। যদি আমাদের ভালোবাসা সত্যি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সার্থক হবে আমাদের স্বপ্ন। যে করেই হোক, আমার ওসমানকে ফিরে পেতেই হবে।”

“আমার ভয় করছে আয়েশা, আমি কিছুই ভাবতে পারছি না।”

“ভয় পেলে চলবে কেন হামিদ খাঁ। তুমি ভয় পেলে আমি তো মানবো না।”

“কিন্তু এখন কি করি ?”

“আজ আর কিছু করার নেই। তুমি শুয়ে পড়ো। কাল গিয়ে সাক্ষাৎ করো শাহ-ই-আলিজার সঙ্গে। উপায় একটা হবেই।”

খাওয়া দাওয়া করার স্পৃহা কারোই ছিলো না। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লো ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌। কিছুক্ষণ পরে পাশ ফিরে দেখলো, ফতিমা তখনো শুতে আসেনি। পাশের ঘরে পাটি পেতে মাথায় ওড়না জড়িয়ে নমাজ পড়ছে সে।

ওসমান বেগ্‌এর হাত দুটি রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা, চোখও বন্ধ। কেউ খুলে দিয়ে যায় নি। অত্যন্ত অসুবিধে বোধ করছিলো সে। নিরুপায় হয়ে বসে পড়লো মেঝের উপর। কিন্তু তার জন্যে সেদিন বিশ্রাম বোধ হয় লেখেনি। আবার দরজা খোলার শব্দ কানে এলো। তারপর ঘরের ভিতর ভেসে এলো আতরের সেই মদির গন্ধ।

ওসমান বেগ্ উঠে দাঁড়ালো।

একটি মধুর স্ত্রীকণ্ঠ পরিস্কার শোনা গেল।

"চিরাগটা ওখানে রাখো লিয়াকত হোসেন। বন্দীর হাতের বাঁধন খুলে দাও।"

ওসমানের হাতের বাঁধন খুলে দিলো খোজা লিয়াকত হোসেন।

"এবার তুমি বাইরে যাও।"

বেরিয়ে গেল একটি পদশব্দ। দরজা আবার বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হোলো। কিন্তু আতরের সেই গন্ধ তখনো রয়েছে ঘরের ভিতর।

"তোমার নাম আব্দুল হাকিম নয়, আমি জানি," বললো সেই স্ত্রীকণ্ঠ, "কিন্তু আসল নাম জানিনা বলে ওনামেই সম্বোধন করছি। আব্দুল হাকিম, তুমি জানো আমি কে ?"

"জানি ছোটী বেগম সাহিবা।"

"চোখের বাঁধন খুলে ফেল।"

বিস্ময় ফুটে উঠলো ওসমানের মুখে। সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

"আমি তোমায় আদেশ করছি আব্দুল হাকিম। চোখের বাঁধন খুলে ফেল।"

আস্তে আস্তে চোখের বাঁধন খুলে ফেললো ওসমান বেগ্। কিন্তু চোখ তুলে তাকালো না। চোখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

"আব্দুল হাকিম !"

"হুকুম করুন ছোটী বেগম সাহিবা।"

"তাকাও আমার দিকে।"

চুপ করে রইলো ওসমান।

"তাকাও। শাহ-ইন্-শাহ্ বাদশাহ্র কন্যা আদেশ করছে রাজ্যের একজন প্রজাকে। তাকাও আমার দিকে।"

অতি কঠিন প্রভুত্বব্যঞ্জক সেই কণ্ঠস্বর। ওসমান আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাকালো। সুন্দর সুঠাম শুভ্রকান্তি এক তন্বী তার সামনে দাঁড়িয়ে। সুর্মা আঁকা চোখ যেন সুনীল জলধির মতো উত্তাল। প্রশস্ত ললাটের উপরে ঝকমক করছে মাথার কোতবিল-দারের বৃহৎ হীরক খণ্ড। চিরাগের মৃদু আলোয় বার বার ঝলসে উঠছে দুকানের জড়োয়া পিপল্-পত্তি। গায়ে জরির কাজ-করা এক জমকালো নূর-মহলি।

কঙ্কন আর চুড়িতে ঠুনঠুন আওয়াজ হোলো। আস্তে আস্তে মুখের উপর থেকে নকাব্ সরিয়ে নিলো রোশন-আরা।

আর সঙ্গে সঙ্গে মোগল শাহজাদীর অনিন্দ্য সৌন্দর্যের বিদ্যুৎ-প্রভায় যেন ধাঁধিয়ে গেল ওসমান বেগ্এর চোখ দুটো। রোশন-আরা বয়েসে আওরংজেবের এক বছরের বড়ো। এ সময় তার বয়েস উনচল্লিশ। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে এখনো দেহের গঠনে গড়নে ধরে রেখেছে অসমাপ্ত যৌবনের বিভ্রমবৈচিত্র্য।

ওসমান চোখ নামিয়ে নিলো।

"জানো, আমি কি না দিতে পারি তোমায়," মধুরকণ্ঠে আস্তে বললো রোশন-আরা, "যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য, নারীর রূপ, যৌবন—যা কিছু পুরুষের কাম্য, সবই তোমায় পাইয়ে দিতে পারি।"

ওসমানের রক্তে হঠাৎ যেন আগুন ধরে গেল। কিন্তু সে সংযত কণ্ঠে বললো, "আমি চাই শুধু মুক্তি, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে চাই বাইরের খোলা হাওয়ায়।"

"তাও দিতে পারি। বিনিময়ে শুধু একটি জিনিষ চাই—।"

"কি ?"

"তোমার পরিচয়।"

"আমি একজন সামান্য ব্যক্তি," উত্তর দিলো ওসমান বেগ্ "আমার নাম আব্দুল হাকিম।"

"না," দৃঢ়কণ্ঠে বললো রোশন-আরা, "ওই চেহারা. ওই ভাব-ভঙ্গি—সৌজন্যময় ঔদ্ধত্য সামান্য লোকের নয়। কে তুমি ?"

ওসমান চুপ করে রইলো।

কাছে এগিয়ে এলো রোশন-আরা। দুর-দুর করে উঠলো ওসমানের বক্ষ।

রোশন-আরা কাছে এসে ওসমানের কাবা সরিয়ে জামাহর বন্ধনি খুলে উন্মুক্ত করলো তার শুভ্র প্রশস্ত বক্ষ। শিহরণ বয়ে গেল ওসমানের শরীরে।

বুকের মাঝখানে একটা মস্তো বড়ো জড়ুল।

রোশন-আরা হাসলো। তারপর বললো, "আমার তাই একটু একটু সন্দেহ হচ্ছিলো। লিয়াকত হোসেন যখন বললো, তোমার আঠারো বছর বয়েস, তখন সন্দেহ ঘনীভূত হোলো। না, আব্দুল হাকিম, তুমি হয়তো নিজের পরিচয় জানো না, কিন্তু তুমি সামান্য লোক নও। তবে তোমার নাম সত্যি সত্যি আব্দুল হাকিম কিনা, তাতেও আমার সন্দেহ হচ্ছে !"

কোনো উত্তর দিলো না ওসমান বেগ্। সে নিজের কিংবা ইসমাইল বেগ্এর নাম প্রকাশ করবে না এবিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

"তোমার নাম যাই হোক, আমার মতো একজন শাহজাদীরও তসলিম পাওয়ার মর্যাদা তোমার আছে," সামনে একটু ঝুঁকে কপট সম্ভ্রমের সঙ্গে তসলিম করলো রোশন-আরা। তারপর বললো "তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। তুমি বড়ো দুর্ভাগা। আমি তোমার আসল পরিচয় পেয়ে যাওয়াটা তোমার পক্ষে মঙ্গলকর হোলো না।"

"কেন ?"

"আর তো বাইরের আলো হাওয়া দেখতে পাবে না তুমি। তোমায় জীবন কাটাতে হবে ভূগর্ভস্থ এই তহ্খানায়।—লিয়াকত হোসেন !"

খোজা লিয়াকত হোসেন ঘরের ভিতর এলো।

"এখানে এঁর সব রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দাও। ইনি খুব মানী লোক। এখানে উনি চিরকাল আমাদের মেহ্‌মান হয়েই থাকবেন। ওঁর যেন কোনো অসুবিধে না হয়।"

এবার সত্যি সত্যি শঙ্কিত হোলো ওসমান বেগ্‌। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলো, "ছোটী বেগম সাহিবা। আপনারা সবাই কোথাও একটা ভুল করেছেন। বিশ্বাস করুন, আমি খুব সামান্য লোক, খুব দরিদ্র পিতামাতার সন্তান—"

"হামিদ খাঁ এখন কোথায়?" জিজ্ঞেস করলো রোশন-আরা।

"হামিদ খাঁ!" অবাক হয়ে তাকালো ওসমান। এ নাম সে কোনোদিন শোনে নি।

একটা হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে বেরিয়ে চলে গেল রোশন-আরা!

ওসমানের হাত পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

॥ চার ॥

বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে নিজের মজলিস থেকে মহলের ভিতর এলো শাহ-ই-আলিজা দারা শিকো। অন্যান্য দিনের মতো নাদিরাবানু বেগমের সঙ্গে সুলেমান শিকো পাক-নিহাদ-বানু, সিপিহ্‌র আর জাহাঁজেব-বানু অপেক্ষা করে বসেছিলো পিতার প্রতীক্ষায়, শাহ-ই-আলিজা এলে পরে একসঙ্গে সবার জন্যে দস্তরখান্ পাতা হবে।

শাহ্-ই-আলিজা প্রাত্যহিক রেওয়াজ অনুযায়ী কুশল প্রশ্ন করলো না কাউকে। চুপচাপ বসে পড়লো। খাদিমেরা একজনের পেছনে একজন বয়ে নিয়ে এলো আহার সামগ্রী। নীরবে ভোজন করতে লাগলো দারা শিকো। পত্নী ও পুত্রকন্যারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকালো।

তারপর নাদিরাবানু জিজ্ঞেস করলো, "আজ কি আলিজার বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছে?"

এদের কাছে দারা শিকো কোনোদিনই সবকথা গোপন করতো না। দারার পরিবারের মধ্যে একটা পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ছিলো, যা ছিলো তৎকালীন মোগল অভিজাত সমাজে, বিশেষ করে শাহী খানদানে, অত্যন্ত বিরল। এরা সবাই পরস্পরের কাছে কথা বলতো মন খুলে। আজ কিন্তু এদের কাছেও আসল কারণটি গোপন রাখতে চাইলো। বললো, "বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা নেই। তবে একটা খবর শুনে একটু ভাবনা হয়েছে।"

"কি খবর, আলিজা?"

"জাহান-আরার খাস-খাদিম হাসান আলি আমার সঙ্গে গোপনে

সাক্ষাৎ করতে এসেছিলো। তার কাছে শুনলাম কাল সন্ধেবেলা গোলাপবাগে যে লোকটিকে ধরে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, রোশন-আরার খাদিম খোজা লিয়াকত হোসেন আর কয়েকজন লোক এসে তাকে কয়েদখানা থেকে অপহরণ করে কেল্লার ভিতরে খাসমহলের তহ্‌খানায় নিয়ে রেখেছে। রোশন-আরা স্বয়ং গভীর রাত্রে গোপনে গিয়ে দেখা করেছে তার সঙ্গে। আমি এখন ভাবছি, যে ব্যক্তি গোপনে আমার মহলের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করেছিলো, তাকে কয়েদখানা থেকে অবৈধভাবে মুক্ত করে নিয়ে খাসমহলের ভিতর লুকিয়ে রাখায় রোশন-আরার কী স্বার্থ। কেন লোকটি এসেছিলো আমার মহলে? এর পেছনে কি আওরংজেবের হাত আছে?”

পাক-নিহাদ-বানুর মুখ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল দারার কথা শুনে। কেউ তার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলো না। নাদিরাবানু ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, “কী সাংঘাতিক কথা! আপনাকে গোপনে হত্যা করার কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না তো? শাহজাদা আওরংজেব এতদূর যেতে সাহস করবে?”

“আমাদের খুল্লতাতের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়,” উত্তর দিলো সুলেমান শিকো, “এখন থেকে মহলের পাহারার কড়াকড়ি আরো বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। ভাবছি রাত্রিবেলার চৌকির ব্যবস্থাপনা ও তদারকের ভার আমি নিজেই নেবো।”

“হ্যাঁ, আমাদের আরো সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আলা হজরতের স্বাস্থ্য ইদানীং ভেঙে পড়ছে আস্তে আস্তে। যে কোনো দিন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। তখন কি গণ্ডগোল শুরু হয় বলা যায় না।”

আর কিছু না বলে চুপচাপ আহার করতে লাগলো দারা শিকো। তার আসল দুশ্চিন্তার কারণ ছিলো অন্য। পূর্বাহ্ণে এসেই সে জানিয়েছিলো যে পূর্বদিন রাত্রে ইয়ার ওসমান বেগ্‌ গৃহে

প্রত্যাগমন করেনি। কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এ সংবাদ শুনে দারা বিচলিত হয়ে পড়েছিলো। নিজের বিশ্বস্ত হরকরা-দের লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিলো ওসমানের তল্লাশে। এ পর্যন্ত তারাও কোনো খবর আনতে পারেনি। ওসমানকে পাওয়া না গেলে মুশকিল। দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে দারার একটা সুপরিকল্পিত কর্মসূচী একেবারে বানচাল হয়ে যাবে।

এ নিয়ে দারার এত দুর্ভাবনা হয়েছিলো যে অন্য সংবাদে সে বিশেষ কোনো গুরুত্ব দেয়নি। খোজা হাসান আলিকে শুধু নির্দেশ দিয়েছিলো তহ্খানার অতিথি এবং খোজা লিয়াকত হোসেনের উপর যেন বিশেষভাবে নজর রাখা হয়। আরো সংবাদ জানা গেলে পরে স্থির করা যাবে কি করা যায় এ বিষয়ে।

হাসান আলি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে কম্পিতহৃদয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলো কেল্লার কয়েদখানার দারোগা দবির আহ্মদ। সে বেশী কিছু জানতো না। শাহ্-ই-আলিজাকে প্রচুর তসলিম জানিয়ে সে নিবেদন করলো যে, কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি কাল রাত্রে আব্দুল হাকিম নামক সেই ব্যক্তির প্রহরীদের হাত-পা মুখ বন্ধ করে কুঠরির দরজা খুলে বন্দীকে বার করে নিয়ে পালিয়েছে। কেল্লার কয়েদখানার মধ্যে এরকম একটা ঘটনা হওয়া সাধারণ ব্যাপার নয়। পাহারার ব্যবস্থায় কোনো শৈথিল্য না থাকলে এরকম ঘটতে পারে না। সমস্ত দায়িত্ব দারোগার। বন্দী সম্বন্ধে তার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিলো, বিশেষ করে ফরিয়াদী যখন খুদ্ শাহ-ই-আলিজা। এখন দবির আহ্মদের ভাবনা নিজের সম্বন্ধে। দায়িত্বপালনে অক্ষমতার জন্যে এখন তার নিজেরই শাস্তি হয়ে না যায়। দারার ক্ষমতাশীলতা মোগলসাম্রাজ্যে সর্বজনবিদিত। তাই দারারই পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো দবির আহ্মদ।

দারার মন তখন ওসমান বেগ্এর ভাবনায় অস্থির, কোনো

এক অপরিচিত আব্দুল হাকিম সম্বন্ধে চিন্তান্বিত হবার অবকাশ ছিলো না। তাই দবির আহ্‌মদকে কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা করে, এ ব্যাপার নিয়ে আর কোনো উচ্চবাক না করবার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলো। ব্যাপারটা যখন কোতোয়ালির মারফতে যায়নি, তখন ফরিয়াদী স্বয়ং জোর না দিলে কেউ কোনো কথা জানবে না, জানলেও কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

এসব কারণেই মহলের ভিতর আসতে দেরি হয়েছিলো দারা শিকোর।

ভোজন সমাপ্ত হবার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলো দারা শিকো, প্রাত্যহিক অভ্যাস মতো। এসময় পুত্রকন্যারা বিদায় নিয়ে ফিরে যায় যে যার মহলে, শুধু দারার কাছে একলা থাকে দারার পত্নী নাদিরাবানু বেগম। দাম্পত্য সংলাপ হয় কিছুক্ষণ, তারপর দারা চলে যায় আরাম্-গাহ্‌তে,—উদিপুরীবাঈয়ের কাছে।

আজ কিন্তু দারা কোনো কথাবার্তা বললো না। নাদিরাবানু বাক্যালাপ করার চেষ্টা করলেও স্বামীর কাছ থেকে বিশেষ কোনো সাড়া না পেয়ে চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়লো দারা শিকো।

মহলের পেছন দিকে গোলাপবাগের অন্যপাশে দারার আরাম-গাহ্। সুগন্ধি লতার আচ্ছাদন দেওয়া একটি ছায়াঘন পথ চলে গেছে সেদিকে। কিছু দূরে দূরে পাহারায় মোতায়েন আছে মহলের তাতার প্রহরিণীরা। দারা একটি গোলাপের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে করতে একলা এগিয়ে চললো সেই পথ ধরে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলো সামনে একপাশে একটি ফুলের ঝাড়ের ওধারে নড়ে উঠলো একটি ছায়া। দারা দাঁড়িয়ে পড়লো। জিজ্ঞেস করলো, "কে ওখানে?"

"আমি," উত্তর এলো নিচু গলায়।

ফুলের কেয়ারির পাশ থেকে লাল পাথরে বাঁধানো পথের উপর উঠে এলো পাক-নিহাদ-বানু।

"এ সময় তুমি এখানে কি করছো?" বিস্মিত হয়ে দারা জিজ্ঞেস করলো।

"আপনারই প্রতীক্ষায় ছিলাম আলিজা।"

পাক-নিহাদ-বানুর গলা ধরা-ধরা। দারা লক্ষ্য করলো তার সজল চোখ দুটো ফুলে লাল হয়ে আছে।

"কি হয়েছে তোমার?" স্নেহভরে দারা জিজ্ঞেস করলো।

"আলিজা, সব অপরাধ আমার। ওঁর কোনো দোষ নেই। উনি নিরপরাধ। সাজা দেবার হয় আমাকে দিন, কিন্তু ওঁকে বাঁচান।"

"কি বলছো তুমি?" দারার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্ধিত হোলো, "কিসের অপরাধ? উনি কে? কার কথা বলছো?"

"যাঁকে ছোটী ফুফী সাহিবা কয়েদখানা থেকে অপহরণ করে খাসমহলের তহ্‌খানায় নিয়ে রেখেছে।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এ ব্যাপারে তোমার অপরাধ কিসের? ওর জন্যে তোমার ব্যাকুলতা কেন?"

"আমিই অপরাধী আলিজা। ওঁকে গোলাপবাগে নিয়ে আসার পরিকল্পনা আমারই। আমারই অন্যায়ে তিনি ধরা পড়েছেন।"

"তোমার পরিকল্পনা! চৌকির নজর এড়িয়ে তাকে কি করে আনলে গোলাপবাগের ভিতর?"

"আমায় মার্জনা করবেন আলিজা, সে কথা জানাবো না, কারণ তাহলে আমায় যারা সহায়তা করেছে ওদের নাম করতে হয়। আমার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে ওরা যদি কোনো অপরাধ করে থাকে তাহলে তার সাজাও আমারই প্রাপ্য।"

দারা মনে মনে খুশী হোলো কন্যার কথা শুনে, কিন্তু মুখের গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললো, "এ যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি ঘোর

অন্যায় করেছো। মহলের সীমানার ভিতর বাইরের পুরুষের আগমন অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু তাকে আনিয়েছিলে কেন?”

“সাক্ষাৎ করবো বলে,” একটু কুণ্ঠা দেখা দিলো পাক-নিহাদ-বান্নুর কথায়, কিন্তু মিথ্যাভাষণ সে করলো না।

“সাক্ষাৎ করবে কেন?”

“আমি নিজের মুখে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো বলে।”

“এটা কিন্তু আদব নয়। যাই হোক, কিসের কৃতজ্ঞতা?”

“উনি আমার ইজ্জত বাঁচিয়েছিলেন।”

দারার ভুরু যুগল কুঞ্চিত হোলো। দুদিন আগেকার সন্ধ্যা বেলার ঘটনাটা খুলে বললো পাক-নিহাদ-বান্নু।

বিস্ময়ের শেষ সীমায় উপনীত হোলো দারা। আশ্চর্য হয়ে বললো, “এ লোকটার নাম আব্দুল হাকিম নয়?”

“না। নিশ্চয়ই আসল নাম গোপন করেছে দবির আহ্‌মদের কাছে।”

“এ কি তাহলে ওসমান বেগ্‌?”

“হ্যাঁ। সেই নামই বলেছিলো কোতোয়াল ইমরাদ খাঁয়ের কাছে। ওসমান বেগ্‌ আপনার অধীনস্থ মনসবদার কিলিচ খাঁর ফৌজের একজন আহাদি।”

“হ্যাঁ, আমি জানি,” চিন্তাকুল হয়ে দারা বললো।

“আপনি কি করে জানেন আলিজা?”

“ওসমান বেগ্‌কে কোতোয়ালিতে নিয়ে যাওয়ার পর ইমরাদ খাঁ সংবাদ পাঠিয়েছিলো আমার কাছে। কোনো এক সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া মহিলার সম্মান রাখতে সে নসরত খাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়েছিলো একথা আমি শুনেছিলাম। কিন্তু পাল্কিতে যে তুমি ছিলে এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। তুমি গোপনে মহল থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?”

পাক-নিহাদ-বান্নু চুপ করে রইলো।

"তুমি তো পিতার কাছে কোনো কথা গোপন করো না কন্যা," কণ্ঠস্বর কোমল করে দারা বললো।

"এক জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলাম আমার ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে।"

এত ভাবনার মধ্যেও দারা একটু না হেসে পারলো না। তারপর আবার গম্ভীর হয়ে বললো, "আমার কিংবা তোমার জননীর অনুমতি নেওয়া উচিত ছিলো। আমরা তো তোমাদের কোনো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিনা, আর তোমরাও কোনোদিন কোনো অন্যায় ইচ্ছা প্রকাশ করো না। এবার তোমার এই মতিভ্রম হোলো কেন? দেখতেই তো পেলে, এক নিরপরাধ বীর পুরুষ তোমার ভুলের জন্যে অকারণ কত কষ্ট ভোগ করলো। তার সঙ্গে কি তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো?"

"না, আলিজা। তার আগেই উনি ধরা পড়েছিলেন।"

"আমায় তোমার তখনই জানানো উচিত ছিলো। তখন তাকে বাঁচানো আমার পক্ষে সহজ হোতো। এখন তো রোশন-আরার হাত থেকে তাকে উদ্ধার করা নিতান্ত শক্ত। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না, রোশন-আরা কেন তাকে অপহরণ করতে গেল কয়েদ-খানা থেকে।"

দারা মুখে বললো বটে একথা, কিন্তু মনে মনে তার একটা ভয় হোলো রোশন-আরা ওসমানের আসল পরিচয় সন্দেহ করছে না তো? কিন্তু তাও বা কি করে সম্ভব,—ভেবে পেলো না দারা। কিন্তু যদি সত্যি তাই হয়, তাহলে তো খুব সাংঘাতিক কথা!

এত কথা পাক-নিহাদ-বানু কি করে জানবে। দারার কথা শুনে সে বলে উঠলো, "ছোটী ফুফী সাহিবা নিশ্চয়ই কোনো ভুল করেছেন।"

"হয়তো তাই," দারা আনমনে বললো। কি যেন ভাবছিলো সে, তারপর বলে উঠলো, "পাক-নিহাদ-বানু—"

"বলুন আলিজা!"

"উপায় একটা স্থির করতে হবে। কাজটা শক্ত। তুমি পারবে?"

"আমি ওঁর জন্যে যে'কোনো কিছু করতে রাজী আছি আলিজা। আমার বিপদে উনি আমার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। এখন ওঁর বিপদে ওঁকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য।"

"দারার কন্যার উপযুক্ত কথা বলেছো," দারা বলে উঠলো, তারপর হাসিমুখে সস্নেহে তাকালো কন্যার দিকে। বললো, "আচ্ছা, তুমি মহলে গিয়ে বিশ্রাম করো। কিছুক্ষণ পরে আমি আবার আসবো তোমার কাছে।"

আরাম্-গাহ্‌তে যাওয়া আর হোলো না। দারা ফিরে গেল নিজের মজলিস কক্ষে। তারপর মুন্সি পাঠিয়ে ইত্তলা দিলো ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌কে।

অবিলম্বে উপস্থিত হোলো ইসমাইল বেগ্।

তুজনের মধ্যে নিচু গলায় কথাবার্তা হোলো অনেকক্ষণ।

তারপর দারা গেল পাক-নিহাদ-বানুর কাছে। কিছুক্ষণ পরে সেখান থেকে বেরিয়ে উপস্থিত হোলো নাদিরাবানু বেগমের কাছে। বললো, "আরাম-গাহতে আর গেলাম না। এবেলা আমি এখানেই বিশ্রাম করবো। আর শোনো। খবর পেয়েছি যে আলা হজরতের শরীর সুস্থ নয়। স্থির করেছি সায়াহ্নকালে আমি ওঁকে তসলিম জানাতে যাবো। তুমি, পাক-নিহাদ-বানু আর জাহাঁজেববানুও সঙ্গে যাবে।"

শাহ-ই-আলিজা দারা শিকো আরাম-গাহতে আসেনি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসে রইলো উদিপুরীবাঈ। তারপর এক সময় খোজা মহম্মদ লতিফ এসে জানালো যে, শাহ-ই-আলিজা আজ আসবেন না। উনি আরাম করছেন বেগম সাহিবার মহলে।

সন্ধ্যায় সবাই কেল্লায় শাহী মহলে যাবে শাহ-ইন-শাহকে দর্শন করতে

অপ্রত্যাশিত ছুটি পেয়ে তৃপ্তি বোধ করলো উদিপুরীবাঈ। বললো, "বাঁচা গেল। একলা বসে মনের সুখে শরাব পান করা যাবে।"

ইতিমধ্যেই কয়েক পিয়ালা হয়ে গিয়েছিলো। নেশাটা বেশ ধরে এসেছে। পিয়ালায় আবার শরাব ঢাললো উদিপুরীবাঈ।

"একটা খারাপ খবর আছে।" বললো খোজা মহম্মদ লতিফ।

"কি? না ভাই, আমার জন্যে কোনো খারাপ খবর থাকতে পারে না," উদিপুরী বললো একটু জড়িয়ে জড়িয়ে।

"পাখি উড়ে গেছে।"

"কি বললে?"

"পিঁজরা থেকে পাখি উড়ে গেছে।"

"কি?" চকিতে উদিপুরীবাঈয়ের নেশা ছুটে গেল। সোজা হয়ে উঠে বসলো সে। "ওসমান বেগ্ পালিয়েছে? কয়েদখানা থেকে? কি করে?"

"ওদের লোকেরা বোধ হয় খবর পেয়ে গিয়েছিলো। কয়েকজন লুকিয়ে কয়েদখানায় ঢুকে প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে ওকে বার করে নিয়ে গেছে।"

"ম্।" কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলো উদিপুরীবাঈ। "বাহাদুর ছেলে। কিন্তু উদিপুরীবাঈকে চেনে না। এক কাজ করো। একজন লোক পাঠিয়ে দাও, ইয়ার ইসমাইল বেগ্এর বাড়ির উপর নজর রাখবে। যাবে আর কোথায়? ঘুরে ফিরে তো ফিরতে হবে সেখানেই। ওরা ওকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে না। ওরা জানেনা যে ওরা ছাড়া আরো একজন জানে ওসমানের পরিচয়।"

খোজা মহম্মদ লতিফ চলে গেল। আরামগাহ্ থেকে উদিপুরী-বাঈ ফিরে এলো পরস্তার মহলে নিজের কক্ষে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হোলো। ফিরে এলো মহম্মদ লতিফ।

"কি খবর মহম্মদ লতিফ?"

"ওখানে কোনো খবর নেই। ওরাও ওকে খোঁজাখুঁজি করছে। ফতিমা বিবি না খেয়ে বসে আছে কাল রাত থেকে। ইসমাইল বেগ্ সেই যে দুপুরে আবার বেরিয়েছে ওসমানের খোঁজে, এখন পর্যন্ত ফেরেনি।"

"ম্। তাহলে আর কোথায় যেতে পারে?"

"কেল্লায় পাঠিয়েছিলাম আমাদের একজন খাদিমানকে। তার চাচীর মেয়ে খাসমহলে পর্‌হুনর্‌-বানু বেগম সাহিবার খাদিমান। সেখানে নাকি খোজাদের মধ্যে একটা চাপা কানাঘুসো চলেছে যে, কাল রাত্তিরে ছোটী বেগম সাহিবার খোজা খাদিম লিয়াকত হোসেন আর তার অনুগত চারজন লোক বাইরে থেকে এক অপরিচিত ব্যক্তিকে চোখ বন্ধ করে মহলের ভিতর নিয়ে এসে তহ্‌খানায় আটক করে রেখেছে। গভীর রাতে ছোটী বেগম সাহিবা নিজে নাকি দেখতে গিয়েছিলেন তাকে। সবাই বলছে লোকটির বয়েস খুব কম, অত্যন্ত খুবসুরত নাকি দেখতে।"

"একথা এতক্ষণ বলোনি কেন?" উত্তেজনায় আরক্ত হয়ে উঠলো উদিপুরীর চাঁদের মতো মুখ, "কিন্তু ছোটী বেগম সাহিবা? উনি সন্দেহ করলেন কি করে? আচ্ছা! দেখি কার বুদ্ধি বেশী, আমার না ওই রোশন-আরার।"

শাহজাদা কি শাহজাদীদের নাম ধরে উল্লেখ করা অমার্জনীয় অসৌজন্য, কিন্তু রোশন-আরাকে উদিপুরীবাঈ এত অপছন্দ করতো যে, নিজের অনুগতজনদের সামনে মাঝে মাঝে তার নাম ধরে উল্লেখ করতে দ্বিধাবোধ করতো না। কিছুক্ষণ গভীর চিন্তা করলো উদিপুরীবাঈ। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "শাহ-ই-আলিজা কি শাহ-ইন-শাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ, যাত্রার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আর একটু পরেই ওঁদের তাঞ্জাম ও পাল্কি রওনা হবে।"

"যাচ্ছেন কেন ? আজ তো যাওয়ার কথা ছিলো না।"

"শুনলাম শাহ-ইন-শাহ্‌র শরীর সুস্থ নয়।"

"ওঁর শরীর কবে সুস্থ থাকে ?" নিজের মনে গজরালো উদিপুরী-বাঈ। তারপর মহম্মদ লতিফের দিকে ফিরে বললো, "শোনো, সেই খাদিমানকে এখুনি আবার কেল্লায় পাঠিয়ে দাও। সে গিয়ে দেখা করবে ছোটী বেগম সাহিবার খাদিমান আমিনার সঙ্গে। ছোটী বেগম সাহিবার জানা দরকার যে, শাহ-ই-আলিজা খবর পেয়েছেন যে ওসমান তহ্‌খানায় আটক হয়ে আছে। কোনো একটা মতলব নিয়েই তিনি যাচ্ছেন খাস্‌মহলে। ছোটী বেগম সাহিবা যেন শাহ-ই-আলিজাকে এক মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টির আড়াল না করেন। ওঁর লোকজনেরা যেন কড়া নজর রাখে শাহ-ই-আলিজার সঙ্গী খোজাদের উপর।"

"কিন্তু শাহ-ই-আলিজা তো কিছুই জানেন না," মহম্মদ লতিফ বললো।

"তা আমি জানি। আমি শুধু এটাই চাই যে ওই অর্বাচীন নারী রোশন-আরা যেন সর্বক্ষণ শাহ-ই-আলিজার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, ওর লোকজনদের নজর থাকে অন্যদিকে। তাহলে আমাকে কেউ আর লক্ষ্য করবে না, পথ পরিস্কার থাকবে আমার জন্যে।"

"আপনিও যাচ্ছেন খাসমহলে ?"

"হ্যাঁ। মহলদারের কাছ থেকে আমার জন্যে একটা বাইরে যাওয়ার দস্তক আনিয়ে নাও, তবে খাসমহলে যাওয়ার জন্যে নয়, আলা-উল-মুল্‌কের মঞ্জিলে যাওয়ার জন্যে। শাহী কেল্লার ভিতরে ঢুকবার দস্তক আমার তো আছেই। আমি শাহজাদী গওহর-আরা বেগম সাহিবার সহেলী, আমায় রুখবে কে ?"

খোজা মহম্মদ লতিফ চলে যাচ্ছিলো। আবার পেছন থেকে ডাকলো উদিপুরীবাঈ।

"শোনো, খাদিমানকে কেল্লায় পাঠিয়ে লাভ নেই। যদি ছোটী বেগম সাহিবা সন্দেহ করে যে খবরটা আমি পাঠিয়েছি, তাহলে উল্টো ফল হবে। ওকে বরং পাঠাও শাহ-ই-আলিজার খাদিম খোজা মকবুলের কাছে, কথায় কথায় তাকে বলুক। সে ছোটী বেগম সাহিবার লোক। ঠিক খবর দিয়ে দেবে তক্ষুনি।"

প্রত্যেকদিনকার রেওয়াজ মতো বাদশাহ্ শাহ জাহান সেদিনও সন্ধ্যেবেলা মুসম্মন বুর্জ্ এ "সুখশয্যার" উপর বসেছিলো। সুদূরে যমুনার পাড়ে তাজমহলের পৃষ্ঠভূমি। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে তাজের মর্মর মিনারগুলো ঘিরে।

শাহ-ইন-শাহ্‌কে ঘিরে নিচে গালিচার উপর বসেছিলো জাহান-আরা, রোশন-আরা, দারা শিকোহ্, নাদিরা-বানু আর পাক-নিহাদ-বানু। রোশন-আরাও যে এসে যোগ দেবে এটা দারা আশা করেনি। শাহ জাহানের কাছে আসবার আগে জাহান-আরার সঙ্গে আড়ালে কিছুক্ষণ কথা বলে নিয়েছিলো, স্থির হয়েছিলো যে সংবাদ পাঠিয়ে রোশন-আরাকেও ডাকিয়ে আনা হবে। কিন্তু রোশন-আরা বিনা ইত্তলাতেই এলো। বললো, "আমাদের প্রিয় ভ্রাতা দারা আসছে শুনে চলে এলাম। আজ আমাদের খানদানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কতকগুলো জরুরী বিষয় আলোচনা করার ইচ্ছা আছে আলা হজরতের সামনে।"

রোশন-আরার উপস্থিতির জন্যে দারা যথারীতি আনন্দ প্রকাশ করলো খানদানী কেতায়। তারপর বললো, "আলা হজরতের শরীর সুস্থ নয়, ইদানীং বহু গুরুতর সমস্যার চাপে ওঁর চিত্ত ভারাক্রান্ত। তাই আমাদের খানদান সম্পর্কিত গুরুতর আলোচনা আজ থাক। বরং আলা হজরত তাঁর পুত্রবধূ, দৌহিত্রী ও কন্যাদের

সঙ্গে বাক্যালাপ করুন, আমি ওঁর অনুমতি নিয়ে একবার আমাদের প্রিয় ভগ্নী গওহর-আরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। ওর সঙ্গে কিছুদিন দেখা হয় নি।"

"আপনি কেন আপনার সঙ্গ থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন," বলে উঠলো রোশন-আরা, "আপনি কাছে থাকলে আলা হজরত প্রফুল্ল বোধ করেন। বরং আলা হজরতই ইত্তলা দিন গওহর-আরাকে। সেও তশরিফ আনুক এখানে।"

"এটা ভালো কথা বলেছে রোশন-আরা," বললো শাহজাহান, "গওহর-আরাকে ইত্তলা দাও।"

একটু পরে গওহর-আরাও এসে যোগ দিলো সবার সঙ্গে। কিছুক্ষণ সাধারণ পারিবারিক কথাবার্তার পর দারা জাহান-আরাকে বললো, "এরা তো সবাই আছে এখানে। আলা হজরতের অনুমতি নিয়ে তুমি আর আমি আঙ্গুরীবাগে একটু বেরিয়ে আসতে পারি।"

জাহান-আরা কোন উত্তর দেওয়ার আগেই রোশন-আরা বলে উঠলো, "জাহান-আরা এ সময় সর্বদাই আলা হজরতের সঙ্গে থাকেন। প্রত্যেকদিনকার এই রেওয়াজের ব্যতিক্রম করার আজ কী দরকার। আঙ্গুরীবাগে বেড়ানোর জন্যে তোমার সঙ্গ দরকার হলে আলা হজরতের অনুমতি নিয়ে আমিই আসতে পারি।"

দারা আর জাহান-আরা দুজন দুজনের দিকে তাকালো। এটাই চাইছিলো দারা। রোশন-আরা যেন কিছুতেই দারার কাছ ছাড়া হতে না চায়। তাকে এ ভাবেই কিছুক্ষণ আটকে রাখা প্রয়োজন।

জাহান-আরা উত্তর দিলো, "আজ আর আঙ্গুরীবাগে যাওয়ার কি প্রয়োজন? আলা হজরত একটু সুস্থ হোন, তখন সবাই একসঙ্গে আঙ্গুরীবাগে গিয়ে বসবো। এখন তো বিলায়তী ফুলের মরসুম এসেছে, আর কিছুদিনের মধ্যেই নানারকম নতুন জাতের ফুল ফুটতে শুরু করবে।"

"শাহ-ই-আলিজার মন আজকাল বড়ই বিক্ষিপ্ত," বললো নাদিরা-বানু, "কোথাও বেশীক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারেন না।"

"পিতার সামনেও না?" শাহ জাহান হেসে জিজ্ঞেস করলো।

নাদিরাবানু বেগম একটু অপ্রতিভ হয়ে উত্তর দিলো, "কথাটি আমি খুব সাধারণভাবেই বলছিলাম আলা হজরত। স্থির হয়ে থাকতে পারেন শুধু আপনারই সামনে, আর কারো কাছে নয়।"

"নাদিরাবানুই ভালো জানেন," হেসে বললো গওহর-আরা।

নাদিরাবানুর কর্ণমূল আরক্তিম হোলো। শাহ জাহান আর জাহান-আরা হাসলো।

"সব শাহজাদার পত্নীরই ওই একই অভিযোগ," হাসতে হাসতে বললো শাহ জাহান।

"শুনলাম আপনার মহলের সীমানার মধ্যে নাকি চোর ঢুকেছিলো," বলে উঠলো রোশন-আরা।

দারার মুখ গম্ভীর হোলো। আশ্চর্য স্পর্ধা রোশন-আরার! বললো, "খানদানী মহল সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যতো গুজব শোনা যায়, সব কথায় কান দেওয়া যায় নাকি? সেদিন বাজারে সবাই বলছিলো মহলের কেউ বাইরের একটি লোক ধরে এনে তহখানায় আটকে রেখেছে। এই অসম্ভব কথাও বিশ্বাস করতে হবে নাকি?"

রোশন-আরা হাসলো। দারাকে চটিয়ে দিয়ে ওর মুখ থেকে একথাই শুনতে চাইছিলো সে। খোজা মকবুল তাহলে ঠিক সংবাদই এনেছে। দারা জানে যে ওই লোকটি এখানেই আছে।

জাহান-আরা হঠাৎ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালো দারার দিকে। তারপর বললো, "সবাই মিলে তহ্‌খানা তদারক করে এলেই হয়।"

রোশন-আরা বিরক্তির ভাব দেখালো। "বাজারের লোকের স্পর্ধা তো কম নয়! স্বয়ং বাদশাহ্‌র খাসমহল সম্বন্ধে এরকম আলোচনা করতে সাহস করে! কালই মুহ্‌তাসিবদের পাঠিয়ে

দেওয়া হোক বাজারে, তারা তদন্ত করুক। যারা এরকম কথা রটাচ্ছে, তাদের কঠিন সাজা হওয়া উচিত।"

শাহ জাহান হেসে বললো, "কথায় কথায় যদি প্রজাদের কঠিন সাজা দেওয়া হয়, তাহলে রাজ্যের কোনো প্রজাই আর কয়েদখানার বাইরে থাকবে না। খানদানী ঘরানা সম্বন্ধে সাধারণ লোকেরা অনেক কথাই বলে। এটা তাদের একরকম অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের উচিত নয় এসব সামান্য কথায় বিচলিত হওয়া। একি সম্ভব! আমাদের দেওড়ির চৌকি কি ঘুমোয় সব সময় যে তাদের নজর এড়িয়ে কাউকে মহলের ভিতর এনে তহ্‌খানায় লুকিয়ে আটকে রাখা হবে? আমার সামনে ইতরজনের গুজব কিস্‌সার আলোচনা আমি পছন্দ করি না।" বলতে বলতে যেন বিরক্ত হয়ে উঠলো শাহ জাহান।

সবাই চুপ করে রইলো একটুখানি। তারপর রোশন-আরা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললো, "আমি আজ আলা হজরতের উপস্থিতিতে সুলতান শারিয়ারের পুত্র এবং আমাদের কন্যা পাক-নিহাদ-বানুর কথা আলোচনা করতে চাই। এ সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া প্রয়োজন।"

রোশন-আরার একথার সুযোগ নিলো দারা। কিছুক্ষণ থেকে পাক-নিহাদ-বানুকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়ার ছুতো খুঁজছিলো মনে মনে। বলে উঠলো, "পাক-নিহাদ-বানু ততক্ষণ আমাদের ভগ্নী পর্‌হুনর-বানুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসুক। এসব আলোচনা ওর সামনে না হওয়াই ভালো।"

"পর্‌হুনর্‌-বানু মচ্ছি-ভবনে বেড়াতে গেছে," বললো রোশন-আরা, "পাক-নিহাদ-বানু সেখানে যেতে পারে।"

"আমি ভাবছি বড়ী ফুফী সাহিবার কিতাব্‌গাহ্‌তে যাবো," পাক-নিহাদ-বানু বলে উঠলো।

"হ্যাঁ, সেখানেই যাও," বললো জাহান-আরা, "সম্প্রতি কিছু

নতুন দিওয়ান সংগ্রহ করেছি। কিতাব্‌গাহ্‌র খাদিমানকে বললে সে বার করে দেবে।"

শাহ জাহানের অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল পাক-নিহাদ-বানু।

"আমাদের কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হয়েছে," শুরু করলো রোশন-আরা, "এবার ওর বিবাহের ব্যাপারে আমাদের তৎপর হওয়া উচিত। আমার মনে হয় আমাদের খুল্লতাত সুলতান শারিয়ারের পুত্র পাক-নিহাদ-বানুর উপযুক্ত পাত্র।—তুমি কি বলো, নাদিরাবানু—?"

নাদিরা বানু বেগম উত্তর দিলো, "আলা হজরত এবং শাহ-ই-আলিজা যা স্থির করবেন, তাই হবে।"

"আমি ভাবছিলাম," দারা বললো, "বিজাপুরের তরুণ সুলতানের সঙ্গে পাক-নিহাদ-বানুর বিবাহের সম্বন্ধের প্রস্তাবটা আমাদের একবার বিবেচনা করা উচিত।"

শাহ জাহান কোনো উত্তর দিলো না।

রোশন-আরা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। "দারার নিশ্চয় মতিভ্রম হয়েছে। আমরা বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছি, বিজাপুর অচিরেই মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হবে, এ অবস্থায় কি করে এই প্রস্তাব বিবেচনা করা যায়? এরকম কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করলে ওরা মনে করবে আমরা যুদ্ধ করতে ভয় পাই, আমরা আপোস করতে চাই ওদের সঙ্গে।"

"প্রস্তাবটা এখন করার কথা তো হচ্ছে না," বললো জাহান-আরা, "যা করবার কয়েক মাস পরে করা যাবে। এর মধ্যে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হতে পারে। আমরা বিজাপুরের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাচ্ছি বটে, কিন্তু আলা হজরত নিশ্চয়ই বিজাপুরের স্বাধীনতা হরণ করতে চান না।"

একটু হাসলো শাহ জাহান। উত্তর দিলো, "না, সেটা চাই না। শুধু চাই বিজাপুর আমাদের বশ্যতা স্বীকার করুক।"

রোশন-আরা মনে মনে হাসলো। দারার আসল মতলবটা ধরতে পেরেছে সে। ভাবলো,—যতোই চেষ্টা করো সেটা আর হতে দিচ্ছি না।

শাহ জাহানের কথার প্রত্যুত্তরে দারা বললো "তাই যদি আমাদের নীতি হয়, আমার মনে হয় বিজাপুর রাজ-পরিবারে কন্যা দান করাই বিজাপুর সম্বন্ধে আমাদের এই নীতিতে সাফল্য লাভ করার উৎকৃষ্ট পন্থা। তাহলে আর দক্ষিণ থেকে কেউ মোগল রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস করবে না।"

আওরংজেবের পশ্চাদ্‌ভাগে দারার কোনো মিত্রকে পাহারাদার রাখার প্রস্তাবে সমর্থন করা সম্ভব নয় রোশন-আরার পক্ষে। সে এই প্রস্তাবে তার বিরোধিতা জানালো।

ভাইবোনেদের মধ্যে শুরু হোলো তর্ক-বিতর্ক। শাহ জাহান আনমনে তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে।

উদিপুরী আঁচ করেছিলো যে, রোশন-আরা তার মহলে আগমন করার সংবাদ ঠিকই পাবে এবং এর যথার্থ কারণ সম্বন্ধে কল্পনা করে নিয়ে তাকে কড়া নজরে রাখবার আয়োজন করবে। তাই যখন শুনলো যে, রোশন-আরার পরামর্শ অনুযায়ী শাহ-ইন-শাহ্‌র ইস্তুলা এসেছে গওহর-আরার কাছে, সে বিস্মিত হোলো না। সে এসব সম্ভাবনার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলো। সে উপস্থিত হয়েছিলো বেশ কিছুক্ষণ আগে। এবং এটুকু সময়ের মধ্যে গওহর-আরার সাহায্যে যা যা ব্যবস্থা করবার করে নিয়েছিলো।

গওহর-আরা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে উদিপুরীবাঈ বেরিয়ে এলো গওহর-আরার মহল থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোক তার পথ আটকে দাঁড়ালো। একজনকে সে চেনে। সে রোশন-আরার খাস খোজা খাদিম খোজা মক্‌বুল।

"ছোটী বেগম সাহিবার হুকুম," সে বললো, "আজ আপনি এই মহল ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবেন না।"

খাসমহলে জাহান-আরা কি রোশন-আরার হুকুমের উপর কারো কোনো কথা চলে না। উদিপুরীবাঈ দুজনের কোষবদ্ধ তরবারির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো, তারপর আবার প্রবেশ করলো গওহর-আরার মহলে।

এটা একটুও অপ্রত্যাশিত নয়। বরং এধরণের সমস্ত সম্ভাবনা হিসেব করেই তৈরী হয়েছিলো তার পরিকল্পনা।—খোজা লিয়াকত হোসেনের জানবার কথা নয় যে, যেসময় ছোটী বেগম সাহিবা নিজে আটকে গেছে শাহজাহান ও দারার কাছে এবং এদিকে খোদ লিয়াকত হোসেন কড়া নজর রেখেছে উদিপুরীবাঈয়ের উপর, ঠিক সে সময় উদিপুরীর খাদিম খোজা মহম্মদ লতিফ এবং গওহর-আরার দুজন বিশ্বস্ত তাতার প্রহরিণী মুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে মহলের নিচে তহ্খানার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দ চরণে চুপচাপ এগিয়ে যাচ্ছে সেই কুঠরির দিকে, যেখানে বন্দী হয়ে আছে ইয়ার ওসমান বেগ্।

পাক-নিহাদ-বানু জাহান-আরার মহলের দিকে গেল না। নির্জন বারান্দা ধরে খানিকটা এগিয়ে মোড় ফিরতে এক জায়গায় সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে। সেখানে পাহারা দিচ্ছে এক তাতার রমণী। একটি থামের আড়ালে সরে গেল পাক-নিহাদ বানু। সেই তাতার রমণী থামটা পেরিয়ে যেতেই, পাক-নিহাদ-বানু চকিতে তার অলক্ষ্যে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। সঙ্কীর্ণ পথ ধরে কিছুটা গিয়ে মোড় ফিরলো এক জায়গায় এসে। সেই প্রশস্ত জায়গায় অনেকগুলো থাম একটার পর একটা। দীর্ঘ ছায়া পড়েছে ঘরের সর্বত্র। সে জায়গা থেকে একটা সরু পথ গেছে একদিকে। সেদিকে জেনানা কয়েদখানা। আরেকটি পথ বেরিয়ে গেছে অন্য

দিকে। সে পথের শেষে নিচে তহ্‌খানায় যাওয়ার সিঁড়ি। জেনানা কয়েদখানার ওদিকে আছে তাতার রমণীর পাহারা। এখান থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের পদচারণার আওয়াজ। তহ্‌খানার সিঁড়ির ওদিকেও পাহারা আছে। পেরিয়ে যেতে হবে তাকেও।

চারদিকে তাকালো পাক-নিহাদ-বানু। তারপর খুব মৃত্নু করতালিধ্বনি করলো। একটি থামের আড়াল থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো তার সামনে। সে জাহান-আরার খাস খাদিম খোজা হাসান আলি।

"অন্য লোকটি কোথায়?" জিজ্ঞেস করলো পাক-নিহাদ-বানু।

"এখানেই আছে।"

আরো একজন বেরিয়ে এলো থামের আড়াল থেকে।

"ওদিকে কজন আছে?" পাক-নিহাদ-বানু জানতে চাইলো।

"বেশী নয়। তহ্‌খানার সিঁড়ির মুখে একজন, আর নিচে সেই কুঠরির সামনে তুজন।"

"হাতে কিন্তু বেশী সময় নেই।"

"আমরা প্রস্তুত।"

"কি করতে হবে জানো?"

"হ্যাঁ। আমাদের বলে দিয়েছেন বড়ী বেগম সাহিবা।"

"ওকে কুঠরি থেকে বার করে আনা খুব শক্ত হবে না। কিন্তু নিচে খিজিরির দিকে যাওয়ার যে গুপ্তপথ আছে সেখানে যে পাহারা আছে, তাদের অতিক্রম করাই হবে শক্ত কাজ। তোমাদের একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলতে হবে এদিকে। ওদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব।"

তহ্‌খানার সিঁড়ির মুখে যে খোজাটি পাহারা দিচ্ছিলো, সে আনমনা ছিলো কিছুক্ষণ ধরে। বড্ডো একঘেয়ে এখানে এই

পাহারা দেওয়ার কাজ। সারাদিনে দুবার কি তিনবারের বেশী কারো সঙ্গে দেখা হয় না। নিচে তহ্খানায় কয়েদ হয়ে আছে এক-জন, তার জন্যে আহার্যদ্রব্য নিয়ে আসে একজন খাদিম, তার সঙ্গেই যা কিছু কথাবার্তা। আট ঘণ্টা পর পাহারা বদল হবে, আরেকজন আসবে তাকে অব্যাহতি দিতে। তখন একটু সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে হাত পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে দেওয়া যাবে শয্যার উপর। খোজা মহলের খাদিম তার জন্যে নিয়ে আসবে কাবাব তন্দুরী। একথা ভাবতে ভাবতে তার রসনা সিক্ত হোলো,—আর সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলো পিঠের উপর, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সামনের দিকে, গড়িয়ে পড়লো সিঁড়ির কয়েক ধাপ নিচে।

খোজা মহম্মদ লতিফের তরবারির অগ্রভাগ লাল হয়ে আছে তাজা রক্তে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালো, তারপর পেছনের দুজন সশস্ত্র তাতার রমণীর দিকে তাকিয়ে বললো, "এসো আমার পেছন পেছন।"

ইয়ার ওসমান বেগ্-এর জন্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো রোশন-আরা। বছরের এই সময় তহ্খানার ভেতরটা খুব ঠাণ্ডা, কেউ আসে না এখানে। কিন্তু তার জন্যে ঘরের এককোণে রাখা হয়েছিলো এক জ্বলন্ত অঙ্গারের পাত্র, যাতে ঘরটা একটু গরম থাকে। সুকোমল শয্যার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়েছিলো। তারই উপর বসে বিষণ্ণ মনে নানা কথা ভাবছিলো ওসমান।

এখান থেকে পালানো প্রয়োজন। কিন্তু কোনো উপায় নেই। ঘরের ভিতর আলোবাতাস আসারও পথ নেই। চারদিকে শুধু পাথরের শক্ত দেওয়াল। একমাত্র দরজাটা বাইরের থেকে "কুফুল" বা কুলুপ বন্ধ। সেখানে পাহারা দেয় দুজন সশস্ত্র প্রহরী। এর মধ্যে দুবার খাবার এসেছে তার জন্যে,—সকালে এবং দুপুরে। যে

খাবার নিয়ে এসেছে তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে মুক্ত কৃপাণধারী দুজন খোজা। তাদের যে কোনো একজনের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে অন্যজনকে ঘায়েল করা এমন কিছু দুঃসাধ্য কাজ বলে ওসমানের মনে হোলো না, কিন্তু তারপর? বাইরে আছে দুজন, তারপর প্রত্যেক বাঁকে, প্রত্যেক সিঁড়ির মুখে, সর্বত্র পাহারা আছে, —তাদের অতিক্রম করে যাওয়া যাবে কি করে? যাবেই বা কোথায়? শুনেছে, মহলের ভিতরে চারদিকে গোলক ধাঁধার মতো পথ,—পথ চিনে এখান থেকে বেরোনো অসম্ভব। অনর্থক প্রাণ দিতে হবে।

কিন্তু বাড়িতে ফতিমা বিবি নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়ে বিলাপ করতে শুরু করে দিয়েছে এতক্ষণে। চারদিকে খোঁজাখুঁজি করছে ইয়ার ইসমাইল বেগ। তাদের কথা মনে পড়তে ওসমানের বুক টনটন করে উঠলো। মনে হোলো, তার নিজের জন্যে না হোক, অন্তত ওদের জন্যে এখান থেকে মুক্তি পাওয়া প্রয়োজন।

এসব কথাই ভাবছিলো সে, হঠাৎ একটা চাপা আওয়াজ এলো তার কানে। মাথা তুললো সে। আওয়াজটা বাইরে থেকে আসছে। একটুখানি ইস্পাতের ঝন্‌ঝনা, তারপর ধুপধাপ দুটো ভারী বস্তু ভূমিতে পতনের শব্দ। ক্ষণিক স্তব্ধতার পর মনে হোলো কেউ যেন দরজার কুফুল্‌ খুলছে।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো ওসমান।

দরজা খুলে গেল। তলোয়ার হাতে ঘরে ঢুকলো একজন তার মুখে হাসি।

এমুখ ওসমানের চেনা। সেই এসে আগের দিন তাকে জানিয়েছিলো, তার সঙ্গে দেখা করতে চায় পূর্বদিনের সেই পাল্কি-আরোহিনী, এবং বিকেলে সেই তাকে পাল্কি চড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো শাহ-ই-আলিজার মহলে।

"আমায় চিনতে পারছো?" সে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ওসমান। হাসি খুব সহজ নয়, ধূর্ততার ছাপ খুব স্পষ্ট।

আর ভুলছি না—ওসমান ভাবলো,—একবার ঠকেছি, আর নয়।

"তোমায় মুক্তি দিতে এলাম বন্ধু," বললো খোজা মহম্মদ লতিফ, "এসো আমার সঙ্গে।"

"যদি না আসি?" খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো ওসমান।

"আসতেই হবে," আরো শান্ত গলায় মহম্মদ লতিফ বললো, "তুমি কি রকম ভয়ানক লোকের হাতে পড়েছো তুমি জানো না। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও এসো।"

ওসমান কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল বাইরে। আর সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের ঝনঝনা। মহম্মদ লতিফ চমকে দরজার দিকে তাকালো।

সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে এক তন্বী নারী। তার মুখ নকাবে ঢাকা, হাতে তলোয়ার।

মহম্মদ লতিফের মুখ শাদা হয়ে গেল। অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলো, "ছোটী বেগম সাহিবা?"

বিপুল বিস্ময়ের সঙ্গে ওসমান দেখলো সেই নারী অকুণ্ঠিতচিত্তে নকাব সরিয়ে নিলো মুখের উপর থেকে। অপরূপ সুষমামণ্ডিত সেই মুখ, দেখে মনে হয় সবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পন করেছে।

"ও। আপনি—।' একটা আশ্বস্ত ভাব ফুটে উঠলো মহম্মদ লতিফের মুখে। বললো, "আমি তো আপনাদের হয়েই এঁকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনি কেন কষ্ট করে এখানে এলেন? বাইরে ওরা আমারই লোক। আপনার সঙ্গীদের ক্ষান্ত হতে বলুন।"

"না," উত্তর দিলো পাক্-নিহাদ-বানু।

"পথ ছাড়ুন, আমরা বেরিয়ে যাই," বললো মহম্মদ লতিফ।

"না।"

আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে উঠলো মহম্মদ লতিফের মুখের ভাব। খুব নিচু গলায় বললো, "এসবের মধ্যে আপনি না এলেই বুদ্ধিমানের কাজ করতেন।"

ওসমানের মন সংশয়ে ভরে আছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সে। কে এসেছে তাকে মুক্ত করতে, কে এসেছে তাকে নতুন জটিলতার জালে জড়াতে কিছুই সে অনুধাবন করতে পারলো না। ভাবলো,—যা হবে হোক, আমার তো দর্শকের ভুমিকা। চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে দেখি, কি হচ্ছে ব্যাপারটা।

মহম্মদ লতিফ দৃঢ়মুষ্টিতে তলোয়ার চেপে ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

হঠাৎ যেন বিদ্যুত খেলে গেল, পাক-নিহাদ-বানুর তলোয়ারের ফলা উর্ধগামী হয়ে ঝলসে উঠলো ঘরের এককোণের চেরাগের মৃদু আলোয়। চকিতে সেটি উড়ে এলো ওসমানের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে ওসমান ধরে ফেললো তলোয়ারের বাঁট। আর সেই এক পলকেই ওসমান নিশ্চিতরূপে বুঝে নিলো কে তার বিপক্ষ।

পাক্-নিহাদ-বানু যে তলোয়ার ছুঁড়ে দেবে ওসমানের দিকে এটা মহম্মদ লতিফ কল্পনাও করতে পারে নি। সে ওসমানের দিকে

হাতে হাতিয়ার আসতেই মুহূর্তে রূপান্তরিত হোলো ওসমানের ব্যক্তিত্ব। মন ভরে উঠলো উল্লাসে, আত্মবিশ্বাসে। হাতে তলোয়ার থাকলে দুনিয়ায় কাউকে ভয় করে না ওসমান। এবার কে আসবে আসুক, দেখা যাক কে তাকে আটকে রাখে!

তাকে বৃথা আক্রমণ করলো মহম্মদ. লতিফ। অস্ত্রচালনায় সে ওসমানের কাছে একেবারে শিশু। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রাণ-হীন রক্তাক্ত দেহ নিচে লুটিয়ে পড়লো।

যমুনার পাড়ের উপর কেল্লার যে দরওয়াজা, তার নাম খিজিরি। সেটা বন্ধ থাকে প্রায়ই, যখন মহলের বেগম সাহিবাদের কিম্বা বাদশাহ্‌র জলবিহার করার আয়োজন হয়, খোলা হয় শুধু তখনই। তহ্‌খানার ওদিক থেকে খিজিরির দিকে যাওয়ার একটা গুপ্তপথও আছে। তার পাহারায় দুজন নিযুক্ত থাকে অষ্টপ্রহর। সেদিনও ওরা যথারীতি গাম্ভীর্যের সঙ্গে পায়চারি করছিলো, হঠাৎ কানে এলো কাছাকাছি কোথাও তলোয়ারের ঝনঝনা শুরু হয়েছে। দুজন তাকালো দুজনের দিকে, গোঁফে চুমড়ি দিলো, তারপর একজন বললো অন্যজনকে, "আমি এখানে আছি, তুমি গিয়ে দেখে এসো কি ব্যাপার!"

"পাহারা ছেড়ে চলে যাওয়া কি ঠিক হবে?"

"আরে, ভয় কিসের? ইরাণের ফৌজ তো কেল্লা অবরোধ করেনি যে এত কড়াকড়ি করতে হবে। নিশ্চয়ই কারো মধ্যে ঝগড়া বেধেছে। পারলে, ওদের থামিয়ে দিয়ে এসো।"

শাহ জাহানের আমলের শেষ দিকে ষড়যন্ত্র যা কিছু সব কূটনৈতিক পর্যায়ে, মহলের ভিতর কোনো সশস্ত্র বিদ্রোহ ও সংঘর্ষ হবার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারতো না। সাধারণভাবে একটু শান্তিময় ছিলো চারদিকের পরিবেশ, সুতরাং মনে কোনো রকম সন্দেহ না করেই একজন চলে গেল যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছে সেদিকে।

অন্যজন আস্তে আস্তে পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে গেল ডান দিকের বড়ো থামটা অবধি, সেখান থেকে আবার ফিরে দাঁড়ালো এদিকে আসবার জন্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে থামের আড়াল থেকে একজন তাকে জাপটে ধরলো পেছন থেকে। বলিষ্ঠ বাহুর চাপ পড়লো গলার উপর। সংজ্ঞা হারিয়ে সে আস্তে আস্তে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো। দড়ি ছিলো অন্য লোকটির সঙ্গে। সে খুব

ভালো করে বেঁধে ফেললো তার হাত পা, মুখে ঢুকিয়ে দিলো এক টুকরো রেশম। তারপর তাকে টেনে সরিয়ে দিলো এক কোণে অন্ধকারের মধ্যে।

থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো পাক-নিহাদ-বানু। চার-দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললো, "এবার এদিকে চলে আসুন ওসমান বেগ্। কেউ নেই। তাড়াতাড়ি।"

ইয়ার ওসমান বেগ্ উঠে পড়লো, তারপর আবছা অন্ধকার গুপ্তপথের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললো পাক-নিহাদ-বানুর পেছন পেছন।

কিছুক্ষণ পরে এক জায়গায় এসে পাক-নিহাদ-বানু থামলো। বললো, "শুনতে পাচ্ছেন?"

কান পাতলো ওসমান বেগ্। মৃদু জলোচ্ছ্বাসের শব্দ।

"ওদিকে থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে খিজিরির দিকে," বললো পাক-নিহাদ-বানু, "কিন্তু আমরা সেদিকে যাবো না। খিজিরির পাহারা অতিক্রম করা সম্ভব নয়।"

"তাহলে?"

"এদিকে আসুন।"

অন্য দিকে মোড় ফিরলো দুজনে। একটু এগোতেই দেখতে পেলো দেওয়ালের গায়ে একটি ছোটো জানলা। বন্ধ ছিলো, ওসমান সজোরে আকর্ষণ করতে খুলে গেল। বাইরে দেখা গেল খোলা আকাশ আর গাছপালা। চোখ ভরে আকাশের নীলিমা পান করলো ওসমান। আকাশ যে এত সুন্দর কে জানতো! এই দু-রাত্তির কয়েদবাস করে তার কাছে যেন জীবনের মূল্য অনেক বেড়ে গেছে।

"এবার আপনাকে একাই যেতে হবে," বললো পাক-নিহাদ-বানু, "জানলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, সাত হাত নিচে আছে একটি ছাদ। ওখানে কেল্লার চৌকি টহল দেয়। এখন কেউ নেই, কিন্তু

অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে কেউ না কেউ। ছাদটা অপ্রশস্ত, দশ হাতের বেশী নয়। তারপরই খাড়া দেওয়াল নেবে গেছে যমুনার বুকে। ওখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে আপনাকে সাঁতরে নদী পার হয়ে যেতে হবে। ওপারে দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে অপেক্ষা করছেন ইয়ার ইসমাইল বেগ্।"

"ইয়ার ইসমাইল বেগ!" হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলো ওসমান। তারপর বললো, "আজ আপনি আমায় যেভাবে সাহায্য করেছেন, তার জন্যে আমি সারাজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। আপনি কে আমি জানি না, যদি না জানান আমার জানবার অধিকারও নেই, তবে শুধু একথা বলতে চাই যে, আমার জীবন-দাত্রীর পরিচয় পেলে আমি নিজেকে ধন্য বোধ করবো।"

এতক্ষণে পাক-নিহাদ-বানুর খেয়াল হোলো যে মুখে নকাব তুলে দিতে তার মনে ছিলো না। মুখ তার আরক্ত হয়ে উঠলো। তাড়া-তাড়ি নকাব তুলে দিলো সে। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আমার পরিচয় জানবার অধিকার আপনার আছে, কারণ একদিন আপনিও আমার সম্ভ্রম রক্ষা করেছিলেন নিজের বিপদ তুচ্ছ করে।"

"আমি?" বিস্মিত হোলো ওসমান বেগ্।

"হ্যাঁ, তুদিন আগে সেই সন্ধ্যায় আমিই ছিলাম পাল্কির ভিতর। নস্‌রত্ খাঁ যখন পাল্কির পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন আপনিই এগিয়ে এসেছিলেন আমার সাহায্য করতে।"

"আপনি? আপনি ছিলেন সেই পাল্কিতে?"

"হ্যাঁ, আমি পাক-নিহাদ-বানু, শাহ-ই-আলিজার জ্যেষ্ঠা কন্যা।"

বিস্ময়ভরে তাকিয়ে দেখলো ওসমান বেগ, তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে তসলিম করলো। বললো, "বেগম সাহিবা, আমার গুস্তাকী মাফ করবেন, আমি ভাবতেই পারিনি, কিন্তু,—কাল আপনিই আমাকে ইত্তলা দিয়েছিলেন সেই লোকটার মারফতে?"

চারদিকে তাকালো পাক-নিহাদ-বানু, তারপর বললো, "এত কথা বলার সময় নেই ওসমান বেগ্, আপনি এবার যান। আমাকেও তো নিরাপদে মহলে ফিরে যেতে হবে।"

"   "

"কিছু আর জানতে চাইবেন না ওসমান বেগ্, আপনি এপর্যন্ত যা কষ্ট পেয়েছেন তার জন্যে দায়ী আমারই অবিমৃষ্যকারিতা। আমায় ক্ষমা করবেন। আমিই আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। যদি আবার কখনো দেখা হয়, তাহলে—," পাক্-নিহাদ-বানু কথা শেষ করতে পারলো না। শরমভারে তার জিহ্বা যেন অসাড় হয়ে গেল—।

ওসমান বেগ্ একটু চুপ করে রইলো, তারপর বললো, "বেগম সাহিবা। আমি সামান্য লোক। বাদশাহ্‌র ফৌজের একজন আহাদি হিসেবে আমার যা কর্তব্য তাই করেছি। আপনাদের জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দিতে আমি পশ্চাৎপদ নই,—কিন্তু কোনো রকম কূট চক্রান্তের জালে আমি জড়িয়ে পড়তে রাজী নই, যেমনটা ঘটেছে কাল সন্ধ্যার পর থেকে। আমি এখনো বুঝতে পারছি না, আমায় আটক করে, আমায় কয়েদ করে রেখে কার কি স্বার্থ! তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে আমার অজান্তে আমি কোনো কূট চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছি। আমি দরিদ্র পিতামাতার সন্তান, আমি এসব থেকে দূরে থাকতে চাই। আপনি শাহজাদী, আপনি শাহ-ই-আলিজার কন্যা, আপনার সাক্ষাৎ পাওয়ায় খুশ্ কিসমতি যে আমার হতে পারে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। আপনার করুণা আমি সারা জীবন মনে রাখবো,—কিন্তু—কিন্তু বেগম সাহিবা, আপনার সঙ্গে আর দেখা না হওয়াই আমাদের পরস্পরের পক্ষে মঙ্গলকর হবে।"

অনেকখানি নত হয়ে তসলিম করলো ওসমান বেগ্। তাকালো না পাক-নিহাদ-বানুর দিকে। তাকানোটা বে-আদব। তারপর

জানালা দিয়ে বেরিয়ে লাফিয়ে পড়লো নিচের ছাদে। দু-দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে অপ্রশস্ত ছাদ পেরিয়ে গেল, তার পর ঝাঁপ দিলো যমুনায়।

জানলায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো পাক-নিহাদ-বানু বেগম। ওসমান জানতে পারলো না যে, সজল হয়ে আছে শাহ্-ই-আলিজার কন্যার কাজল-কালো চোখ দুটো।

যমুনার ওপারে অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করছিলো ইয়ার ইসমাইল বেগ্। সেদিকটা একেবারে নির্জন। একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলো দুটি উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়া।

জল থেকে উঠে আসতে ইসমাইল বেগ্ ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো ওসমানকে। বলে উঠলো, "ওসমান, ওসমান, কাল রাত আর আজকের দিন আমার যে কী উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেছে তুমি জানো না। কি করে ওদের হাতে গিয়ে পড়েছিলে তুমি?"

"আমায় মাফ করো আব্বাজান," ওসমান উত্তর দিলো, "সব আমার ভুলেই হয়েছে। তবে আর কখনো এরকম হবে না। মা সুস্থ আছেন তো?"

"চলো, আমরা তোমার মায়ের কাছেই যাচ্ছি। তোমার জন্যে শুষ্ক বস্ত্রদি নিয়ে এসেছি, পোশাক পাল্টে নাও তাড়াতাড়ি। আমাদের হাতে বেশী সময় নেই।"

সিক্ত বসন ত্যাগ করে শুষ্ক বস্ত্রাদি পরিধান করলো ওসমান। তারপর দুজনে গিয়ে অশ্বে আরূঢ় হোলো।

ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো ইয়ার ইসমাইল বেগ্।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?" জিজ্ঞেস করলো ওসমান, "এ তো বাড়ি যাবার পথ নয়।"

"ওখানে আর ফিরে যাবো না, ওসমান। আগ্রার সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্ক শেষ। তোমার মা শহর থেকে তিন ক্রোশ

দূরে নাসির-আবাদে এক সরাইখানায় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। এখন আমরা সেখানেই যাচ্ছি।"

"তারপর ?"

"তারপর আমরা রওনা হবো দাক্ষিণাত্যের অভিমুখে, তোমার ভবিষ্যৎ সেখানেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে ওসমান।"

ওসমান আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

শহরতলির নির্জন পথ ধরে সন্ধ্যার ঘণায়মান অন্ধকারে দ্রুত বেগে ছুটে চললো দুজনের অশ্ব।

রাত্রি প্রথম প্রহর অতীত হওয়ায় কিছুক্ষণ পরে দারা ফিরে এলো মহলের ভিতর। শাহী কেল্লা থেকে সবাই ফিরে এসেছে অনেকক্ষণ আগে। দারা এতক্ষণ নিজের মজলিসে বসে জরুরী গোপনীয় আলোচনা করছিলো দাউদ খাঁ, কিলিচ খাঁ, দেবী সিংহ বুন্দেলা মুল্লা ফাজিল, মির্জা আবদুল্লা প্রমুখ কয়েকজন বিশ্বস্ত মনসবদারের সঙ্গে। বাদশাহ শাহজাদা আওরংজেবকে বিজাপুর আক্রমণ করবার নির্দেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন। শাহজাদাকে সাহায্য করার জন্যে উজীর মির জুমলাকেও দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হবে। যুদ্ধের সম্ভাবনা আর রোধ করা যাবেনা, কিন্তু আওরংজেব যাতে এ যুদ্ধে বেশী সাফল্যলাভ করতে না পারে, যাতে বাদশাহ্‌র নামে সে বিজাপুর দখল না করে, তারই জন্যে নানারকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করার নীতি নির্ধারিত করতে হবে। এবিষয়ে আলোচনা করতে করতে কেটে গেছে অনেকখানি সময়।

দস্তরখান্ পাতা হোল। স্ত্রী পুত্র কন্যাদের সঙ্গে ভোজন করতে বসলো দারা শিকো। লক্ষ্য করলো যে, পাক-নিহাদ-বানু সেখানে অনুপস্থিত।

"সে মহলে ফিরে আসার পর থেকেই অসুস্থ বোধ করছে," নাদিরা বা জানালো, "একা শুয়ে আছে নিজের মহলে।"

দারা আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। সবাই লক্ষ্য করলো দারা বেশ অন্যমনস্ক। বেশী কথাবার্তা হোলো না।

ভোজন সমাধা হবার পর দারা নাদিরা বানুর মহল থেকে বেরিয়ে এসে পাক-নিহাদ-বানুর মহলের দিকে যাচ্ছিলো। খোজা মকবুল এসে তসলিম করে বললো, "শাহ-ই-আলিজা, আজ উদিপুরীবাঈ আরামগাহ্‌তে আপনার খিদমতে হাজির থাকতে পারবেন না বলে মার্জনা চাইছেন।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো দারা।

"উনি শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে শয্যাগত হয়ে আছেন। শাহী কেল্লা থেকে ফিরে আসবার পর থেকেই ওঁর শিরঃপীড়া শুরু হয়েছে।"

"উদিপুরীবাঈ শাহী কেল্লায় গিয়েছিলো?" দারা একটু বিস্মিত হোলো। কিন্তু মাথায় তখন নানা দুর্ভাবনা। একজন পরস্তারের শিরঃপীড়া নিয়ে চিন্তা করবার অবকাশ নেই। কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই এগিয়ে গেল, প্রবেশ করলো পাক-নিহাদ-বানুর মহলে।

পাক-নিহাদ-বানুর খাদিমান আগেই শাহ-ই-আলিজার আগমনবার্তা যথারীতি ঘোষণা করে গিয়েছিলো, তাই দারা যখন কক্ষে প্রবেশ করলো সে তখন শয্যার উপরে উঠে বসেছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো দারা শিকো। পাক-নিহাদ-বানুর মুখ অতি বিষণ্ণ, চোখ দুটো বেদনায় ভারাক্রান্ত। দারা কাছে এসে কন্যার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলো, তারপর বললো, "পাক-নিহাদ-বানু, অদূর ভবিষ্যতে আমি হবো বাদশাহ। তুমি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা। ভুলে যেও না, তৈমুর বংশের বাদশাহজাদীর দায়িত্ব অনেক। এত সহজে বিচলিত হলে তো চলবে না। আগে বংশের শরম্-ইজ্জত, তারপর অন্য সব কিছু। একরাত্রি উপবাস করলে কিছু হয় না, হিন্দু নারীরা তো প্রায়ই করে,—তবে কাল আমি

যেন তোমায় সম্পূর্ণ সুস্থ দেখতে পাই।" একটু হাসলো দারা। তারপর খুব কোমল গলায় বললো, "আমি আশা করছি, একদিন তুমি হবে বিজাপুরের বেগম সাহিবা। তবে এখনো সময় হয়নি।"

পাক-নিহাদ-বানুর চোখ থেকে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। বলে উঠলো, "না আলিজা, আমি আর কোনো সুলতান কি বাদশাহ্‌র বেগম হতে চাই না। বড়ী ফুফী সাহেবা আর ছোটী ফুফী সাহেবার মতো আমি অনূঢ়া থেকে যাবো সারা জীবন।"

"সেটা হয়তো সম্ভব হবে না," গম্ভীর হয়ে গেল দারা, আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালো জানলার কাছে। "হয়তো একদিন তোমায় যেতে হবে দাক্ষিণাত্যে।" জানলার বাইরে দক্ষিণের আকাশে দপদপ করে জ্বলছে একটি তারা, সেদিকে তাকিয়ে বলে গেল, "জানিনা কেন, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের একটা নতুন পরিচ্ছেদ শুরু হবে দাক্ষিণাত্যে, হয়তো শুরু হয়ে গেছে। বন্যার মতো একটা দুর্বার শক্তি প্রবাহিত হবে সেখান থেকে,—আর তাকে রুখতে না পারলে আমরা সবাই ভেসে যাবো,—আমি, তুমি, নাদিরা বানু, সুলেমান, স্বয়ং আলা হজরত বাদশাহ শাহ জাহান, সব্বাই।"

পাঁচ

প্রায় একমাস পরের কথা। আওরঙ্গাবাদে সেদিন বেশ উত্তেজনা। শহরকেন্দ্রের বাজার মহল্লায় সবারই মুখে একই কথা। রাতারাতি বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে দোকানদারেরা। কোনো কোনো জিনিস পাওয়াই যাচ্ছে না, বিশেষ করে যেসব আমদানি হয় বিজাপুর থেকে। পরে দুর্মূল্য হয়ে উঠবে এই প্রত্যাশায় দোকানীরা সে সব মাল সরিয়ে ফেলেছে দোকান থেকে। জায়গায় জায়গায় শোনা যাচ্ছে ক্রেতা ও দোকানদারদের মধ্যে কলহ।

পথ দিয়ে দ্রুত ছুটে গেল একদল "বারগির" বা অশ্বারোহী সৈন্য। পথচারীরা দাঁড়িয়ে পড়ে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলো। কয়েকদিন ধরে আহশাম্, বার্গির, শিলাহ্দার, বন্দুক্চি প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সৈন্যদের যেতে দেখা যাচ্ছে কেল্লার দিকে, বাইরের নানা জায়গা থেকে সৈন্যদল এসে জড়ো হচ্ছে আওরঙ্গাবাদে। এক জায়গায় চার পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছিলো। "বার্গির্"দের দল চলে যাওয়ার পর একজন বললো, "শুনছি, উমরাহ মহবত খাঁ শাহজাদার ফৌজের মির বক্শি নিযুক্ত হয়েছেন। বিজাপুর অভিযানের নেতৃত্ব করবেন তিনিই।"

"না," বলে উঠলো আরেকজন, "শাহজাদা আওরংজেব নিজে সৈন্য পরিচালনা করছেন।"

"শাহজাদা নিজে আওরঙ্গাবাদ ছেড়ে যাবেন বলে মনে হয় না," তার পাশের লোকটি বললো, "উজীর মির জুমলা তাঁর গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আগ্রা থেকে রওনা হয়েছেন।

মাসখানেকের মধ্যে তিনি এখানে পৌঁছে যাবেন। বিজাপুর আক্রমণ করবেন তিনি নিজে।”

“শাহজাদা আওরঙ্গাবাদ ছেড়ে যাবেন না কেন?”

“আগ্রার উপর নজর রাখবে কে? শুনছি বাদশাহ্‌র শরীর সুস্থ নয়।”

কাছে দাঁড়িয়ে আরেকজন তাদের বাক্যালাপ শুনছিলো। তার উপর চোখ পড়লো একজনের।

“লোকটা বিদেশী মনে হচ্ছে,” একজন নিচু গলায় বললো।

সবাই তাকিয়ে দেখলো তার দিকে।

“হ্যাঁ, হিন্দুস্থানী নয়,” আরেকজন সায় দিলো, “নাকটা চাপা। সিদ্দি বলে মনে হচ্ছে।”

“বিজাপুরের লোক নয় তো?”

“না, না। অনেক সিদ্দি আওরঙ্গাবাদেও আছে। ওরা সুরাটের ওদিকের জন্‌জিরার অধিবাসী।”

“বিশ্বাস নেই ভাই, আমার এক ভাই কাছারির আমিন্। সে বলছিলো আওরঙ্গাবাদে বিজাপুরের গুপ্তচর অনেক আছে।”

বিদেশী লোকটি টের পেলো যে তাকে লক্ষ্য করছে এরা সবাই। সে নিজের মনে একটু হেসে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো। তারপর এসে দাঁড়ালো একটি আতরের দোকানের সামনে।

“আসুন মিঞা সাহেব,” বলে উঠলো দোকানদার, “খোরাসান থেকে হেনার আতর এসেছে, খুব চমৎকার জিনিস।”

সেই সিদ্দি চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপর উঠে এলো দোকানের ভিতর।

“ভাবগতিক ভালো মনে হচ্ছে না,” বললো দোকানদার।

“না ওয়াজিদ, পরিস্থিতি সত্যি ভালো নয়। নতুন কোনো খবর আছে?”

"না," উত্তর দিলো দোকানদার ওয়াজিদ, "শুধু বাজারের গুজব। তুমি যা শুনেছো হানিফ, তার বেশী কিছু জানা যায় নি।"

"উজীর মির জুমলা নিজে রওনা হয়েছেন আওরঙ্গাবাদ থেকে," সিদ্দি হানিফ বললো।

"লোকে তো তাই বলছে, কিন্তু আমাদের উকীল ইকবাল খাঁ বিশ্বাস করেন না সে কথা। ওঁর ধারণা বাদশাহ শাহ জাহানের তবিয়ত ভালো নয়, এসময় মির জুমলা আগ্রা ছেড়ে আসবে কি করে?"

"ইকবাল খাঁর মগজে কিছু নেই, ওর কথা ছেড়ে দাও," সিদ্দি হানিফ উত্তর দিলো, "আমাদের স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্র প্রিয়পাত্র বলে আওরঙ্গাবাদে বিজাপুরের উকিল নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমার মালিক বিজাপুর দরবারের উজীর সর্দার খাঁ-মহম্মদ ওঁকে একেবারে পছন্দ করেন না।"

"যাই হোক, সর্দার ইকবাল খাঁর উচিত এই সংবাদ বিজাপুর দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া।"

"ওর উপর ভরসা করা যায় না। সংবাদ আমি নিজেই পাঠাবো আমাদের উজীর সাহেবের কাছে। হ্যাঁ, শুনছি নাকি অনেক রাজপুত সৈন্য আসছে?"

"হ্যাঁ, সিদ্দি হানিফ, হাডার রাও ছত্রসাল আর রাজা রায় সিংহ সিসোদিয়ার সঙ্গে দু-দল রাজপুত অশ্বারোহী এসেছে আওরঙ্গাবাদে। শুনছি মেবারের মহারাণা রাজ সিংহও একদল সৈন্য পাঠাচ্ছেন। তাঁর দূত উদয়করণ চৌহান ও শঙ্কর ভট্ট ইতিমধ্যে এসে সাক্ষাৎ করেছেন শাহজাদা আওরংজেবের সঙ্গে।"

"হুঁম্। এই খবরটা গুরুত্বপূর্ণ। বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ হবে বলে চারদিক থেকে এত সৈন্য সংগ্রহ করার শাহজাদার কি দরকার? হিন্দুস্তান, গুজরাট, লাহোর, বেরার থেকে বাছা বাছা মনসবদার সবাই এসে যোগ দিচ্ছে শাহজাদার সঙ্গে। শাহজাদা

তাঁর বিশ্বস্ত সবাইকে এই সুযোগে জড়ো করছেন আওরঙ্গাবাদে। কেন ?"

"সত্যিই তো! কেন ?" প্রতিধ্বনির মতো বলে উঠলো ওয়াজিদ। সেও বিজাপুরের একজন সওয়ানিহ্-নিগার্ বা গোপন সংবাদদাতা, দোকানদারের ছদ্মবেশে আওরঙ্গাবাদের বাজার মহল্লায় নিজের ডেরা পেতেছিলো। সে সিদ্দি হানিফের অধীনস্থ, সুতরাং তার কথায় সায় দিয়ে চলাই তার কাজ। সিদ্দি হানিফ বিজাপুরের উজীর সর্দার খাঁ-মহম্মদের প্রিয়পাত্র। তাকে একটু তোয়াজ করে চললে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা আছে। তাই হানিফের কথার মর্ম সম্যক উপলব্ধি করতে না পারলেও চিন্তাকুল মুখ করে বললো, "সত্যি তো! কেন ?"

নিজের মনে বলে গেল সিদ্দি হানিফ, "আমি শুধু ভাবছি, এই বিজাপুর আক্রমণের পরিকল্পনা একটা ভাঁওতা কিনা। কোন দিশায় অভিযান করবেন শাহজাদা আওরংজেব, দক্ষিণে—না উত্তরে ?"

"সত্যিই, চিন্তার বিষয়।"

"যাই হোক, সে বিচার করবেন আমার মালিক—স্বয়ং উজীর সাহেব। আমার কাজ খবর পাঠিয়ে দেওয়া। আমি হয়তো দু-এক দিনের মধ্যেই—আরে!"

কথা বলতে বলতে সিদ্দি হানিফ তাকিয়ে দেখছিলো বাইরের পথচারীদের। হঠাৎ একজনের উপর চোখ পড়তে সে চমকে উঠেছে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মুখ ফিরিয়ে তাকালো ওয়াজিদ। দেখলো অল্প বয়েসী একজন যুবাপুরুষ পথের ওপার দিয়ে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। তার মুখ দেখতে পেলো না। সে এগিয়ে গেছে খানিকটা।

ইতিমধ্যে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়েছে সিদ্দি হানিফ। সে

ছুটে এগিয়ে গেল সেই যুবাপুরুষটিকে • অনুসরণ করে। কিন্তু তাকে ধরতে পারলো না। সে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চারদিকে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে সিদ্দি হানিফ ওয়াজিদের দোকানে ফিরে এলো।

ওয়াজিদ দেখলো সিদ্দি হানিফের বিস্ময়বিমূঢ় ভাব। জিজ্ঞেস করলো, "ব্যাপার কি ?"

তার দিকে তাকালো না সিদ্দি হানিফ। নিজের মনে বললো, "আশ্চর্য ব্যাপার! না কি, স্বপ্ন দেখছিলাম! এও বা কি করে সম্ভব ?"

"কেন, কি হয়েছে ?"

"না, কিছু না।" আস্তে আস্তে উত্তর দিলো সিদ্দি হানিফ, তারপর ওয়াজিদের দিকে ফিরে বললো, "শোনো, তুমি এবেলা দোকান বন্ধ করে কেল্লার দরওয়াজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও। বেরার থেকে অনেক তোপ-ই জিন্‌সি আসছে। মোট সংখ্যাটা আমাদের জানা দরকার।"

শহরকেন্দ্র পেছনে ফেলে ধীরগতি হাঁটতে হাঁটতে শহরতলির দিকে এগিয়ে চললো ইয়ার ওসমান বেগ্। তার চলনভঙ্গি শান্ত হলেও অত্যন্ত অস্থির ছিলো তার মন। ওরা আওরঙ্গাবাদে উপনীত হয়েছে মাত্র দুদিন আগে কিন্তু এরই মধ্যে সে হাঁফিয়ে উঠেছে। মন্থর নিষ্কর্মা জীবন তার অসহ্য। অথচ এখানে কিছু করবার নেই। সকালে বিকেলে এদিক সেদিক একটু পরিভ্রমন করা, আর মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর দিবানিদ্রা। আগ্রা থেকে দীর্ঘ পথ অতি দ্রুত বেগে আসতে হয়েছে, তার দরুণ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো সে, কিন্তু সেই ক্লান্তি প্রথম দিনের বিশ্রামেই অপসারিত হোলো। দ্বিতীয় দিন একঘেয়ে লেগেছে, তারপর দুঃসহ মনে হচ্ছে আজ সকাল থেকেই।

"আওরঙ্গাবাদে আমায় কি করতে হবে?" ওসমান জিজ্ঞেস করেছিলো ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌কে।

"আপাতত কিছু না। যতক্ষণ আমি তোমায় কিছু না বলছি, ততক্ষণ তুমি শুধু খাবে দাবে, নিদ্রা দেবে, আর বিশ্রাম করবে।"

এই ব্যবস্থা ওসমানের মনঃপুত হোলো না। কিন্তু কিছু বললো না ইসমাইল বেগ্‌কে। ইসমাইল বেগ্ স্বভাবতই একটু গম্ভীর, ইদানীং যেন আরো বেশী গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কপালে সব সময় গম্ভীর চিন্তার রেখা। তার এই গাম্ভীর্যের সামনে ওসমান সব সময় সন্ত্রস্তবোধ করতো। বেশী কথা বলবার সাহস হোতোনা। তাই ফতিমা বিবির কাছে গিয়ে অনুযোগ করেছিলো,—"এভাবে আমি বেশীদিন পারবো না।"

ফতিমা বিবি একটু হেসে ওসমানের মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, "বেটাজান, অতো অস্থির হোয়ো না। এখানে তোমায় অনেক কিছু করতে হবে। তোমার পিতাকে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে এখানে পাঠিয়েছেন শাহ-ই-আলিজা। তোমার সহায়তা ভিন্ন সেকাজ হবে না। সময় হলে তিনি তোমায় সবই জানাবেন।"

ইসমাইল বেগের হাবভাব এবার একটু বেশী রহস্যময় মনে হোলো। শহরতলিতে একটা ছোটো বাড়ির ব্যবস্থা আগের থেকেই করে রেখেছিলো দারার পক্ষভুক্ত লোকেরা। ইসমাইল বেগ্ ফতিমা বিবি আর ওসমানকে রাখলো সেখানে। নিজে থাকলো না। বললো,—তার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে অন্যত্র। কিন্তু জানালো না সেই ঠিকানা। সে শুধু সকাল সন্ধ্যে দুবেলা এসে তাদের খোঁজ খবর নিয়ে যাবে। একজন বুড়ো চাকর নিযুক্ত হোলো তাদের ফাই ফরমাশ খাটবার জন্যে।

আর কয়েকটি কড়া নির্দেশ দিলো ওসমানকে।—হাবভাব চালচলনে থাকতে হবে অতি সাধারণ আর দশজনের মতো, যাতে

কেউ তাদের সম্বন্ধে কোনোরকম ভাবে আগ্রহান্বিত না হয়, যাতে কারো চোখ না পড়ে বিশেষ ভাবে। বাড়ি থেকে যতোটা সম্ভব কম বেরোবে, সায়াহ্নের পূর্বেই ফিরে আসবে। কখনো হাতিয়ার নিয়ে বেরোবে না, কারো সঙ্গে কলহে লিপ্ত হবে না।

"যদি কেউ আমার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করে?"

"চুপ করে সহ্য করবে। নেহাত আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া নিজের শক্তি দেখাবার চেষ্টা করবে না। আর—" বলতে বলতে থেমে গেল ইসমাইল বেগ্।

"আর কি, আব্বাজান?"

"দেখ, আগ্রায় নিশ্চয়ই তোমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। স্ত্রীলোক থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকবে।"

"ওরে বাবা, নিশ্চয়ই। সেকথা আমায় আর স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না।"

এই দুদিন আওরঙ্গাবাদ শহর ঘুরে বেড়ালো ওসমান, নানারকম গুজব কেচ্ছাকাহিনী শুনলো বাজারে। আকিল খাঁর সঙ্গে শাহজাদার কন্যা জেব-উন-নিসার গোপন প্রেম, হিন্দু পরস্ত্রীর হীরাবাঈ জয়নাবাদীর সঙ্গে আওরংজেবের প্রণয়ের করুণ পরিণতি, কিছুই তার জানতে বাকী রইলো না। হীরাবাঈয়ের কাহিনী তার মনকে খুব স্পর্শ করেছিলো, অপরাহ্নে গিয়ে দেখে এলো পরলোকগতা হীরাবাঈয়ের রওজা।

বাদশাহ শাহ জাহান যে আওরংজেবকে বিজাপুর আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এ খবর সে আগ্রাতেই জানতে পেরেছিলো। সুতরাং আওরঙ্গাবাদের বাজারে এই সম্পর্কে গুজব শুনতে পেয়ে সে মোটেও চিন্তিত হোলো না। বরং শাহজাদার ফৌজের তৎপরতা দেখে তার যোদ্ধার মন উত্তেজনায় ভরে গেল। বছরখানেক সে বাদশাহ্‌র ফৌজের আহাদি হয়ে থাকলেও, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার বিশেষ কিছু নেই। তাই মনে

মনে আক্ষেপ হোলো যে যুদ্ধে যাওয়ার সুযোগ এখন পর্যন্ত তার জীবনে হোলো না।

এসব কথাই ভাবছিলো পথ চলতে চলতে। মনে হোলো, একবার ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌কে জিজ্ঞেস করে দেখা যায়, যদি ওসমানের সাহায্য তার পক্ষে একেবারে অপরিহার্য না হয়, তাহলে সে যোগ দিতে চায় শাহজাদার ফৌজে। যুদ্ধে না গেলে যোদ্ধার ভাগ্যপরিবর্তন কী করে সম্ভব ?

প্রশস্ত পথ একান্ত নির্জন, দুপাশে অভিজাত রাজপুরুষদের প্রাচীর ঘেরা উদ্যান পরিশোভিত মঞ্জিল। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নিজের মনে পথ চলছিলো ওসমান বেগ্‌, হঠাৎ কানে এলো অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। চোখ তুলে দেখলো সামনে পথের বাঁকে দেখা দিয়েছে তিনটি মন্থরগতি আরবী ঘোড়া। তিনজন সুদর্শন সশস্ত্র যোদ্ধা সওয়ার হয়ে আছে ঘোড়ার উপর। খুব হাসতে হাসতে উচ্চকণ্ঠে গল্প করতে করতে আসছে ওরা তিনজন। মুখের উপর একটা উদ্ধত ভাব, আত্মসচেতন পদমর্যাদার আভিজাত্য।

একজন কথা বলতে বলতে আঙুল দিয়ে উপর দিকে দেখালো। অন্য দুজন তাকালো মুখ তুলে। ওসমান সরে দাঁড়িয়েছিলো পথের একপাশে। সেও উপর দিকে তাকালো। পথের পাশে প্রাচীর থেকে কিছু দূরে একটি মঞ্জিলের পশ্চাদভাগ। সেখানে দ্বিতলের ঝরোকায় দাঁড়িয়ে আছে একটি শুভ্রবর্ণা তরুণী। মুখ কৃষ্ণবর্ণ নকাব্‌এ ঢাকা। সে হয়তো একটু আনমনা ছিলো। হঠাৎ সচকিত হয়ে সরে গেল।

যোদ্ধা তিনজন হেসে উঠলো। একজন হাত নাড়লো অন্তরালবর্তিনীর উদ্দেশে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার ঘোড়ার পা পিছলে গেল পথের ধারের শিশিরসিক্ত ঘাসের উপর। ঘোড়া ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে, আর সেই সওয়ার তার ক্ষণিক

অসাবধানতার দরুণ হাত নাড়তে নাড়তেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটির উপর।

তার সঙ্গীরা হেসে উঠলো,—আর হেসে উঠলো ওসমানও। এই কৌতুককর দৃশ্য দেখে হাসি সামলানো সম্ভব হোলো না তার পক্ষেও।

সেই সওয়ার উঠে দাঁড়ালো মাটির উপর, গায়ের ধুলো ঝাড়লো, তারপর তাকালো ওসমানের দিকে। তার ফর্সা অভিজাত মুখ রাগে রাঙা হয়ে আছে।

তার উদ্ধত অলাতদৃষ্টির সামনে ওসমান নিজের দৃষ্টি নামালো না, হাসি মুখে তাকিয়ে রইলো তার চোখে চোখ রেখে।

সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো ওসমানের কাছে, ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালো।

"তুমি কে হে বে-আদব্?"

ওসমান উত্তর দিলো হাসিমুখেই, "গাল দিচ্ছেন কেন, আমিতো কোনো বে-আদবি করিনি।"

"তোমার এত স্পর্ধা যে, আমার দিকে তাকিয়ে হাসছো?"

ইসমাইল বেগ্এর নির্দেশ মনে পড়লো ওসমানের,—কারো সঙ্গে কলহে লিপ্ত হবে না। সংযত কণ্ঠে উত্তর দিলো, "আপনার দিকে তাকিয়ে হাসবো ততো স্পর্ধা আমার নেই। আমি হেসেছি আপনার পড়ে যাওয়া দেখে। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে দুর্বলতা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই যে এরকম পতন হয়, আমি আগে কখনো দেখিনি।"

"পাজী, জানিস আমি কে? আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার সাহস!" সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত করতল ধাবিত হোলো ওসমানের গাল লক্ষ্য করে, ভারী চপেটাঘাতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু করতল ওসমানের মুখ স্পর্শ করলো না, হাওয়ায় এসে থামলো।

পলকে দু-পা পেছনে সরে গেছে ওসমান বেগ্, আর পেছনে

সরে যাওয়ার সময় চকিতে তলোয়ার টেনে নিয়েছে সেই সওয়ারেরই খাপ থেকে।

"সাফ শিকান খাঁ," ডাকলো আরেকজন সওয়ার, নিজের তলোয়ার বার করে ছুঁড়ে দিলো তার দিকে। সেটি ধরে ফেললো সাফ শিকান খাঁ, তারপর আক্রমণ করলো ওসমানকে।

কি করি এখন!—ওসমান ভাবলো,—ইসমাইল বেগ্ শুনলে তো ক্ষেপে যাবে। পালাতে হবে কোনোরকমে।

কিন্তু পালাবার পথ নেই। এ অবস্থায় পলায়ন করার মেজাজও তার নয়। তার ক্ষীপ্র অসিচালনা প্রতিহত করলো সাফ শিকান খাঁর উদ্যত আঘাত।

কিন্তু সাফ শিকান খাঁও অসিচালনায় অপটু নয়। অপূর্ব কৌশলের সঙ্গে আবার অসিচালনা করলো। সঙ্গে সঙ্গে বাম বাহুর উপরিভাগে একটা যন্ত্রণা অনুভব করলো ওসমান। দেখলো, শুধু আত্মরক্ষার যুদ্ধ আর সম্ভব নয়। কৌশল দেখাতে হবে তাকেও।

হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো সাফ শিকান খাঁর সামনে। তারপরই একটা প্রচণ্ড আঘাতে তার হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ে গেল।

"তলোয়ার তুলে নিন্," এক পা পেছনে সরে গিয়ে ওসমান বললো।

সাফ শিকান খাঁ এগিয়ে গেল তার ভূতল লুণ্ঠিত তরবারির দিকে, কিন্তু তার একজন সঙ্গী বলে উঠলো, "না।"

সে নেমে এলো ঘোড়ার উপর থেকে। তার মুখে একটুখানি হাসি। সে এগিয়ে এলো ওসমানের কাছে। বললো, "সাফ শিকান খাঁর হাত থেকে যে তলোয়ার বিচ্যুত করতে পারে, সে বাহাদুর বটে। আপনি কে?"

"আমি সামান্য লোক। আমার নাম ইয়ার ওসমান বেগ্।"

"আমার নাম আকিল খাঁ।"

আকিল খাঁ! শাহজাদার জিলওদার আকিল খাঁ? কবি আকিল খাঁ রাজি? ওসমান বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালো। সর্বনাশ, কাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে সে?

ইতিমধ্যে অন্যজনও নেমে এসেছে তার ঘোড়া থেকে। বললো, "আর আমি শেখ মির। শাহজাদার একজন দীন মনসবদার।"

"আপনার অসিচালনায় কৌশল দেখে আমি ভেবেছিলাম আপনি ফৌজের লোক," বললো আকিল খাঁ।

"না। এ শুধু শখ করে শিখেছি। আমি—আমি সাধারণ সওদাগর। পথে চোর ডাকাতের ভয়, তাই প্রয়োজন হয় মাঝে মাঝে।"

সাফ শিকান খাঁও কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো। তাকে সসম্ভ্রমে তরবারি ফিরিয়ে দিলো ওসমান বেগ্। বললো, "আমায় মার্জনা করবেন। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আপনারা শাহী ফৌজের মনসবদার জানলে এরকম স্পর্ধা প্রকাশ করতাম না।"

"না, না, স্পর্ধা কিসের," আকিল খাঁ হাসতে হাসতে বললো, "এরকম এক এক সময় হয়ে যায়। তলোয়ার ছাড়া যোদ্ধার আর কোনো পরিচয় আছে নাকি? বরং আপনাকে সামান্য লোক ভেবে আমরাই অপরাধ করেছি।"

"আমাদের কেল্লায় উপস্থিত হওয়ায় সময় হয়ে গেছে, আকিল খাঁ," সাফ শিকান খাঁ বললো।

"কেল্লায় এসে যদি একদিন এই গরীবের আতিথ্য গ্রহণ করেন খুব আনন্দিত হবো।"

"নিশ্চয়ই আসবো," বললো ওসমান, "আপনার মুখে দিওয়ান শোনবার সৌভাগ্য আমার হবে বলে আশা করি।"

অশ্বে আরোহন করে নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে ধাবিত হোলো আকিল খাঁ, শেখ মির আর সাফ শিকান খাঁ। এত অল্পের উপর দিয়ে গণ্ডগোলটা মিটে গেল বলে নিজের নসীবকে তারিফ করতে

করতে পথ ধরে এগিয়ে চললো ওসমান বেগ্। কয়েক কদম এগিয়ে পথের বাঁক। বাঁক ফিরতেই দেখলো মঞ্জিলের প্রাচীরের গায়ে একটি ছোটো দরজা খুলে গেল। পরিচারিকা শ্রেণীর এক নারী মুখ বাড়িয়ে তাকে ডেকে বললো, "আপনি ভেতরে আসুন।"

"ভেতরে ?"

"হ্যাঁ, বিবিজান আপনাকে ডাকছেন।"

"বিবিজান!" বিস্মিত হোলো ওসমান। তারপর হঠাৎ খেয়াল হোলো। বিবিজান ? আরেকজন অপরিচিতা নারী ? না, অনেক শিক্ষা হয়েছে তার, আর দরকার নেই। বললো, "তোমার বিবিজানকে বোলো আমায় মার্জনা করতে। আমার ভেতরে আসবার ফুরসত নেই।"

পরিচারিকার পেছনে দেখা গেল আরেকটি মুখ। সেই কালো নকাব্‌এ ঢাকা মুখ, যাকে ক্ষণিকের জন্যে দেখা গিয়েছিলো দ্বিতলের ঝরোকায়। তার আয়ত নয়ন হাসিতে ঝিলমিল করছে। মধুর গাম্ভীর্যে সে ডাকলো, "ভেতরে আসুন। আপনার বাম বাহুর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নির্গত হচ্ছে। এ অবস্থায় চলে যাবেন না।"

এতক্ষণে হুঁশ হোলো ওসমানের। হ্যাঁ, জামার আস্তিন রক্তে অল্প অল্প ভিজে আছে বটে। কিন্তু আঘাতটা সামান্য। তাই বললো, বিশেষ কিছু হয় নি। বাড়ি ফিরে ঔষধ প্রয়োগ করলে ঠিক হয়ে যাবে—।"

"ভেতরে আসুন," এবার আদেশের সুরে বললো সেই অপরিচিতা যুবতী।

আর দ্বিরুক্তি না করে চুপচাপ বাগিচার ভিতরে প্রবেশ করলো ওসমান বেগ্। পরিচারিকা দরজা বন্ধ করে দিলো।

আঘাতটা সামান্যই। শুধু তরবারির অগ্রভাগের একটুখানি খোঁচা লেগেছে মাত্র। অল্প একটুখানি কেটে গেছে। ফোয়ারা থেকে জল নিয়ে রক্ত পুঁছে দিলো সেই মেয়েটি। তারপর

নিজের গোলাপী দোপাট্টা ছিঁড়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিতে দিতে বললো, "সাফ শিকান খাঁর মোকাবিলা যে করতে পারে সে বাহাদুর লোক। কিন্তু এখানে আসতে আপনি ভয় পাচ্ছিলেন কেন ?"

"আপনি খানদানী ঘরের কন্যা। পর্দার মধ্যে আমার প্রবেশ করাটা খুব গর্হিত হবে মনে করলাম—।"

"আপনি আহত। তাই আপনার একটুখানি পরিচর্যা করা আমার কর্তব্য মনে করলাম। তা নইলে তো অপরিচিত পুরুষের সামনে উপস্থিত হওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হোতো না।"

সে অসঙ্কোচে বেঁধে দিচ্ছিলো তার ক্ষতস্থান। ওসমানের মনে হোলো এরকম স্নেহস্পর্শ সে শুধু ফতিমা বিবির কাছেই পেয়েছে। অপরিচিতার করস্পর্শে কোনো অস্বাভাবিক অনুভূতি জাগলো না তার মনের মধ্যে। বরং একটু যেন স্নেহাতুর বোধ করলো।

"আপনার পরিচয় জানতে চাওয়া কি আমার পক্ষে অপরাধ হবে ?" জিজ্ঞেস করলো ওসমান বেগ্।

ক্ষতস্থান বাঁধা হয়ে গেছে। এবার যেন সেই অপরিচিতার কর্ণমূল আরক্ত হোলো। এক পা পেছনে সরে গেল সে, কিন্তু সহজ ভাবে বললো, "আমার নাম আরজুমান-আরা। আমার পিতা সর্দার ইকবাল খাঁ শাহজাদার দরবারে বিজাপুরের উকিল।"

শরবত নিয়ে এলো আর্‌জুমান-আরার পরিচারিকা।

"আপনি কি শাহজাদার ফৌজের লোক," জিজ্ঞেস করলো আরজুমান-আরা।

"না, আমি একজন সামান্য মুসাফির," উত্তর দিলো ওসমান, "আমি ভাগ্য অন্বেষণে এই শহরে এসেছি। আমার নাম ইয়ার ওসমান বেগ্।"

দৃষ্টি অবনত করলো আরজুমান-আরা, মৃদুকণ্ঠে বললো, "আপনার মতো বীর পুরুষের উন্নতি কেউ রুখতে পারবে না, একথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।"

জীবনে প্রথম এক নারীর মুখে তার পৌরুষের প্রতি আস্থাসূচক বাণী শুনলো ওসমান। তার মনে এলো একটা অভূতপূর্ব উদ্দীপনা। যে নারী আন্তরিকতার সঙ্গে শোনায় আশা ও আশ্বাসের বাণী, তার পায়ে যে নিবেদন করে দেওয়া যায় সমস্ত ভবিষ্যত, জীবনের সমস্ত সাফল্য! অনেক কথা এক সঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইলো ওসমানের মনের ভিতর থেকে, কিন্তু সবই এসে আটকে গেল গলার কাছে। সারা মুখ ঘেমে উঠলো। চুপচাপ পান করলো সুমিষ্ট শরবত।

"আপনাকে আর আটকাবো না," আস্তে আস্তে বললো আরজুমান-আরা, "আপনার হয়তো দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

মঞ্জিলের এদিকে যখন এই ঘটনাগুলো ঘটে গেল, তখন অন্য প্রান্তে এক রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে তিনজন লোকের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় নিমগ্ন ছিলো আওরঙ্গাবাদে নিযুক্ত বিজাপুর দরবারের উকিল বা রাজদূত সর্দার ইকবাল খাঁ। চারজনেরই মুখমণ্ডল গম্ভীর, প্রত্যেকের ভ্রূযুগল গভীর চিন্তায় কুঞ্চিত। অন্য তিনজনকেও দেখে বোঝা যায়, ওরা সম্ভ্রান্ত বংশীয়, পদমর্যাদায় সর্দার ইকবাল খাঁর সমকক্ষ। দুজনের পরিচ্ছদ মুসলমানের, অন্যজনও এদের মতো কাবা চুড়িদার পাজামা পরিহিত হলেও, তার কাবার বন্ধনি মুসলমানী রীতি অনুযায়ী ডান দিকে নয়, হিন্দুদের মতো বাঁ দিকে। কমরবন্দ্‌ও মুসলমানদের মতো বহুবর্ণরঞ্জিত নয়, হিন্দুদের মতো শ্বেতবর্ণ। সে শ্যামবর্ণ, ঈষৎ খর্বাকৃতি। অন্য দুজনের আকৃতি দীর্ঘ, অত্যন্ত ফর্সা তাদের গায়ের রং।

"এই হোলো পরিস্থিতি," বলছিলো সর্দার ইকবাল খাঁ, "আমি বৎসরাধিক কাল থেকে আমাদের উজীর খাঁ মহম্মদকে জানিয়ে আসছি, শাহজাদা আওরংজেব কোনো শর্ত মানবেন না, উনি বিজাপুরের স্বাধীনতা হরণ করবার জন্যে কৃতসংকল্প। এ পর্যন্ত যত

আলাপ আলোচনা আপোস মীমাংসার কথাবার্তা হয়েছে সবই হাতে সময় পাওয়ার ছল মাত্র। এখন দেখতেই পারছেন, আগ্রা থেকে বাদশাহ শাহজাহান বিজাপুর অভিযান মঞ্জুর করেছেন। সর্দার শর্জা খাঁ, আপনাদের সফর যে ব্যর্থ হবে সে আমার জানা ছিলো।"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো সর্দার শর্জা খাঁ। সে বিজাপুর দরবারের একজন বিশিষ্ট সর্দার, বিজাপুরী সেনাবাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক। তাকে আর তার সঙ্গী দুজনকে বিজাপুরের রাজমাতা বড়ী সাহিবা ও উজীর খাঁমহম্মদ আওরঙ্গাবাদে পাঠিয়েছিলো আওরংজেবের সঙ্গে একটা আপোস-মীমাংসা করবার শেষ চেষ্টা করতে। সেই আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। প্রকাশ্য দরবারে শাহজাদা আওরংজেব তাদের সঙ্গে কোনো পরিষ্কার আলোচনাই করতে চায়নি, শুধু অসম্মানজনক ভাষায় বিজাপুরী শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করে ভৎসনা করেছে। এবং পরে মনসবদার মির খলিলের মারফতে যে সব শর্ত জানিয়েছে, কোনো স্বাধীন রাজ্যের প্রতিনিধি সে-সবে রাজী হতে পারে না।

"আওরংজেবের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট," সর্দার শর্জা খাঁ উত্তর দিলো, "সে আস্তে আস্তে প্রস্তুত হচ্ছে হিন্দুস্তানের তখ্ত্এর জন্যে অন্য শাহজাদাদের, বিশেষ করে শাহজাদা দারা শিকোর মোকাবিলা করতে। সে উত্তর দিকে দৃষ্টি ফেরানোর আগে দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে একটা ফয়সালা করে নিতে চায়, যাতে তার অধিকৃত এলাকার পেছন দিকে কোনো প্রবল বৈরী না থাকে। এজন্যেই সে দখল করতে চায় বিজাপুর।"

"আর সেই সঙ্গে চায় বিজাপুরের অর্থ সম্পদ, যুদ্ধের রসদ, অস্ত্র-শস্ত্র," বললো শর্জা খাঁর সঙ্গী মুল্লা রহমান। সেও বিজাপুরের একজন বিশিষ্ট উমরাহ, রাজধানীর প্রভাবশালী নবাইয়ৎ গোষ্ঠির আরবী মুল্লাদের অন্যতম নেতা। ইকবাল খাঁর দিকে তাকিয়ে বলে গেল,

"যাই হোক, শাহজাদা যদি যুদ্ধই চায়, যুদ্ধ হবে। প্রাণ দেবো কিন্তু স্বাধীনতা লুপ্ত হতে দেবো না।"

"আপনি যা বলেছেন, মুল্লা রহমান, সেটা যথার্থ," উত্তর দিলো ইকবাল খাঁ, "কিন্তু বড়ী সাহিবা, আর উজীর খাঁ-মহম্মদ এখনো দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আছেন। বড়ী সাহিবার উপর ওঁর ভগ্নীপতি সর্দার আফজল খাঁর অত্যন্ত প্রভাব। আফজল খাঁ আওরংজেবকে প্রবল শত্রু বলে গণ্য করে না। সে বিজাপুর দরবারের বিচার বিবেচনা ভ্রান্তপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে সব সময়। তার বক্তব্য আমাদের প্রধান শত্রু আমাদের স্বর্গীয় সুলতানের অতি বিশ্বাস-ভাজন শাহজীর পুত্র, এবং এখানে উপস্থিত আমাদের বন্ধু ব্যাঙ্কজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শিবাজী।"

সবাই মুখ ফিরিয়ে ব্যাঙ্কজীর দিকে তাকালো। সে আস্তে অ স্ত বললো,—"শিবা আমার ভ্রাতা, কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে তার বর্তমান দস্যুবৃত্তির সমর্থন আমি করিনা। বিজাপুর সরকার আমাদের অন্নদাতা, আমাদের তলোয়ার বিজাপুরের খিদমতে সর্বদাই উদ্যত। বিজাপুর সম্পর্কে শিবার নীতিকে আমি অবিশ্বস্ততা বলে গণ্য করি। কিন্তু শিবার সম্বন্ধে আমি এ বলতে পারি, সে আওরংজেবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কোনোদিন নয়।"

"কিন্তু সে শাহজাদা আওরংজেবের কাছ থেকে সাহায্যের আশ্বাস চেয়েছে," বলে উঠলো মুল্লা রহমান।

"তার জন্যে দায়ী সর্দার আফজল খাঁ," শর্জা খাঁ উত্তর দিলো, "আমার মনে হয় শিবাজীর সঙ্গে একটা আপোস করে নেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না।"

"কিন্তু সেটা অসম্ভব," বললো ইকবাল খাঁ, "আফজল খাঁ সেটা হতে দেবে না।"

"সব জটিলতা তো সেখানে," শোনা গেল ব্যাঙ্কজীর মুখ থেকে,

"শাহজাদা আওরংজেব নানা ভাবে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন রাজ্যের সর্দারদের মধ্যে। অনেকে নাকি উৎকোচও গ্রহণ করে শাহজাদার কাছ থেকে।"

সর্দার ইকবাল খাঁ চুপচাপ পদচারণা করলো দুতিনবার। তারপর ওদের দিকে ফিরে বললো, "সর্দার শর্জা খাঁ, মুল্লা রহমান, ব্যাঙ্কজী! আজ খুব বিশেষ প্রয়োজনে এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবার জন্যে আপনাদের এখানে আমন্ত্রণ করেছি। বর্তমানে পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে হোলো এই——শাহজাদা আওরংজেব বিজাপুর আক্রমণ করবেই। এই যুদ্ধে সাফল্য লাভ করলে,— যার অর্থ হোলো আমাদের স্বাধীনতার বিলুপ্তি——সে দৃষ্টি ফেরাবে উত্তর দিকে। শাহজাদা দারা শিকোকে সে বাদশাহ হতে দেবে না। আওরংজেবের মোকাবিলা করবার সামর্থ্য আমাদের আছে। আমাদের সেনাবাহিনী সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত। আমাদের সেনানায়কেরা সুদক্ষ। অনির্দিষ্টকালের জন্যে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আমরা সক্ষম, কারণ আমাদের রাজকোষে সঞ্চিত আছে প্রচুর স্বর্ণ। কিন্তু আমাদের দুর্বলতা কোথায়? আমাদের দুর্বলতা আমাদের একতার অভাব, আমাদের পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ, ক্ষুদ্র স্বার্থের কলহ বিবাদ। আমাদের সুলতান আলি আদিল শাহ আমাদের নেতৃত্ব করতে অক্ষম, তিনি অতি অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ, দুর্বল চরিত্র, রূঢ় ভাষী। তাঁর সাহস নেই, শক্তি নেই, রণনীতি কি রাজনীতি কোনো বিষয়ে জ্ঞান নেই। তিনি বড়ী সাহিবা ও খাঁ-মহম্মদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তার উপর তাঁর নৃশংস খামখেয়ালীর জন্যে সর্বসাধারণের অপ্রিয়। —এখন আপনারা বলুন এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচবার উপায় কি? মুল্লা রহমানের মতো দুচার পাঁচজন যুদ্ধে প্রাণ দিলেই তো আর স্বাধীনতা বাঁচবে না।"

"একজন যথার্থ নেতা চাই," আস্তে আস্তে উত্তর দিলো মুল্লা রহমান।

"কোথায় পাবো তেমন নেতা," বলে উঠলো ব্যাঙ্কজী, "কার নেতৃত্ব সর্ববাদীসম্মতরূপে স্বীকৃত হবে? বিজাপুরের আফগান, সিদ্দি, মুল্লা এবং মাহ্দবী সৈয়দ—এই চারটি প্রধান দলের পারস্পরিক শত্রুতার কথা কে না জানে? স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ সবাইকে সামলে রাখতে পারতেন। আর তো কেউ পারে না।"

চুপ করে এদের কথা শুনছিলো ইকবাল খাঁ। ব্যাঙ্কজী থামতে বললো, "আরো একটা দিক বিবেচনা করার আছে। শাহজাদা আওরংজেবের স্বার্থ আমাদের সর্বনাশে। শাহ-ই-আলিজা দারা শিকোর স্বার্থ আমাদের শক্তিবৃদ্ধিতে। দারা বহু বৎসর ধরে বিজাপুরের হয়ে বাদশাহ্কে বলতেন বলে এ পর্যন্ত আওরংজেব আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। দারা সম্প্রতি ব্যর্থ হয়েছেন বটে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমাদের সহায়তা করতে সক্ষম হতে পারেন। সুতরাং দারাই যদি হিন্দুস্তানের বাদশাহ হন্, তাহলে আমাদেরই মঙ্গল! অতএব দারার সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র আরো দৃঢ় করা প্রয়োজন। আওরংজেব যেমন বিজাপুরী সর্দারদের অন্তর্বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করবার চেষ্টা করছেন, আমরাই বা মোগল শাহজাদাদের অন্তর্বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করবার চেষ্টা করবো না কেন?"

"একথা বড়ী সাহিবা কি উজীর খাঁ-মহম্মদকে বোঝাবে কে?" জিজ্ঞেস করলো মুল্লা রহমান।

"আগ্রায় আমাদের যে উকীল আছে, সে একেবারে অপদার্থ," বললো সর্দার শর্জা খাঁ, "সে আফজল খাঁর লোক। শুনছি নাকি নিয়মিত উৎকোচ পায় রোশন-আরা বেগম সাহিবার কাছ থেকে। তারই জন্যে শাহজাদা দারার সঙ্গে বিজাপুর দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা শক্ত হয়ে উঠেছে।"

ইকবাল খাঁ প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালো। তারপর

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো, "শাহ-ই-আলিজা দারা শিকোর নিজস্ব প্রতিনিধি গোপনে আওরঙ্গাবাদে এসে উপনীত
সঙ্গে মিলিত হবার জন্যেই আমি আপনাদের এখানে আমন্ত্রিত করেছি।"

"কোথায় সে ?" ব্যগ্রকণ্ঠে তিনজনে জিজ্ঞেস করলো।

"এখানেই আছে। অধৈর্য হবেন না। অবিলম্বে সে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবে।"

সবাই স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করলো কিছুক্ষণ। তারপর মুল্লা রহমান আস্তে আস্তে বললো, "কিন্তু আমরা কি করতে পারি ? বড়ী সাহিবা কি খাঁ-মহম্মদ তো আমাদের কথায় কান দেবেন না।"

"কান দিলেও, আওরংজেবের বশীভূত অন্যান্য সর্দারদের প্রতিবন্ধকতার জন্য কি কিছু করতে পারবেন ?" জিজ্ঞেস করলো ব্যাঙ্কজী, "কে যে গোপনে আওরংজেবকে সব খবর দিয়ে দেবে তার ঠিক নেই। আমাদের কোনো খবরইতো আওরঙ্গাবাদের জানতে বাকী থাকে না।"

"যদি বিজাপুরের সুলতান নিজের হাতে সব কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ?" নিচু গলায় বললো ইকবাল খাঁ।

"সুলতান ? আমাদের আলি আদিল শাহ ! সেই অপদার্থ, মেরুদণ্ডবিহীন অর্বাচীন ভীরু কাপুরুষ ! আজো যে জননীর দুপাট্টার অন্তরাল থেকে সরে আসতে পারেনি, সেই মেষশাবক নেবে সব কিছুর দায়িত্ব ? নিজের হাতে ? হাঃ হাঃ হাঃ।" অট্ট-হাসিতে ফেটে পড়লো শর্জা খাঁ।

খুব ধীর গম্ভীর কণ্ঠে ইকবাল খাঁ উত্তর দিলো, "আমি আলি আদিল শাহ্‌র কথা বলছি না। আমি বলছি আমাদের স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র আসল সন্তানের কথা।"

"কি !"

সবাই সবিস্ময়ে তাকালো ইকবাল খাঁর দিকে। এরকম একটা

কথা,—সেটা আঠারো বছর ধরে লোকের মুখে মুখে শোনা যায় মাঝে মাঝে এবং ইদানীং সর্বজনবিদিত হয়ে গেছে আওরংজেবের প্রচারবিদ্ গুপ্তচরদের কল্যাণে,—সে কথা যে এদের তিনজনের অজানা ছিলো তা নয়। রাজ্যের একদল সর্দারের সুলতানের বিরুদ্ধাচারণের একটা পরোক্ষ যুক্তিও ছিলো এই গুজব,—ওরা বিশ্বাস করুক বা নাই করুক এই ছুতো কাজে লাগাতে পশ্চাদপদ্ ছিলো না মোটেও। রাজ্যের বিশ্বস্ত সর্দারেরা মুখে অস্বীকার করলেও মনে মনে নিঃসংশয় হতে পারতো না। সত্যিই তো,—কেন নিহত হয়েছিলো রাজ্যের হাকিম-ই-আলা এবং তিনজন ধাত্রী সেই আঠারো বছর আগে? কেন নিখোঁজ হয়ে গেল সর্দার হামিদ খাঁ? কোথায় গেল সেই আয়েশাবানু, যে ছিলো মহম্মদ আদিল শাহ্‌র পরস্তার শামস্-উন্-নিসার খাদিমান। সেই পরস্-তারের যে সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছিলো, তাকে শামস্-উন্-নিসার সঙ্গে গোর দেওয়া হয়নি কেন?—এসব প্রশ্ন সবারই মনে আছে। এসব প্রশ্নের সঙ্গে যে একটা রহস্য জড়িয়ে আছে সে বিষয়ে সবাই একমত।—অবশ্যি, সবাই বিজাপুরের বিশ্বস্ত নাগরিক। সুলতান আলি আদিল শাহ আনুষ্ঠানিক ভাবে তখ্‌তএ আরোহণ করেছে। মুখে কেউ সুলতানের প্রতি কোনো অসম্মান দেখাবে না। আওরংজেব যে বলে বেড়ায়, আলি মহম্মদ আদিল শাহ্‌র সন্তান নয়, তার পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত, এতে সবাই অসন্তুষ্টই হয় আওরংজেবের উপর। কারণ একথা শুনলে দেশভক্ত বিজাপুরীদের আত্মসম্মানে বাধে। স্বর্গীয় সুলতান এবং বড়ী বেগম সাহিবা যখন বলেন আলি তাঁদেরই সন্তান, তখন আওরংজেব তার জন্মের বৈধতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবার কে!

"মহম্মদ আদিল শাহ্‌র আসল সন্তান?" বলে উঠলো মুল্লা রহমান, "মানে? আপনি আলিকে ওঁদের সন্তান বলে স্বীকার করেন না?"

"আলির সম্বন্ধে এত প্রশ্ন আছে, সব প্রশ্নের সদুত্তর কি আপনারা পেয়েছেন ?"

"নাই বা পেলাম, তাতে কি এই প্রমাণ হয় যে, আলি মহম্মদ আদিল শাহ্‌র সন্তান নয় ?"

"যদি স্বর্গীয় সুলতানের আসল সন্তানকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা যায় ?"

"কি অসম্ভব কথা বলছেন ইকবাল খাঁ ! প্রমাণ কি ? একজন কাউকে এনে উপস্থিত করলেই কি তাকে আমরা স্বর্গীয় সুলতানের পুত্র বলে গ্রহণ করবো ?"

ইকবাল খাঁ প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তারপর বললো, "হামিদ খাঁকে মনে আছে ? শর্জা খাঁ, সে তো আপনার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলো।"

"হামিদ খাঁ ? কোথায় সে ? একমাত্র সেই কিনারা করতে পারে এই রহস্যের। আপনি কি তার কোনো সন্ধান পেয়েছেন ?"

ইকবাল খাঁ একটু হাসলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তাকালো একে একে তিনজনের প্রত্যেকের মুখের দিকে, তারপর হঠাৎ কয়েক পা পিছু হটে গিয়ে কক্ষপ্রান্তের একটি রুদ্ধদ্বার টেনে উন্মোচন করে বলে উঠলো, "সর্দার হামিদ খাঁ, তশরীফ আনুন। সবাই আপনার প্রতীক্ষা করছে।"

ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলো একজন।

ব্যাঙ্কজী তাকে কোনোদিন দেখেনি। সে যখন নিরুদ্দেশ হয়, তখন তার বয়স খুব কম। মুল্লা রহমানের সঙ্গেও তার পরিচয় ছিলো না। কারণ সেও সে সময় ছিলো কিশোর বয়স্ক। কিন্তু শর্জা খাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলো সে।

সবাই তাকিয়ে রইলো দীর্ঘাকৃতি ঋজু দেহ প্রৌঢ় আগন্তুকের দিকে। তারপর শর্জা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

"হামিদ খাঁ, হামিদ খাঁ, তুমি কোথায় ছিলে এত বছর? কেন তুমি আত্মগোপন করেছিলে?"

ইকবাল খাঁ আস্তে আস্তে বললো,—"এবং এঁর আরেকটি পরিচয় আছে। ইনিই আলিজা দারা শিকোর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ইয়ার ইসমাইল বেগ্। এঁকে আমরা উপস্থিত এ নামেই জানবো।

॥ ছয় ॥

সেদিনই সন্ধ্যাকালে শাহজাদা আওরংজেবের মহলের অভ্যন্তরে নিজের প্রকোষ্ঠে অত্যন্ত চিন্তাকুল মনে একলা বসেছিলো আওরংজেবের দ্বিতীয়া কন্যা চতুর্দশবর্ষীয়া জিনত-উন-নিসা। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী জেব-উন-নিসার ব্যক্তিত্ব তার চেহারার মধ্যে ছিলো না, কিন্তু যৌবনসন্ধিতে উপনীত হওয়ার দরুণ তার রূপলাবণ্য শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার মতো কলায় কলায় বিকশিত হয়ে উঠেছিলো। বার বার সে মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছিলো প্রবেশপথের বাইরের প্রশস্ত অলিন্দের দিকে, অধীর হয়ে উঠছিলো কারো যেন আগমনের প্রত্যাশায়।

কিছুক্ষণ পরে মৃদু পদশব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো জিনত্-উন-নিসা। এগিয়ে যাচ্ছিলো বাইরের দিকে। কিন্তু তার আগেই কক্ষে প্রবেশ করলো এক উনবিংশবর্ষীয়া যুবতী।

"জেব-উন-নিসা!" ছুটে এগিয়ে গেল জিনত-উন-নিসা।

তার মতো চঞ্চল নয় জেব-উন-নিসা। সে অনেক শান্ত, অনেক গম্ভীর। আজ কিন্তু তার চোখ দুটি অত্যন্ত বিষণ্ন।

"দেখা হোলো?" জিজ্ঞেস করলো জিনত-উন-নিসা।

"হ্যাঁ," জেব-উন-নিসা একটু হাসলো, তারপর কনিষ্ঠা ভগ্নীর হাত ধরে ঘরের ভিতর এগিয়ে গেল। দুজনে বসে পড়লো গালিচার উপর।

দুই বোনের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো এই এক বছরের মধ্যে। জেব-উন-নিসা মোগল শাহজাদার কন্যা, কিন্তু এত বড় মহলে সে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। তার জননী দিলরসবানু বেগমের সঙ্গে সদ্ভাব কোনোদিনও ছিলোনা। পিতা আওরংজেবের প্রিয়পাত্রী

হলেও, মহলের আদবকায়দা অনুযায়ী একটা দূরত্ব বজায় রাখতে হোতো। মহলে ইদানীং তার একমাত্র সঙ্গী ছিলো জিনত-উন-নিসা। স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির হলেও নিজের কোনো কথাই গোপন করতো না ছোটো বোনের কাছে।

আওরংজেবের জিলওদার আকিল খাঁর সঙ্গে তার গোপন প্রণয় চলছে বেশ কিছুদিন থেকেই। আওরঙ্গাবাদে আসবার আগে বুরহানপুরেই তাদের প্রেম পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছিলো। সেখানেই ব্যাপারটা আওরংজেবের গোচরে আসে এবং তার জন্যে আকিল খাঁকে আওরংজেব কিছুদিন নজরবন্দী করে রেখেছিলো। কিন্তু আকিল খাঁ গুণী লোক, শাহজাদার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলে আওরঙ্গাবাদে এসে তাকে মার্জনা করে মুক্তি দিয়ে স্বপদে পুনর্বহাল করেছিলো আওরংজেব, তবে কড়া নজর রেখেছিলো জেব-উন-নিসা এবং আকিল খাঁ উভয়ের উপর, যাতে ওরা গোপনে দেখা করতে না পারে। মাঝখানে অনেক মাস দেখা হয় নি, শুধু কখনো কখনো সুযোগ মতো পত্র বিনিময় হতো। পত্রবিনিময়ের সুযোগ না হলে নতুন দিওয়ান রচনা করতো "রাজি" ছদ্মনামে, সেই দিওয়ান বাজার থেকে আনিয়ে নিতো জেব-উন-নিসা। তারপর "মখফি" ছদ্মনামে দিওয়ান রচনা করতো জেব-উন-নিসা, সেই দিওয়ান কোনো না কোনো রকমে পাঠিয়ে দিতো আকিল খাঁর কাছে। এইভাবে ওদের ভাব বিনিময় চলতো কবিতার মাধ্যমে।

মাসখানেক ধরে আওরংজেব বিজাপুর আক্রমণের আয়োজন নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। সুতরাং আকিল খাঁর উপর নজর রাখবার ফুরসত ছিলো না। এই সুযোগে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাকালে মহলের প্রাচীরের বাইরে খোলামাঠের ওদিকে অশ্বারোহনে সফর করতে আসতো আকিল খাঁ। মহলের ত্রিতলের এক প্রান্তে এক ঝরোকা থেকে দেখা যেতো সেদিকটা। সেখানে এসে দাঁড়াতো

জেব-উন-নিসা। আকিল খাঁ তাকে দেখতে পেতো না, কিন্তু জানতে পারতো যে সে সেখানে আছে। তারপর একটি পায়রা উড়িয়ে দিতো জেব-উন-নিসা। সে এসে বসতো আকিল খাঁর উদ্যত হাতের উপর। একটি পত্র বাঁধা থাকতো কবুতরের পায়ে। সেটি খুলে পড়তো, তারপর পত্রের উত্তর নিয়ে জেব-উন-নিসার কাছে ফিরে যেতো সেই সুশিক্ষিত কবুতর। যতক্ষণ আলো থাকতো, জেব-উন-নিসা তাকিয়ে থাকতো অনেক নিচে আকিল খাঁর দিকে, ঝরোকার দিকে তাকিয়ে থাকতো আকিল খাঁ। তারপর যখন অন্ধকার ঘন হয়ে আসতো, হাতের রেশমী রুমালি নেড়ে ফিরে চলে যেতো। বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজের মহলে ফিরে আসতো জেব-উন-নিসা।

"শুধু এরকম ইশ্‌ক্‌-বাজি করে আর কদ্দিন চলবে?" জিনত-উন-নিসা জিজ্ঞেস করলো, "ধরা পড়লে ওঁর বিপদ হবে।"

ওর কথা শুনে চুপ করে রইলো জেব-উন-নিসা। তারপর বসনের অভ্যন্তর থেকে একটি পত্র বার করে দিলো জিনত-উন-নিসার হাতে। ব্যগ্রতার সঙ্গে সেটি পাঠ করলো সে। পড়ে বললো. "বাঃ, কী সুন্দর কবিতা! আমার আশিক কবুতর পাঠায় আমার কাছে, কিন্তু তার বয়ে নিয়ে আসা চিঠির চাইতে আমার অনেক বেশী প্রিয় সেই কবুতরের তপ্ত কোমল শিহর-স্পর্শ, কারণ আমার মাশুকের হাতের পরশ লেগে আছে তার গায়ে। আমি কবুতর হলে সুখী হতাম, কিন্তু তখন তুমি হয়তো হতে আকাশের চাঁদ। আকাশপথে যতো উর্ধ্বেই উড়ে যাইনা কেন, কখনো কি পৌঁছতাম তোমার কাছে?—আহা—হা, তোমার কী কিসমত জেব-উন-নিসা, তোমার জন্যে এমন কবিতাও একজন লেখে! তুমি আমি আর সে একদিন মরে যাবো, কিন্তু রাজির এই কবিতা চিরকাল বেঁচে থাকবে।"

"হয়তো শিগগিরই আবার ছাড়াছাড়ি হবে আমাদের মধ্যে," দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বসলো জেব-উন-নিসা।

"কেন ?"

"পিতার সঙ্গে যুদ্ধে যাবে আমার 'রাজি'।"

"বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ কি শেষ পর্যন্ত হবেই ?"

"না হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। খুদ উজীর মির জুমলা ফৌজ নিয়ে আসছেন আগ্রা থেকে।"

"মা তো এযুদ্ধের পক্ষপাতী নন—।"

"হ্যাঁ, ওঁর তো ইচ্ছে সুলতান আলি আদিল শাহ্‌র সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়া। কিন্তু পিতার তো তাতে ভয়ংকর আপত্তি। গোপন সংবাদ এসেছে যে শাহ্-ই-আলিজা আমাদের ভগ্নী পাক-নিহাদ-বানুর সঙ্গে সুলতানের বিয়ে দেওয়ার কথা তুলেছেন আলা হজরত শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ্‌র কাছে, যদি এই শর্তে বিরোধ থামানো যায়। খবরটা পেয়ে পিতা আরো ক্রুদ্ধ হয়েছেন।"

জিনত-উন-নিসা মুখ আরক্ত করে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলো। বলে উঠলো, "যুদ্ধ হোক বা না হোক, সে বাদশাহ সুলতানদের ব্যাপার, আমি বুঝি না ওসব। কিন্তু আমি ওই সুলতানকে বিয়ে করতে পারবো না।"

"কেন ?" জেব-উন-নিসা হাসলো।

"শুনেছি আলি আদিল শাহ অত্যন্ত ক্রূর, দুর্বল চরিত্রের লোক। যার মধ্যে কোনো পৌরুষ নেই, আমি তাকে বিয়ে করি না। এই ব্যাপারে আমি পিতার সঙ্গে একমত।"

দীর্ঘ নিশ্বাস চাপলো জেব-উন-নিসা। তারপর উত্তর দিলো, "এসব বিচারের উপর শাহজাদীদের বিবাহ হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে না। নির্ভর করে রাজনৈতিক প্রয়োজন ও স্বার্থের উপর। তোমার সঙ্গে আলি আদিল শাহ্‌র বিবাহ দিয়ে আলিজার কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হবে না। সেজন্যেই উনি এই প্রস্তাবের

বিপক্ষে। যদি এই বিবাহ ওঁর স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল হোতো উনি কোনো রকম দ্বিধা করতেন না।

"প্রস্তাব তো বিজাপুর থেকেও এসেছিলো।"

"হ্যাঁ।"

"আলিজা বিজাপুর দরবারের উকিল ইকবাল খাঁকে ওরকম অপমান না করলেই পারতেন," জিনত-উন-নিসা বললো, "প্রস্তাবে সম্মতি না থাকলে সেকথা সৌজন্যপূর্ণ ভাষায় জানিয়ে দিলেই হোতো, প্রকাশ্য দরবারে একথা বলার প্রয়োজন ছিলো না যে, আলিকে স্বর্গীয় সুলতানের বৈধ সন্তান বলে তিনি স্বীকার করেন না। ইকবাল খাঁর কন্যা আরজুমান-আরা আমার সহেলী; সে তারপর থেকে আর কোনোদিন মহলে আসেনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।"

জেব-উন-নিসা হেসে বললো, "রাজনীতিতে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভাবপ্রবণতা চলে না বোন। আলিজাকে তুমি চেনো না?"

"শুনেছি ইকবাল খাঁ বিজাপুর চলে যাবেন শিগগিরই।"

"হ্যাঁ, যুদ্ধ ঘোষণা করা হলে তো বিজাপুর দরবারের উকিল শত্রুপক্ষের রাজধানিতে থাকতে পারেন না। এখনো যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি, আলাপ আলোচনার জের চলছে এখনো। তাই উনি এখানে আছেন। তবে বেশীদিন থাকবেন না।"

"আরজুমান-আরার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না?" করুণ কণ্ঠে জিনত-উন-নিসা বললো।

জেব-উন-নিসা একটু চুপ করে থেকে বললো, "হ্যাঁ, দেখা হবে। দেখা হওয়া দরকার। সে কথাই তোমায় বলতে এসেছি।"

জিনত-উন-নিসা কৌতূহলভরে তাকালো জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর দিকে।

জেব-উন-নিসা চারদিকে তাকিয়ে নিলো, তারপর কণ্ঠস্বর মৃদু করে বললো, "আরজুমান-আরার কাছে আমি খবর পাঠিয়েছি আকিল খাঁর মারফত। ও বাড়ি থেকে বেরোবে না। সবাই

জানবে সে কয়েকদিন ধরে অসুস্থ। তুমি মহলদারের মারফত আলিজার অনুমতি নিয়ে ইকবাল খাঁর মহলে যাবে। তোমার সঙ্গে যাবে একজন খাদিমান।”

“তারপর ?”

“সেখানে বাগিচায় লুকিয়ে থাকবে আকিল খাঁ। আমার সঙ্গে ওর সেখানে দেখা হবে।”

“কি করে ?” জিনত-উন-নিসা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

“আমিই খাদিমান সেজে তোমার সঙ্গে থাকবো পাল্কির ভিতরে। কেউ জানবে না।”

“এদিকে যদি খোঁজ হয় তোমার ?”

“যাতে না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করবো।”

জিনত-উন-নিসা চুপ করে রইলো।

“আমার জন্যে তুমি এটুকু করবে না বোন,” ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো জেব-উন-নিসা।

জিনত-উন-নিসা হেসে তার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর গ্রীবাসংলগ্ন হোলো।

আওরঙ্গাবাদী মহল এসময় শাহজাদা আওরংজেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী। সে শাহজাদার নবপরিণীতা স্ত্রী, আওরঙ্গাবাদে এসে তাকে নিজের হারেমে এনেছে আওরংজেব। তাই এসময় বেশির ভাগ রজনীই কাটতো আওরঙ্গাবাদী মহলের সঙ্গে। অন্য দুজন বেগমের কাছে বড়ো একটা যেতো না শাহজাদা।

সেদিন রাত্রে আওরঙ্গাবাদী মহল দেখলো শাহজাদা অন্যান্য দিনের থেকে অনেক বেশী গম্ভীর। কিছুক্ষণ পরিচর্যার পর আওরঙ্গাবাদী গাম্ভীর্যের কারণ জিজ্ঞেস না করে পারলো না।

“আমার দুর্ভাবনার কারণ শুধু একজনই,” উত্তর দিলো আওরংজেব, “সে আলা হজরতের নয়নের মণি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ওই কাফের দারা। এখন সে আবার একটা নতুন ষড়যন্ত্র করছে

আমার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ   শুনছি নাকি বিজাপুরের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখার পরিকল্পনা করছে। কেন? আলা হজরত কি অন্ধ! যখন তিনি বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন শত্রুপক্ষের সঙ্গে দারার এই যোগাযোগ যে রাজদ্রোহ, একথাও কি তিনি বোঝেন না?"

উত্তেজিত হয়ে কক্ষের মধ্যে পদচারণা করতে লাগলো আওরংজেব।

আওরঙ্গাবাদী বললো, "বড়ী বেগমও তো বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধের পক্ষপাতী নন। উনি আলি আদিল শাহ্‌র সঙ্গে জিনত-উন-নিসার বিবাহ দিতে চান।"

"স্ত্রীলোকের বুদ্ধি!" উত্তর দিলো আওরংজেব, "দিলরস বানু রাজনীতির কি বোঝে? তৈমুর বংশের শাহজাদীর বিবাহ দিতে হবে এক ব্যাভিচারজাত জারজের সঙ্গে?"

"আলি আদিল শাহ কি সত্যিই মহম্মদ আদিল শাহ্‌র সন্তান নন?"

"না। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"কেন?"

"মহম্মদ আদিল শাহ্‌র আসল সন্তান আজো জীবিত।"

"একি বলছেন আলিজা!" বিস্মিত হোলো আওরঙ্গাবাদী "কোথায় সে?"

"কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলো আগ্রায় রংমহলের তহ্‌খানায়। এখন কোথায় আছে সে খবরও পেয়ে যাবো অচিরেই।"

বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে আওরঙ্গাবাদী মহল তাকালো আওরংজেবের দিকে। আওরংজেব আস্তে আস্তে বললো, "আজ দুটি পত্র পেয়েছি আগ্রা থেকে। একটি লিখেছে রোশন-আরা, অন্যটি উদিপুরী নামে দারার হারেমের এক নারী।"

আওরঙ্গাবাদী বুঝতে পারলো না শাহজাদার কথার মর্মার্থ।

আওরংজেব একটু হাসলো। ইস্পাতের ক্ষুরের মতো ধারালো সেই হাসি, ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "আশ্চর্য! আমি ভাবতেই পারি নি যে দারার রক্ষণাবেক্ষণেই ছিলো মহম্মদ আদিল শাহ্‌র নিরুদ্দিষ্ট সন্তান। সে তাকে ব্যবহার করতে চায় নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্যে, আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যে। বেশ বুঝতে পারছি, কি তার পরিকল্পনা।" জোরে হেসে উঠলো আওরংজেব, "বেরাদর্‌-জান দারা শিকো, তুমি শাহ-ই-আলিজা, তুমি গুল-ই-আওয়ালিন-ই-গুলিস্তাঁ-ই-শাহী, তুমি শাহ-ই-বুলন্দ-ইকবাল, তুমি আলা হজরত শাহ-ইন-শাহ-বাদশাহ শাহ জাহানের চশ্‌ম্‌এর রোশনাই,—কিন্তু আমি আওরংজেব। আমায় তুমি চেনো না।"

আঘাত সামান্যই। এজন্যে ফতিমা বিবিকে কিছুই বুঝতে দিলো না ওসমান বেগ্‌। সন্ধ্যা হতেই খাওয়া দাওয়া সেরে নিলো। প্রত্যেকদিনকার মতো ইসমাইল বেগ্‌ আজও এসেছিলো। ওসমানের সঙ্গে বেশী কথাবার্তা হোলো না। নিভৃতে বসে ফতিমা বিবির সঙ্গেই কোনো একটা বৈষয়িক আলোচনায় ব্যস্ত ছিলো ইসমাইল বেগ্‌। ওসমান চুপচাপ নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লো।

আওরঙ্গাবাদ, দিল্লি-আগ্রা কি বিজাপুরের মতো বিলাসমন্থ নয়। মোগল-দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শাহজাদা আওরংজেব অত্যন্ত গোঁড়া ও রক্ষণশীল। সুতরাং হিন্দুস্তানের অন্যান্য নগরীর মতো কোনো নৈশজীবন গড়ে উঠতে পারেনি আওরঙ্গাবাদে। সন্ধ্যে হতে না হতেই সারা শহর স্তব্ধ শান্ত ও নিস্তেজ হয়ে যায়। শহরতলির এই অঞ্চল এমনিও একটু জনবিরল, তাই ইতিমধ্যেই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। অপ্রশস্ত বাতায়নপথে দেখা যায় বাইরের খানিকটা আকাশ। উত্তরে হিন্দুস্তানে এখন শীতের প্রকোপ খুব, কিন্তু এখানে এই

দাক্ষিণাত্যে শীত নেই, বাতাসে শুধু ঈষৎ ঠাণ্ডা আমেজ। নির্মেঘ আকাশে শুক্লপক্ষের অপরিণত চাঁদ একরাশ তারার মাঝখানে যেন নিশ্চল হয়ে আছে। অন্ধকারের ওপার থেকে ভেসে আসছে ঝিল্লির অবিশ্রান্ত রব।

দিনের বেলার ঘটনাটা বার বার মনে পড়ছিলো ওসমানের। একটি কোমল করস্পর্শের আমেজে মনে যেন নেশা লেগেছে। দমকা হাওয়ার সঙ্গে মনও যেন দুলে দুলে উঠছে বাইরের অন্ধকার গাছের শাখাপ্রশাখার মতো। সেই সুষমাময়ীর স্নিগ্ধ চোখ দুটি যেন বার বার বার ভেসে উঠছে মনের আয়নায়। মুখ মনে নেই, নকাব্ এ ঢাকা ছিলো সেই মুখখানি, কিন্তু চোখ দুটো তো ভুলবার নয়।

এমনি করেই কি আকাশের চাঁদ হঠাৎ একদিন নেমে আসে মানুষের জীবনে?—ওসমান ভাবলো।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ উঠে বসলো। একটি বাসনা জেগেছিলো মনের মধ্যে। সেটি দমন করে আবার শুয়ে পড়লো। না, বাড়ি থেকে বেরোনো যাবে না। ইয়ার ইসমাইল বেগ্ এর কড়া হুকুম,—সন্ধ্যার পর বাড়িতে থাকতেই হবে। ইসমাইল বেগ্ একজন পাহারাও মোতায়েন করেছে বাইরের দরজায়।

কিছুক্ষণ পরে ইসমাইল বেগ্ চলে গেল। শুয়ে শুয়ে ওসমান শুনতে পেলো ইসমাইল বেগ্ এর ভারী পদশব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে বাড়ির বাইরে পথের বাঁকে। শয্যার উপর আবার উঠে বসলো ওসমান। ভাবলো, রংমহলের তহ্ খানা থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছি, এখানে এক সামান্য পাহারাদারের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া কি এমন শক্ত আমার পক্ষে?

তাড়াতাড়ি মলমলের জামা পড়ে নিলো ওসমান, তার উপর চড়ালো কালো রঙের কাবা। তরবারির দিকে হাত বাড়ালো, আবার সরিয়ে নিলো। ইসমাইল বেগ্ এর মানা আছে, অস্ত্র নিয়ে

বাইরে বেরোতে পারবে না। কিন্তু অচেনা শহরে, সন্ধ্যার অন্ধকারে একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় বেরোনো কি উচিত হবে? একবার নিরস্ত্র অবস্থায় এক নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে সে বিপদে পড়েছিলো। না, ওরকম নির্বুদ্ধিতা সে আর করবে না। সঙ্গে তলোয়ার থাকলে সে নির্ভয়, কেউ নেই ছুনিয়ায় যে তাকে বিপদে ফেলতে পারে। তলোয়ার বাঁধলো কোমরে, খাপ থেকে খুলে নিয়ে একবার পর্যবেক্ষণ করলো সে। এটা সেই তরবারি, যেটা দিয়েছিলো শাহ্-ই-আলিজা দারা শিকো। অত্যন্ত হাল্কা, কিন্তু নিদারুণ শীতল-কঠিন, ক্ষুরের মতো তীক্ষ্ণধার। তরবারি খাপে পুরে বাতায়নের দিকে এগিয়ে গেল ওসমান। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো নিচের অন্ধকারের ভিতর। তারপর জানলা দিয়ে নিঃশব্দে ঝুলে পড়ে অতি সন্তর্পণে মাটিতে নামলো মার্জারের মতো।

সর্দার ইকবাল খাঁ বাইরের মহলে তখন ব্যস্ত বিজাপুর থেকে আগত অন্য সর্দারদের সঙ্গে। মহলের ভিতর সংবাদ পাঠানো হয়েছে, অতিথিদের জন্যে দস্তরখান পাতা হবে বাইরেই। কন্যার সঙ্গে ভোজন করতে মহলের ভিতর আসবে না ইকবাল খাঁ।

একলা ঘরের ভিতর বসে বসে ভালো লাগছিলো না আরজুমান-আরার। ইকবাল খাঁর কাছে শুনেছে বেশীদিন আর আওরঙ্গাবাদে থাকা চলবে না। বিজাপুরে ফিরে যেতে হবে কিছুদিনের মধ্যেই। নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার সংবাদে তার খুশী হওয়ারই কথা। খুশী সে হয়েওছিলো। শৈশব থেকেই সে মাতৃহীনা, মাসীর কাছেই মানুষ। পিতার সঙ্গে আওরঙ্গাবাদ চলে আসবার পর মাসীর সঙ্গে দেখা নেই আজ তিনচার বছর। মাসী থাকে বিজাপুরে, চিঠি লিখে জানিয়েছে, ইকবাল খাঁ উপস্থিত না ফিরলেও, আরজুমান-আরাকে যেন অনতিবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনার সংবাদে ছুশ্চিন্তা হয়েছিলো মাসীর মনে।

আজ কিন্তু সারাদিন ধরে আরজুমান-আরার মন বিষণ্ণ হয়ে ছিলো।   এই আওরঙ্গাবাদ থেকে? কতো শান্ত, ধীর, এখানকার জীবন, বিজাপুরের মতো অতো কোলাহলময় নয়, অতো চঞ্চল নয়। শাহজাদার কন্যা জিনত-উন-নিসা তার সহেলী, তার সঙ্গেও আর দেখা হবে না হয়তো। আর—আর,—হ্যাঁ, কি দরকার ছিলো ওসমান নামে এক মুসাফিরের আজ সকালে মঞ্জিলের বাইরের পথ দিয়ে যাওয়ার? দু-দিন পরে হলে চলতো না? তখন সে সাফ শিকান খাঁ কি শাহজাদা আওরংজেব যারই মোকাবিলা করুক তলোয়ার নিয়ে, জানতেও পেতো না আরজুমান-আরা।

থাক গে, ওর সম্বন্ধে ভেবে আর কী লাভ,—আরজুমান-আরা ভাবলো, ওরকম কতো লোক আছে এই দুনিয়ায়, মেঘের মতো আসে, মেঘের মতো ভেসে চলে যায়, কে কার খবর রাখে!

কিন্তু সত্যিই কি ওর মতো অনেক লোক আছে এই দুনিয়ায়? —সে ভাবলো। অনেক ভেবেও নিশ্চিত হতে পারলো না এ বিষয়ে। মনে হোলো, এরকম যেন শুধু একজনই আছে। বসন ভূষণ অতি সাধারণ লোকের মতো। কিন্তু মুখের অপরূপ চেহারায় একটা আভিজাত্য আছে, একটা ব্যক্তিত্ব আছে, তার এত অল্প বয়েস সত্ত্বেও। মনে হয় যেন খুব খানদানী ঘরের সন্তান। আর, কী অপরূপ তার অসিচালনা, চোখের পলকে সাফ শিকান খাঁর মতো অভিজ্ঞ যোদ্ধার হাত থেকে তরবারি ফেলে দিলো!

যদি ওকেও বিজাপুর নিয়ে যাওয়া যেতো! নিশ্চয়ই ও খুব উন্নতি করতো বিজাপুরী ফৌজে। বিজাপুরের সেনানায়কেরা সবাই পিতার পরিচিত। নিশ্চয়ই ওকে সাহায্য করা যেতো। কিন্তু পিতাকে বলাই বা যায় কি করে! আর বলে লাভই বা কি, তার ঠিকানা তো জানা নেই।

যদি আবার একদিন দেখা হয়! ভাবতে ভাবতে আরজুমান-আরার মনে হোলো,—না, সে নিশ্চয়ই আরেকবার আসবে। চলে

যাওয়ার সময় তার চোখে যেই দৃষ্টি ফুটে উঠেছিলো, সেটা দেখে সংসারের যে কোনো নারী বলে দিতে পারবে, ও আবার আসবে, হ্যাঁ, আসবেই।

হঠাৎ যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো আরজুমান-আরার মন। বাইরে চাঁদ উঠেছে আকাশে। মনের ভিতর জেগে উঠছে একটি পুরোনো গানের কলি। মহল থেকে বাইরের বাগিচায় চলে এলো সে।

চারদিকে ছড়িয়ে আছে হেনার গন্ধ। ঘুরতে ঘুরতে এসে বসলো শিউলি গাছের নিচে এক বাঁধানো বেদীতে।

খানিকটা স্বপ্নাবিষ্টের মতোই এতটা পথ এসেছিলো ওসমান বেগ্। নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সে ঠিক মতো অবহিত ছিলো না। একটা ভাসা ভাসা ইচ্ছে ছিলো, পথ ধরে এগিয়ে যাবে। হয়তো বা দূর থেকে ঝরোকার আড়ালে আভাস পাওয়া যাবে সেই ক্ষণিকার।

কিন্তু ইকবাল খাঁর মঞ্জিলের পেছন দিকের পথ ধরে এগিয়ে এসে দেখলো বাড়ির এদিকটা অন্ধকার। কোনো জানলায় আলো নেই। শুধু দূরে বাড়ির সামনের দিকে কয়েকটা জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে।

এতটা পথ এসে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে তাহলে! ওসমানের বুদ্ধি বিচার বিবেচনা যেন লোপ পেলো। দুর্নিবার হয়ে উঠলো আরজুমান-আরাকে আরেকবার দেখবার বাসনা। সে নিজেই বুঝতে পারলো না সে কি করছে। হুঁস হোলো পাঁচিল অতিক্রম করে মঞ্জিলের পেছন দিকের বাগিচায় নেমে পড়ার পর। হঠাৎ একটা ভয় এলো মনে। এরকম অবস্থায়ই তো সে অচেনা প্রহরীদের হাতে ধরা পড়েছিলো আগ্রায়। ভাবলো,—না, এটি ছেলেমানুষী হচ্ছে! এ ঠিক নয়। কেউ দেখে ফেলার আগে আমার ফিরে যাওয়া উচিত।

হয়তো সে ফিরে যেতো, কিন্তু এমন সময় একটা মৃদু কণ্ঠের অস্ফুট গান কানে ভেসে এলো। কৌতূহল বোধ করে ফুলের গাছের ছায়ায় ছায়ায় খানিকটা এগিয়ে গেল। তারপর দেখতে পেলো, একটি নারীমূর্তি বসে আছে শিউলি গাছের নিচে পাষাণ বেদীতে।

সে নয়তো?—ভাবলো ইয়ার ওসমান বেগ্। ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে ছায়ার আড়ালে আড়ালে আরো একটু এগিয়ে গেল সে।

শুকনো পাতায় পা পড়তে মরমর করে উঠলো হঠাৎ। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি তাকালো মুখ ফিরিয়ে। কিন্তু চকিত হোলো না। হয়তো বা ভাবলো, বাড়িরই কোনো পরিচারিকা হবে। শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলো,—"কে? কে ওখানে?"

পরিচিত কণ্ঠ শুনে ওসমানের মনে একটা আনন্দের শিহরণ জাগলো। বেরিয়ে এলো ছায়ার আড়াল থেকে। বললো, "আমি ওসমান।" বলেই হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্ত হোলো। একি অন্যায় করলো সে? অভিজাত সর্দারের মঞ্জিলে সে প্রবেশ করেছে লুকিয়ে, অসম্ভ্রম করেছে পর্দার। যদি মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে? যদি ছুটে আসে পাহারাদারেরা? একবারের অভিজ্ঞতায় তার শিক্ষা হয়নি? আবার কেন সে এই ভুল করলো?

আরজুমান-আরার চোখে একটা কৌতুকের ঝিলিক খেলে গেল। হ্যাঁ, সে আসবে জানতো, মন বলছিলো তার,—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি? এভাবে? এটা সে আশা করে নি। তার বুক একটা অজানা অনুভূতিতে ধুকধুক করে উঠলো। কিন্তু বাইরে প্রশান্ত গাম্ভীর্য বজায় রেখে কপট রোষের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি এখানে এভাবে কেন এসেছেন? এ কি বে-আদবি!"

ওসমান লক্ষ্য করলো যে আরজুমান-আরার মুখে নকাব নেই, এবং সে মুখ ঢাকবার চেষ্টাও করলো না। আস্তে আস্তে কাছে

এসে ওসমান বললো,—"শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম একথা সেকথা। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকালাম। দেখি, ওই তারাগুলোর মাঝখানে তোমার মুখ ঝলমল করছে। আর থাকতে পারলাম না। চলে এলাম। এখানে এসে দেখি গাছের নিচে পাষাণ বেদীর উপর বসে গুনগুন করে গান গাইছে আকাশের চাঁদ। চোখের ভুল যে এত মধুর, কে জানতো ?"

আরজুমান-আরা হাসলো। তারপর উত্তর দিলো, "যারা জেনেছে, ওরা দিওয়ানা হয়ে গেছে।"

"আমায় মাফ করো। আমি এবার যাই." বললো ওসমান।

"আচ্ছা।"

ফিরে চললো ওসমান। দু-পা এগিয়ে আবার ফিরে তাকালো। দেখলো, আরজুমান-আরা হাসিমুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে !

ওসমান ফিরে এলো আরজুমান-আরার কাছে। বললো, "না, যাবো না। ফিরেই যদি যাবো তো, এলাম কেন ?"

হাসিমুখে আঁখি অবনত করলো আরজুমান-আরা।

ওসমান আস্তে আস্তে বসে পড়লো তার পাশে।

পরদিনও ওসমান এলো, তবে প্রথম প্রহর রাত্রিতে নয়, সন্ধ্যার কিছু আগে। রাত্রিবেলা নিরাপদ নয়, আরজুমান-আরার পিতা সর্দার ইকবাল খাঁ নৈশভোজন সমাপ্ত করে বাগিচায় ঘুরে বেড়ান অনেকক্ষণ। শুধু সেদিন কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে আসেন নি। অপরাহ্নের দিকে প্রায় প্রত্যেক দিনই তাঁকে যেতে হয় শাহজাদার দেওয়ান মুরশিদ-কুলি খাঁর কাছে। এসময় আরজুমান-আরা একলাই বেড়ায় বাগিচার মধ্যে, সঙ্গে থাকে শুধু তার বিশ্বস্ত পরিচারিকা সাকিনা বিবি। সেই সেদিন ওসমানকে ডেকে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিলো, সুতরাং তাকে ভয় নেই।

সেদিনও চোখের পলকে কেটে গেল দু-ঘড়ি সময়। আরজুমান-

আরা বললো, "এবার তোমায় ফিরে যেতে হবে ওসমান, আব্বাজানের ফিরে আসার সময় হয়েছে।"

কি যেন ভাবছিলো ওসমান। হঠাৎ বললো, "আরজুমান-আরা, তোমায় একটা কথা বলবো ভাবছিলাম।"

"কি কথা ওসমান?"

"আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই, আরজুমান-আরা।"

"হ্যাঁ, আমি জানি," আরক্ত হয়ে মুখ নিচু করে সে বললো।

"তুমি বিয়ে করবে আমায়?" ওসমান জিজ্ঞেস করলো ব্যগ্র কণ্ঠে।

আরজুমান-আরা চুপ করে রইলো।

"উত্তর দিচ্ছো না কেন?" ব্যাকুল হোলো ওসমানের কণ্ঠ।

"আমরা বিজাপুর চলে যাবো শিগগিরই।"

"তোমার পিতা যাক। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।"

"তুমিও চলো না বিজাপুরে। সেখানে তোমায় ফৌজে নিয়ে নেবে খুব আগ্রহের সঙ্গে। তোমার মতো যোদ্ধার ভাবনা কিসের?"

"সে হয়না আরজুমান-আরা। আমার পিতার অনুমতি ছাড়া আমি আওরঙ্গাবাদের বাইরে এক পাও যেতে পারবো না। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"আমায় বিয়ে যদি করো, তাহলে—"

"আমি কি করবো না বলেছি?"

"করবে সত্যি সত্যি?" আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ওসমানের মুখ।

"মনে মনে তোমায় বিয়ে করে নিয়েছি তো সেদিনই," উত্তর দিলো আরজুমান-আরা, "তা নইলে কি তোমার সঙ্গে এভাবে দেখা করতাম?"

ওসমান কিছু যেন বলতে যাচ্ছিলো, বাধা দিয়ে সে তাড়াতাড়ি

বললো, "না না, আজ আর সময় নেই, আব্বাজান এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই। তুমি এবার যাও ওসমান।"

"কাল—"

"হ্যাঁ, কাল।"

পরদিনও ওসমান এলো যথানির্দিষ্ট সময়ে। কিন্তু এসে দেখতে পেলো না আরজুমান-আরাকে। আগের দিন অপেক্ষা করে বসেছিলো তার জন্যে, কিন্তু আজ সে নেই। দেখতে পেলো শুধু তার পরিচারিকা সাকিনাকে। সে এগিয়ে এসে নিচু গলায় বললো, আসুন আমার সঙ্গে।"

"আরজুমান-আরা কোথায়?"

"ওঁর আসতে একটু দেরি হবে। উনি আজ একটু ব্যস্ত। আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে কিছুক্ষণ।"

অনন্তকাল ধরে আমি অপেক্ষা করতে রাজী আছি,—মনে মনে বললো ইয়ার ওসমান বেগ্।

বাগিচার এক প্রান্তে একটি ঘন লতাবিতান। আরজুমান-আরার পরিচারিকা ওসমানকে গোপনে অপেক্ষা করতে বললো সেখানেই।

"একটু সাবধানে থাকবেন। কেউ যেন আপনার উপস্থিতি টের না পায়।"

সে চলে গেল। ঘন পত্রপুঞ্জের আড়ালে নীরবে প্রতীক্ষা করতে লাগলো ওসমান। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে একটি গোলাপের ঘ্রাণ গ্রহণ করলো। তারপর পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো একটি বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতির পুষ্পবিহার। একটি ভ্রমর নাসিকার সামনে এসে গুঞ্জন করছিল, সেটিকে তাড়ালো। দু' তিনটে পিপীলিকা আঁট পাজামা বেয়ে উঠে আসছিলো, সেগুলি ঝেড়ে ফেললো,—তারপর অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে সামনের পত্রাবরণ সরিয়ে বাইরে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়লো একটি [illegible] দৃশ্য।

প্রাচীর অতিক্রম করে একজন যুবাপুরুষ লাফিয়ে নামলো ঘাসের উপর।

আরে! এ আবার এখানে কেন, ভাবলো ওসমান বেগ্। আগন্তুককে চিনতে পেরেছে সে। একবার মনে সন্দেহের ছায়া ভেসে গেল। তাকে ধরবার কোনোরকম ষড়যন্ত্র নয় তো! আগ্রায় সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু নবাগতের মুখভাব দেখে তেমন মনে হোলো না। তার চোখে মুখেও একটা উৎকণ্ঠা, সতর্ক ভাব, সেও যেন গোপনে এসেছে এখানে।

আরেকটি মৃদু পদশব্দ শুনে অন্যদিকে ফিরে তাকালো ওসমান বেগ্। একটি যুবতী নারী এগিয়ে আসছে এদিকে। না, এ আর্জুমান-আরা নয়। এর পদক্ষেপ অনেক দৃপ্ত, উদ্ধত। প্রশস্ত ললাটে ঝকমক করছে একটি হীরার কোতবিলদার। কাছাকাছি এসে সে নকাব সরিয়ে নিলো মুখের উপর থেকে। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো ওসমান বেগ্। অপরূপ ব্যক্তিত্ব এই নারীর চেহারায়, কিন্তু সেই ব্যক্তিত্ব আরও বেশী মহীয়ান করেছে একটা রুক্ষ আত্মস্থ ভাব। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না, চোখ আপনা থেকেই আনত হয়ে আসে।

"রাজি!" ডাকলো সেই নারী।

"মকৃফি!" সম্বোধন করলো আকিল খাঁ। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই নারী ছুটে এসে আকিল খাঁর বক্ষলগ্ন হোলো।

ওসমানের কানে ভেসে এলো তাদের কথাবার্তা।

"কতোকাল পরে,— রাজি!—কতোকাল পরে—।"

"দু-বছর, কিন্তু মনে হয় যেন একযুগ কেটে গেছে।"

"আমি কিন্তু সব সময় তোমার সুরত আমার চশম্এর সামনে দেখতে পেতাম—।"

"মকৃফি! এভাবে আর কতোদিন—।"

"হয়তো চিরকাল—। আমি যেই পরিবেশে জন্মেছি, আমার তো এই জন্‌জির কাটানোর উপায় নেই,—রাজি!"

"মক্‌ফি, মির জুমলা এসে পৌঁছালেই বিজাপুর অভিযান শুরু হবে। আলিজা শাহজাদার সঙ্গে আমাকেও যুদ্ধে যেতে হবে।"

"আমি জানি,—রাজি! তাই অনেক চেষ্টা করে, অনেক ঝুঁকি নিয়ে তোমার সঙ্গে এভাবে দেখা করার ব্যবস্থা করলাম। যুদ্ধে যাওয়ার আগে অন্তত একটিবার তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমি উন্মাদ হয়ে যেতাম।"

"যুদ্ধে যদি নিহত হই, আমার আর আক্ষেপ করার কিছু থাকবে না। তোমার সঙ্গে যে একবার দেখা হোলো, তাতেই আমার জীবন সার্থক হয়ে গেল, মক্‌ফি!"

"না, না, অমন কথা বোলো না—।"

"মক্‌ফি!"

"রাজি!"

নিজের প্রণয়সংলাপের সময় খেয়াল থাকে না, কিন্তু অন্যের মুখে অনুরূপ প্রণয়সংলাপ শুনলে লোকে কৌতুকবোধই করে। ওসমান নিজের মনে একটু হাসলো। তারপর ভাবলো, রাজি তো আকিল খাঁর ছদ্মনাম, কবিতা রচনা করে এই নামে। কিন্তু মক্‌ফি? মর্ক্‌ফি মানে, যে সংগুপ্তা। কিন্তু এ আবার কি ধরণের নাম?

আরজুমান-আরার কক্ষে ওর হাত ধরে বসেছিলো জিনত-উন-নিসা। আওরঙ্গাবাদে আসবার পর তুজনের মধ্যে খুব সখ্যতা হয়েছিলো। মোগল দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শাহজাদা আওরংজেব আর আওরঙ্গাবাদে বিজাপুরের রাজদূত সর্দার ইকবাল খাঁর মধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো অন্তরঙ্গ হৃদ্যতা, কখনো শীতল নিস্পৃহ আগ্রহহীনতা দেখা দিতো, কিন্তু তাদের সম্পর্কের এই অনিশ্চিত পরিবর্তনশীলতা কখনো তাদের তুই কন্যার বন্ধুত্বের

উপর ছায়াপাত করেনি। ইকবাল খাঁর কন্যার সঙ্গে বেশী মাখামাখি শাহজাদা পছন্দ না করলেও জিনত-উন-নিসার জননী দিলরস বানু বেগমের জন্যে কিছু বলতে পারতো না। দিলরস-বানুর মনে মনে একটা আশা ছিলো হয়তো অচিরে কেটে যাবে সংঘাতের কালমেঘ, সন্ধি হবে বিজাপুরের সঙ্গে, এবং তখন হয়তো শাহজাদাকে বলে কয়ে বিজাপুরের সুলতান আলি আদিল শাহ্‌র সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া যাবে। সুতরাং বিজাপুর দরবারের প্রতিপত্তিশালী সর্দার ইকবাল খাঁর কন্যার সঙ্গে জিনত-উন-নিসার বন্ধুত্ব বজায় থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ, রাজনৈতিক জীবনে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব কি ভাবে কোন কাজে লেগে যায় বলা যায় না। এক স্বাধীন রাজ্যের সুলতানের প্রধানা বেগম হিসেবে কন্যাকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিলো দিলরস-বানুর গোপন উচ্চাশা। আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষনা না হলেও সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বিজাপুরের রাজদূতের মঞ্জিলে মোগল রাজকন্যার তশরীফ নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হোতো না, যদি এতে দিলরস-বানুর সমর্থন না থাকতো। এর জন্যে আওরংজেবের বিশেষ সম্মতি প্রয়োজন।

"বেশ তো, আরজুমান-আরাই আসুক না আমাদের মহলে,—" বলেছিলো আওরংজেব।

"ও অসুস্থ,"—উত্তর দিয়েছিলো দিলরস-বানু বেগম,—"আমার মনে হয় জিনত-উন-নিসা যদি ওর তবিয়ত জিজ্ঞেস করতে যায়, কিছুই অশোভন হবে না।"

দিলরস-বানুকে একটু ভয় পেতো আওরংজেব। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছে শাহজাদার ছিলো না। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিয়ে মহলদারকে নির্দেশ দিলো যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে।

কিছুদিনের মধ্যেই আওরঙ্গাবাদ থেকে নিজের দফতর্ গুটিয়ে বিজাপুরে ফিরে যাবে সর্দার ইকবাল খাঁ। আরজুমান-আরাও

চলে যাবে পিতার সঙ্গে। হয়তো আর কোনোদিন দেখা হবে না তার প্রিয় সহেলী জিনত-উন-নিসার সঙ্গে। আসন্ন বিয়োগব্যথায় দুজনেরই মুখ বিষন্ন।

"সুলতান বাদশাহ্‌রা যদি সব সময় যুদ্ধ বিগ্রহ করার কথা না ভাবতো," আস্তে আস্তে বললো আরজুমান-আরা, "এই দুনিয়া কতো শান্তিময় হোতো!"

"আমার পিতা আলিজা শাহজাদার জীবনে যুদ্ধবিগ্রহ রাজনীতিই মুখ্য," বেদনাতুর কণ্ঠে উত্তর দিলো জিনত-উন-নিসা, "অন্য সব কিছুই গৌণ। আমাদের সবারই জীবন তাঁর রাজনীতি ও উচ্চাশার চাকার সঙ্গে বাঁধা।"

"বেগম সাহিবা তো এই সংঘর্ষের অনুমোদন করেন না। তিনি নিবৃত্ত করতে পারেন না তাঁকে?"

"মায়ের অতোটা প্রভাব নেই আলিজার উপর। তা-ছাড়া মায়ের উচ্চাশা তো আরো ভয়াবহ। উনি চান সুলতান আদিল শাহ্‌র সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে।"

"আমাদের সুলতানের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উনি সবে আঠারো পার হয়ে উনিশে পদার্পন করেছেন, কিন্তু এই বয়েসেই এত দুশ্চরিত্র লম্পট হয়ে উঠেছেন যে বলার নয়। শোনা যায়, ওঁর জননী আমাদের বড়ী সাহিবা, তাঁর ভ্রাতা আফজল খাঁ এবং উজীর খাঁ-মহম্মদ তাঁকে প্রশ্রয় দেন, যাতে তিনি রাজকার্যে আগ্রহান্বিত না হন এবং তাঁর নামে ওঁরাই নির্বিবাদে রাজ্য পরিচালনা করতে পারেন।"

"হ্যাঁ, আমি জানি আরজুমান-আরা। ওই পরিবেশে আমার জীবন বিষময় হয়ে উঠবে। কিন্তু আমরা শাহী খানদানের কন্যা, আমরা সুলতান বাদশাহ্‌দের শতরঞ্জ খেলার গুটিমাত্র, জীবনের কাছে জহর ছাড়া আর কিসেরই বা প্রত্যাশা করতে পারি!"

"এই অবস্থার চাইতে তোমার ফুফী বড়ী ও ছোটী বেগম

সাহিবাদের মতো অবিবাহিত থেকে যাওয়াও শ্রেয়," উত্তর দিলো আরজুমান-আরা।

"আচ্ছা, আরজুমান-আরা," জিজ্ঞেস করলো জিনত-উন-নিসা, "তুমি সুলতান আলি আদিল শাহ্‌কে দেখেছো?"

"না," বলতে বলতে যেন শিউরে উঠলো সেই বিজাপুরী কন্যা, "কোনো সুন্দরী নারীর ওঁর সামনে না পড়াই বাঞ্ছনীয়। আমি কোনোদিন কিলা অর্ক্‌এর ধারে কাছেও যাইনি সেজন্যে। আমার পিতাও কোনোদিন বলেন নি যাওয়ার কথা।"

"শুনেছি উনি নাকি বেশ সুপুরুষ দেখতে।"

"হ্যাঁ, লোকে সুন্দর বলেই বলে। কিন্তু সেই সৌন্দর্য নাকি কারো মনে দাগ কাটে না, কারণ ওঁর চোখদুটি লালসায় ক্রূর হয়ে আছে সব সময়। এবং তাঁর ব্যক্তিত্বে পৌরুষ বলে কিছু নেই," আরজুমান-আরা বললো।

"একটা কথা বলবো তোমায়? তুমি আমার খুব প্রিয় সহেলী বলেই বলছি। দেখ, তুমি খানদানী সর্দারের কন্যা, তোমার পিতা ইকবাল খাঁ খানদানী ঘরেই তোমার বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তুমি যদি পারো কোনো সাধারণ লোকের সঙ্গেই ঘর করবার চেষ্টা কোরো। সাধারণ লোক, যার খানদান নেই, কিন্তু ইল্‌ম্‌ আছে, তারা সত্যিই প্যার করতে জানে, এবং প্রাণ ভরে প্যার করেও। আকিল খাঁকে দেখ। আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কি কোনো বাদশাহ্‌র কাছে এরকম প্যার পেতো? এত প্যার ওদের মধ্যে, তার জন্যে ওদের কতো ত্যাগ, কতো কষ্ট,—কিন্তু তবু একটা পরিপূর্ণতার সুখ ওরা পেয়ে গেছে।" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো জিনত-উন-নিসা, "লোকে বলে শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ নাকি মমতাজ বেগমকে খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু ওঁরও চার বেগম। মমতাজ বেগমের মৃত্যুর পরে ওঁর কথা ভেবে রাতে ঘুমোতে পারতেন না,—এবং রাতে ঘুমোতে পারতেন না বলে নিত্য নতুন

নারীর সঙ্গে সহবাস করতেন এই সেদিন পর্যন্ত। আলিজা শাহজাদা কিছুদিন আগে হীরাবাঈ নামে সেই পরস্তারের মোহে দশাহারা হয়ে ছিলেন,—আবার সেদিন আওরঙ্গাবাদী নামে একজনকে হারেমে গ্রহণ করেছেন। ভাবতে ভাবতে আমার গায়ে জ্বালা ধরে যায়, মনে হয় তাজমহলের মতো কোটি কোটি টাকা মূল্যের স্মৃতিসৌধগুলো পুরুষদের একটা বিরাট ধাপ্পা, একটা লোকদেখানো ভান,—তার শিল্পমূল্য যাই হোক না কেন। তার তারিফ মহম্মদ ইসা আফন্দি, মহম্মদ শরিফ, আমানত খাঁ, মনোহরলাল প্রমুখ স্থপতি ও শিল্পীদের, শাহ-ইন-শাহ আলা হজরতের নয়। কিন্তু,—আরজুমান-আরা, এসব কথা তো পুরুষদের কাছে বলা যায় না, নিজের সহেলীর কাছেই বলা যায় গোপনে।"

আরজুমান-আরা জিনত-উন-নিসার হাত চেপে ধরলো।

জিনতা-উন-নিসা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললো, "তুমি চলে যাবে, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না, মনের কথাগুলো তোমাকেই শুধু বললাম। হয়তো তুমি পারবে না কোনো সাধারণ লোককে বিয়ে করতে, তোমার পিতার নির্দেশে কোনো উচ্চাভিলাষী, দাম্ভিক, মদ্যপ খানদানী ঘরানার ছেলেকেই বিয়ে করতে হবে। আর আমাকেও হয়তো—," কথা শেষ না করেই চুপ করে গেল আওরংজেবের কন্যা।

আরজুমান-আরা কি যেন ভাবছিলো মুখ নিচু করে। এবার মুখ তুলে জিনত-উন-নিসার দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হাসি হাসলো। বললো, "একটা কথা বলবো তোমায়, কাউকে বলবে না?"

"কি?"

"আমি ভালোবাসি একজনকে। সে খুব সাধারণ ঘরানার ছেলে।"

"তাই নাকি? কে সে? খুলে বলো আমায়। নাম কি ওর?"

"ইয়ার ওসমান বেগ্। খুব সাধারণ লোক, কিন্তু কী খুবসুরত

দেখতে, সারা ব্যক্তিত্বে পৌরুষ ডগমগ করছে, ওরকম সুপুরুষ খানদানী ঘরেও দেখা যায় না। আর কী চমৎকার তার তলোয়ারের হাত। সেদিন মঞ্জিলের পাশের রাস্তায় একলা সাফ শিকান খাঁর মোকাবিলা করে চোখের পলকে ওর হাত থেকে তরবারি বিচ্যুত করলো।”

“ও! সেই লোকটা? ওই ঘটনার খবর আমাদের মহলেও পৌঁছে গেছে। সবাই বলাবলি করছে, কে সেই লোক যে সাফ শিকান খাঁর মত যোদ্ধাকে হারিয়ে দিতে পারে! সেখানে তো আকিল খাঁ, এবং শেখ মিরও উপস্থিত ছিলো। ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় হোলো কি করে?”

“ওর হাতে একটু জখম হয়েছিল। তাই সাকিনা বিবিকে পাঠিয়ে ওকে পেছনের দরজা দিয়ে ডাকিয়ে আনলাম বাগিচার ভিতর। শরবত পান করালাম, হাত বেঁধে দিলাম।”

“তারপর?”

“তারপর আর কি। এমন বে-আদব লোক, রাত্রিবেলা দেখি দেওয়াল পার হয়ে বাগিচার ভিতর চলে এসেছে। এমন কম্‌বখ্‌ত, এমন পাজি—”

“তারপর কি হোলো?”

“কি আর হবে। আকাশে চাঁদ ছিলো, সিতারা ছিলো, আর আমিও চাইছিলাম আরেকটিবার তার সঙ্গে মিলবার জন্যে। আর জানিনা যাও—,” বলে আরজুমান-আরা মুখ নিচু করলো।

জিনত-উন-নিসা হেসে তার সহেলীকে জড়িয়ে ধরলো। বললো, “আমি খোদার কাছে দোয়া চাইবো যেন তিনি তোমায় সুখী করেন। তোমরা তো চলে যাচ্ছো, তা নইলে আমি ওকে একবার দেখতে চাইতাম।”

“তুমি দেখতে চাইতে!” আরজুমান-আরা বিস্মিত হয়ে

তাকালো জিনত-উন-নিসার দিকে। শাহজাদার কন্যা দেখতে চাইছে এক অন্য পুরুষকে !

"দোষ কি তাতে ?" বললো জিনত-উন-নিসা, "ওসমান তোমার আশিক, তোমাব ভাবী স্বামী, তুমি আমার সহেলী, ওকে আমার ভাই বলে মেনে নিতাম।"

একটু ভাবলো আরজুমান-আরা। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তুমি দেখবে তাকে ?"

"কি করে সেটা সম্ভব হবে বোন ? তোমার সঙ্গে তো আর দেখা হবে না আমার। সময়ও শেষ হয়ে এলো। এবার বিদায় নিতে হবে আমায়।"

"সে এখানেই আছে," একটু ইতস্তত করে বললো আরজুমান-আরা।

"এখানেই !"

"হ্যাঁ। সাকিনা ওকে লুকিয়ে রেখেছে বাগিচায়। ওর আসার কথা ছিলো। কিন্তু হঠাৎ তুমি মহল থেকে সংবাদ পাঠালে যে, তুমি আসছো। ওকে আসতে মানা করে দেওয়ার কোনো উপায় ছিলো না।"

হঠাৎ খুব উৎসাহী হয়ে পড়লো জিনত-উন-নিসা। "চলো, ওকে গিয়ে দেখি।"

"এখনই যাবে ?"

"হ্যাঁ, কেন যাবো না।"

"বাগিচায় জেব্-উন-নিসা বেগম আর আকিল খাঁ বসে আছে। ওদের আলাপে বিঘ্ন ঘটাবে ?"

"আমার ভগ্নী আমায় বলে দিয়েছে সময় হলে ওকে ডেকে নিতে।" জিনত-উন-নিসা উঠে ঝরোকার দিকে এগিয়ে গেল, তাকিয়ে দেখলো বাইরের দিকে, তারপর আরজুমান-আরার দিকে ফিরে বললো, "হ্যাঁ, আমরা এখন বাগিচায় যেতে পারি।

তবে একটা কথা, আমার পরিচয় দেবে না তোমায় আশিকের কাছে।"

বাগিচার সেই নিরালা অংশের দিকে জিনত-উন-নিসা আর আরজুমান-আরা এসে দেখে সেখানে একটা গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। একটি ঝাড়ের আড়ালে জেব-উন-নিসা দাঁড়িয়ে আছে মুখের উপর নকাব টেনে। আর ওদিকে তলোয়ার বার করে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে আকিল খাঁ আর ইয়ার ওসমান বেগ্। দুজনে দুজনকে কি যেন বলছে। ভাব দেখে মনে হয় দ্বন্দ্ব প্রায় বেধে গেল বলে।

এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো অপ্রত্যাশিত ভাবেই। নির্ভাবনায় বাক্যালাপ করছিলো আকিল খাঁ আর জেব-উন-নিসা। নিশ্চিন্ত মনে লতাবিতানে আত্মগোপন করে ছিলো ইয়ার ওসমান বেগ্। ওদের মনে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোন কারণই ছিলো না। আকিল খাঁ আর জেব-উন-নিসা উভয়েই কবি, তার উপর প্রণয়ী। সুতরাং তাদের আলাপের ভাষায় এমন একটা মাধুর্য ছিলো যেটা ওসমান খুব চমৎকৃত হয়ে উপভোগ করছিলো। একসময় আকিল খাঁর মুখে একটি অনবদ্য স্বরচিত ফারসী বয়েৎ শুনে অনবধানতাবশত হঠাৎ ওসমানের মুখ থেকে নির্গত হলো প্রশংসাবাচক শব্দ। সেটা ওদের কানে গেল। চকিত হয়ে ফিরে তাকালো ওরা। জেব-উন-নিসা চকিতে মুখের উপর নকাব টেনে সরে গেল একটি ঝাড়ের আড়ালে, আকিল খাঁ বিদ্যুৎগতিতে তলোয়ার বার করে এসে দাঁড়ালো লতাবিতানের সামনে। নিচুগলায় কিন্তু রুক্ষস্বরে ডাকলো, "কে ওখানে? বেরিয়ে এসো—।"

নিরস্ত্র অবস্থায় ওর সামনে দাঁড়ানো নিরাপদ হবে না ভেবে ওসমানও চোখের পলকে অসি কোষমুক্ত করে বেরিয়ে এলো

লতাবিতান থেকে, কিন্তু হাসি মুখেই বললো, "রাগ কোরো না বন্ধু, আমি তোমার নেহাত অপরিচিত নই, তোমাদের বিরক্ত করার ইচ্ছে আমার ছিলো না, কিন্তু তোমার ওই অপূর্ব বয়েৎ শুনে আত্মসংবরণ করতে পারিনি ।"

"তুমি!" তাকে দেখে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলো আকিল খাঁ, "তুমি এখানে কেন?"

"তোমাকে কেউ এ প্রশ্ন করলে তুমি যা উত্তর দিতে, আমারও ওই একই উত্তর," হাসিমুখে বললো ওসমান।

"বে-আদব, জানো এটা এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির হারেম? তুমি এখানে এসে এঁদের পর্দার অসম্মান করেছো।"

"যাঁর কাছে আমি এসেছি, তিনি তোমার সঙ্গে একমত হবেন না, আকিল খাঁ।"

"কিন্তু তুমি এই মহিলার সম্ভ্রমহানি করেছো, এর শিক্ষা তোমায় পেতেই হবে—।"

"আকিল খাঁ, ওঁর কাছে আমি মাফ্ চাইছি, কিন্তু আমাকে শিক্ষা দেওয়ার স্পর্ধা তুমি প্রকাশ কোরোনা—।"

মুখ লাল করে তলোয়ার উদ্যত করে দু-পা এগিয়ে এলো আকিল খাঁ, এমন সময় জেব-উন-নিসা ডাকলো ঝাড়ের আড়াল থেকে,—"রাজি, এখন নয়, এখানেও নয়। সবাই জেনে যাবে তোমার এখানে আসার খবর। আমরা চলে যাই এখান থেকে-- তারপর।"

"বেশ, আমরা বাইরে চলে যাচ্ছি। এসো ওসমান বেগ্, তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতে শঙ্কিত নও।"

"একেবারেই না," ওসমান উত্তর দিলো, "কিন্তু ভেবে দেখ বন্ধু, সেটা কি সুবিবেচনার কাজ হবে?"

ঠিক সেই মুহূর্তেই এসে পড়লো জিনত-উন-নিসা আর আরজুমান-আরা।

"ওকি! ও কি করছেন আপনারা," বলে আরজুমান-আরা ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো।

জিনত-উন-নিসা মুখের উপর নকাব টানলো না। অনাবৃত মুখেই সহজভাবে গিয়ে দাঁড়ালো আরজুমান-আরার কাছে।

"একে চেনেন আপনারা?" বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো আকিল খাঁ।

"ও কে?" জেব-উন-নিসা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো।

"উনি আমার ভাবী স্বামী," অকম্পিত কণ্ঠে আরজুমান-আরা উত্তর দিলো।

জেব-উন-নিসার চোখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

আরজুমান-আরা বলে গেল, "ওঁকে এ সময় আসতে মানা করার সুযোগ আমার ছিলো না, তাই আমিই সাকিনাকে পাঠিয়েছিলাম ওকে ওখানে লুকিয়ে রাখতে। অপরাধ যদি হয়ে থাকে সে আমার, ওর নয়।"

"রাজি," জেব-উন-নিসা বললো, "আরজুমান-আরার আশিকের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। তলোয়ার কোষবদ্ধ করো।"

আকিল খাঁ হেসে কোষবদ্ধ করলো তার তরবারি। ওসমান বেগ্‌ও তাই করলো ওর দেখাদেখি। তারপর হাতবাড়িয়ে এগিয়ে এলো আকিল খাঁর কাছে। আকিল খাঁ তার হাত চেপে ধরে বললো, "আরজুমান-আরা আমাদের বন্ধু। সুতরাং তুমিও আমাদের বন্ধু।"

"আমরা এসে না পড়লে তো গুরুতর ব্যাপার হোতো," বলে উঠলো জিনত-উন-নিসা, "আরজুমান-আরা আমায় বললো আপনার কথা, তাই খুব কৌতূহলী হয়ে আমি আপনাকে দেখতে এলাম। আমি আরজুমান-আরার সহেলী, সুতরাং আমি আপনার বোন। আমার নাম—ম্—আমার নাম," জিনত-উন-নিসা

তাকালো জেব-উন-নিসার দিকে, তারপর বললো, "আমার নাম হুরী।"

জেব-উন-নিসার চোখ ছুটি আবার হাসিতে ঝিলমিল করে উঠলো। বললো, "আমি ওর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। আমার নাম মক্‌ফি।"

"আমার খুব খুশ-কিসমতি যে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হোলো," বলে উঠলো ওসমান, "আমি আমার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। আমার কোন ভগ্নী নেই। আজ থেকে আপনারাই আমার ভগ্নী। যদি আপনাদের কোনো খিদমতে লাগতে পারি, খুবই সৌভাগ্যবান মনে করবো নিজেকে।"

সবারই মুখ একটু বিষন্ন হোলো। জিনত-উন-নিসা বললো, "আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। আরজুমান-আরা চলে যাচ্ছে বিজাপুর। আকিল খাঁ চলে যাচ্ছে ফৌজের সঙ্গে। আমরা ফিরে যাবো আমাদের গরীবখানায়। সেখান থেকে আমাদের বেরোনো মানা। তবে এই একটি সন্ধ্যার কথা আমরা চিরকাল মনে রাখবো।"

সর্দার ইকবাল খাঁর খাস মুন্সি ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌কে কক্ষের ভিতরে পেঁাছে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। ইকবাল খাঁর সঙ্গে বসে কথা বলছিলো এক খর্বাকৃতি বলিষ্ঠ-দেহ মারাঠী। ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌কে দেখে ছুজনেই গাত্রোত্থান করলো।

"ইনি আমাদের বন্ধু পুণার জায়গিরদার স্বর্গীয় শাহজীর পুত্র শিবাজীর ঘনিষ্ঠ সহচর ও প্রতিনিধি মিনাজী ভোঁসলে," পরিচয় দিলো ইকবাল খাঁ, "—আর এঁর কথা তো আগেই বলেছি। ইনি আমাদের পুরাতন বন্ধু সর্দার হামিদ খাঁ, উপস্থিত ইয়ার ইসমাইল বেগ্ নামেই পরিচিত। শাহ-ই-আলিজা দারা শিকোর ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে ইনি আসছেন আগ্রা থেকে।"

পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করলো। তারপর ইকবাল খাঁর

দিকে ফিরে ইসমাইল বেগ্ বললো, "আসতে আসতে দেখলাম, আপনার মঞ্জিল থেকে একটি পাল্কি বেরিয়ে এলো। সঙ্গে মোগল ফৌজের একজন মির-দহ্এর সঙ্গে একদল পিয়াদা ও কয়েকজন সিলাহ্দার। ব্যাপার কি?"

"শাহজাদার কন্যা জিনত-উন-নিসা এখানে তশরিফ এনেছিলেন আমার কন্যা আরজুমান-আরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সে ওঁর সহেলী। তাই আমরা বিজাপুর ফিরে যাওয়ার আগে দেখা করে গেল।"

"ম্," একটু ভাবলো ইসমাইল বেগ্, তারপর মিনাজীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার প্রভু শিবাজীর কি বিচার?"

"উনি শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি," আস্তে আস্তে উত্তর দিলো মিনাজী ভোঁসলে, "কারো সঙ্গে অকারণ বিবাদ করতে চান না। নিজের এলাকায় শান্তিতে এবং নিরাপদে থাকতে পারলে উনি পরিতৃপ্তি বোধ করেন।"

"ওঁর কি ধারণা শাহজাদা আওরংজেব ওঁকে নিরাপদে এবং শান্তিতে থাকতে দেবেন? ওঁর হিন্দুবিদ্বেষ নিশ্চয়ই আপনাদের অজানা নয়।"

"উনি সে সম্বন্ধে অবহিত আছেন, তবে প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে অকারণ শত্রুতা করতে উনি অনিচ্ছুক।"

"বিজাপুর সম্বন্ধে উনি কি ভাবছেন?" জিজ্ঞেস করলো ইসমাইল বেগ্।

"যখন সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ জীবিত ছিলেন, তখন তাঁর প্রতি আমার প্রভুর যথেষ্ট আনুগত্য ছিলো। স্বর্গীয় সুলতানও তাঁকে প্রীতির চোখে দেখতেন। কিন্তু বর্তমানে উজীর খাঁ-মহম্মদ, বড়ী সাহিবা এবং তাঁর উপদেষ্টা ও ভগ্নীপতি সর্দার আফজল খাঁ যে শিবাজীর প্রতি অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট, তাতো আপনারা জানেন।

সুতরাং তাঁকে সতর্ক থাকতে হয়, নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হয়।"

"সুলতান আলি আদিল শাহর সম্পর্কে আপনাদের কি অভিমত?"

"তিনি গৌন ব্যক্তি। সুতরাং আমাদের কোনো অভিমত নেই।"

"তিনি যে স্বর্গীয় সুলতানের বৈধ সন্তান নয়, একথা জানেন বোধ হয়?"

"হ্যাঁ, ওরকম একটা রটনা আমাদের শ্রুতিগোচর হয়েছে। জনশ্রুতি এই যে, আসল সন্তানকে নিয়ে আপনি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন।"

"যদি এই আসল সন্তান বিজাপুরের তখ্ত্-এ হাসিল হয়?"

"সব কিছু নির্ভর করে আপনাদের নীতির উপর। বড়ী সাহিবা, আফজল খাঁ ও খাঁ-মহম্মদকে আমরা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই।"

"যদি আসল ক্ষমতা ওদের হাত থেকে বিচ্যুত হয়? মনে করুন যদি আমি, ইকবাল খাঁ এবং আমাদেরই মতো কয়েকজন রাজ্যের শাসননীতি নিয়ন্ত্রণ করে?"

"আমি দূত মাত্র," মিনাজী ভোঁসলে উত্তর দিলো, "আপনারা যে প্রস্তাব করবেন, সেটা আমার প্রভুর কাছে বহন করে নিয়ে যাবো। আমাদের পক্ষ থেকে কোনো শর্ত জানানোর বা, আপনাদের কোনো শর্ত স্বীকার করে নেওয়ার এখ্তিয়ায় আমার নেই।"

মিনাজীকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো ইসমাইল বেগ্। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "শাহজাদা আওরংজেব উচ্চাভিলাষী। শুধু বিজাপুর নয়, হিন্দুস্থানের তখ্ত্ দখল করাই তাঁর গোপন উদ্দেশ্য। যদি তিনি বিজাপুর দখল করেন, যদি তিনি হিন্দুস্থানের বাদশাহ হন, তাহলে আপনার প্রভু শিবাজী হয়তো তাঁর জায়গীর নিয়ে নিজের স্বাধীন সত্তা উপভোগ করতে পারবেন না। শাহ-ই-

কোনো বিভেদ করেন না। নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে যে তিনি আপনাদের উপনিষদ ফারসিতে অনুবাদ করেছেন। তিনি চান শান্তি, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রজা সাধারণের সমৃদ্ধি। তিনি চান বিজাপুরের সঙ্গে সখ্যতা, এমন কি বিজাপুরের বৈধ সুলতানকে তিনি কন্যাদান করতে অভিলাষী। তিনি চান আপনাদের শুভকামনা ও সাহায্য। যিনি বিজাপুরের বৈধ সুলতান হবেন, তিনিও দারার মতো উদার এবং অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু মুসলমান সবারই সহযোগিতা নিয়ে তিনি বিজাপুরকে একটা সমৃদ্ধশালী ও শক্তিমান রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান।”

মিনাজী ভোঁসলের মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না।

ইসমাইল বেগ্ বলে গেল, “কিন্তু এখন বিজাপুরের সমূহ বিপদ। আওরংজেব বিজাপুর অভিযান করতে প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁকে রোধ করবার ক্ষমতা বর্তমান বিজাপুরী হুকুমতের নেই। কিন্তু আওরংজেবের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতেই হবে, কারণ বিজাপুর দখল করলে তিনি এতটা শক্তিশালী হবেন যে, পরে যখন আগ্রার তখ্‌ত্‌এর জন্যে সংঘর্ষ শুরু হবে, তখন তাঁর মোকাবিলা করা দারা শিকোর পক্ষে কঠিন হতে পারে। সেই পরিস্থিতি আপনাদের পক্ষেও বিপজ্জনক।”

ইসমাইল বেগ্ একটু থামলো।

“বলে যান, আমি শুনছি,” বললো মিনাজী ভোঁসলে।

“আমাদের প্রথম কর্তব্য, বিজাপুরের তখ্‌ত্‌এ তার বৈধ সুলতানকে হাসিল করা। তাহলেই আমরা সাফল্যজনকভাবে আওরংজেবের মোগল সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতে পারবো। প্রথমত, এই ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য চাই, কারণ তাহলে সমস্ত বিশ্বস্ত মারাঠি জায়গিরদারদের সমর্থন আমরা পাবো। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ যখন শুরু হবে, তখন শিবাজী তাঁর মাওলে সৈন্য

নিয়ে মোগল ফৌজকে পশ্চাৎ দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করে তুলবে।”

“আমি আমার প্রভুকে জানাবো একথা। কিন্তু সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র বৈধ সন্তানকে তখ্‌ত্‌ এ হাসিল করার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য আপনারা কি ভাবে চান?”

ইসমাইল বেগ্‌ আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, “আমরা জানি যে, বিজাপুরের অনেক সর্দার শিবাজীর কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। আমরা আশা করি যে আমাদের সমর্থন করার জন্যে শিবাজী তাঁদের উপর তাঁর প্রভাব কার্যকরী করার প্রয়াস পাবেন। দ্বিতীয়ত, একদল মারাঠি সেনা মোতায়েন করা হবে বিজাপুরের সীমান্তে, যাতে আমরা প্রয়োজন মতো সেই সৈন্যদলকে ব্যবহার করতে পারি।”

রাত্রি প্রথম প্রহর অতীত হয়েছে। দস্তরখান্‌ বিছানো হয়েছে সর্দার ইকবাল খাঁর জন্যে। একলাই বসে আহার করছিলো সে। সামনে চুপচাপ বসে ছিলো আরজুমান-আরা।

কিছুক্ষণ সাধারণ দু-চার কথার পর আরজুমান-আরা বললো, “আব্বাজান, আমি শৈশব থেকে মাতৃহীনা। আপনি আমার মাতা ও পিতা দুইই। মাকে যেকথা অসঙ্কোচে বলতে পারতাম, সেকথা যদি আজ আপনাকে বলি, আপনি কি রুষ্ট হবেন?”

ইকবাল খাঁ হাসলো কন্যার কথা শুনে। বললো, “না, রুষ্ট হবো না। বলো।”

আরজুমান-আরা মুখ নিচু করলো। তারপর বললো, “যদি আপনার অনুমতি হয় ওসমান নামে একজন আগামী কাল আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।”

“কেন?”

সরমকুণ্ঠিত হোলো আরজুমান-আরা। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোনো

জড়তা নেই। নম্রকণ্ঠে বললো, "সে আপনার কন্যাকে বিবাহ করবার অনুমতি প্রার্থনা করবে।"

গম্ভীর হয়ে গেল ইকবাল খাঁ। জিজ্ঞেস করলো, "কে এই ওসমান ?"

"খুব সাধারণ ঘরের ছেলে। কিন্তু অত্যন্ত মহৎ, সাহসী এবং চরিত্রবান।"

"শুধু এই পরিচয়ে সর্দার ইকবাল খাঁর কন্যাকে বিবাহ করা চলে না," ইকবাল খাঁ উত্তর দিলো, "তা-ছাড়া তোমার বিবাহ আমি স্থির করে রেখেছি সর্দার আফজল খাঁর পুত্রের সঙ্গে।"

চোখ তুলে তাকালো আরজুমান-আরা। শান্ত কণ্ঠে বললো, "আপনি কথা দিয়েছিলেন যে আপনি রুষ্ট হবেন না।"

"রুষ্ট আমি হইনি। সেজন্যে তোমায় জিজ্ঞেস করছি, এই ওসমান নামক ব্যক্তির সঙ্গে তোমার পরিচয় হোলো কি করে ? না আরজুমান-আরা, আমি রুষ্ট হই নি। শুধু তোমার অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছি।"

"কিন্তু, অন্য কাউকে বিবাহ করা তো আমার পক্ষে অসম্ভব।"

একথার উত্তর দিলো না ইকবাল খাঁ। বললো, "আমরা চার পাঁচ দিনের মধ্যেই বিজাপুর রওনা হবো। আর এই কটা দিন কয়েকজন সশস্ত্র খোজা প্রহরীর সতর্ক পাহারা মোতায়েন হবে মঞ্জিলের চারদিকে। কয়েকটি নতুন দিওয়ান প্রকাশিত হয়েছে বলে শুনেছি। সেগুলো আনিয়ে দেবো বাজার থেকে। আশা করি সারাদিন মহলের ভিতরে বসে তুমি নিঃসঙ্গবোধ করবে না।"

প্রত্যেকদিনকার মতো দেখা করতে এসেছিলো ইয়ার ইসমাইল বেগ্। যখন নিরিবিলিতে বসে কথাবার্তা বলছিলো ফতিমা বিবির সঙ্গে, ওসমান তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো।

তাকে দেখে তাদের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

"কিছু বলবে ?" জিজ্ঞেস করলো ইসমাইল বেগ্।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে একটু কুণ্ঠিত বোধ করলো ওসমান। তার পর সেই কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে বললো, "একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা ছিলো।"

"কি কথা ?"

"আপনাদের হুকুম চাইতে এসেছি।"

"কিসের হুকুম," ভ্রুকুঞ্চিত করলো ইসমাইল বেগ্।

একটু ইতস্ততঃ করলো ওসমান বেগ্, তারপর বললো, "আরজুমান-আরাকে আপনাদের পুত্রবধূ করে গৃহে আনবার অনুমতি চাইছি।"

"কি বলছো তুমি !" ফতিমা বিবি বিস্মিত হয়ে তাকালো ওসমানের দিকে। ইসমাইল বেগের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

"আরজুমান-আরাকে আপনাদের অপছন্দ হবে না। সে সুন্দরী, খুব নম্র স্বভাব, ওর খানদান খুব ভালো—"

"তোমাদের কদিনের পরিচয় ?" আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো ইসমাইল বেগ্।

"অল্প কয়েকদিনের। আওরঙ্গাবাদে এসে পরিচয় হয়েছে।"

"তোমায় কি এজন্যেই দাক্ষিণাত্যে এনেছি ?" গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো ইসমাইল বেগ্, "এজন্যেই কি এত বছর ধরে সযত্নে লালন পালন করে সুশিক্ষিত করে তুলেছি যে অচেনা শহরে এসেই তুমি এক অপরিচিতা নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করে সাধারণ লোকের সাধারণ জীবনের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে চাইবে ?"

"কি প্রয়োজনে আমায় দাক্ষিণাত্যে এনেছেন তাতো বলেন নি।"

"সময় হলে বলবো। শুধু এটুকু জেনে রাখো যে, অদূর ভবিষ্যতে তোমায় এক বিরাট এবং কঠিন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ

করতে হবে। এবং তারই জন্যে বিগত আঠারো বছর ধরে আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি, তোমায় প্রস্তুত করেছি তারই জন্যে। এই আমার এবং ফতিমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র আশা, এবং এই আশা সফল করার জন্যে আমরা আমাদের জীবনের সমস্ত সুখ, বিলাস, উচ্চাশা সব কিছু ত্যাগ করেছি। আর আজ তুমি এসে বলছো, তুমি এক অপরিচিতা নারীকে বিবাহ করে সংসার করতে চাও। এক মহান কর্মজীবনের দায় দায়িত্ব এবং আদর্শ তোমার কাছে কিছুই নয়, তার চাইতে বেশী মূল্যবান হোলো এক সাধারণ নারীর প্রণয় !"

নম্রকণ্ঠে ওসমান বললো, "আমি সাধারণ লোক, অন্যান্য সাধারণ লোকের মতো আমার এই সাধারণ জীবন নিয়েই সুখী হতে চাই। কোনো উচ্চাশা আমার নেই, উচ্চাভিলাষী জীবনের ঝঞ্ঝাট জটিলতা অস্থিরতা আমার ভালো লাগে না। আরজুমান-আরাকে জানবার পর সব কিছুই তুচ্ছ মনে হয় আমার কাছে।"

"তোমার কাছে তুচ্ছ হতে পারে, আমার কাছে নয়," কঠিন কণ্ঠে ইসমাইল বেগ্ উত্তর দিলো, "তুমি সাধারণ লোক নও, সাধারণ লোকের সাধারণ জীবন নিয়ে সুখী হতে চাওয়ার কোনো অধিকার তোমার নেই।"

ওসমান অবাক হয়ে তাকালো ইসমাইল বেগ্এর দিকে। বললো. "আমি, আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আমি তোমায় বিশেষ কিছু বুঝতে দিতে চাইও না। সময় হলে সবই জানতে পারবে।"

ওসমান কি যেন ভাবলো কিছুক্ষণ, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু যাকে আমার জীবনে পেতে চাই, তাকে বিবাহ করতে বাধা কি? আমার জন্যে যদি কোনো কর্ম নির্ধারিত থাকে সেটা কি ব্যাহত হবে?"

"হ্যাঁ হবে। সেই কাজে সাফল্য লাভ করার আগে অন্য কোনো বন্ধনে জড়িয়ে পড়া তোমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হবে।"

ফতিমা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলো, এবার জিজ্ঞেস করলো, "ওসমান, কে এই আরজুমান-আরা?"

"বিজাপুরের উকীল সর্দার ইকবাল খাঁর কন্যা।"

"কি!" আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো ইসমাইল বেগ্।

বিস্মিত হয়েছিলো ফতিমাও। কিন্তু ইসমাইল বেগ্‌কে শান্ত করবার চেষ্টা করে বললো, "তুমি অতো উত্তেজিত হোয়ো না। তুমি বোসো। ওসমান, আরজুমান-আরার সঙ্গে তোমার পরিচয় হোলো কি করে?"

ওসমান উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ইসমাইল বেগ্ বাধা দিয়ে বললো, "না, থাক, আমি শুনতে চাইনা। অপরিণত বুদ্ধি তরুণ তরুণীর যেভাবে দেখা হয়, পরিচয় হয়, গোপনে সাক্ষাৎ হয়, সে ভাবেই হয়েছে। ওসমান, ওসমান,—এ একটা অল্পবয়েসের মোহ, একটা দৈহিক কামনা, একটা আসক্তি,—এটা প্রেম নয়। প্রেমের ভিত্তি হোলো ত্যাগ। এক আদর্শ, এক লক্ষ্য, একই দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে দুজনের মধ্যে যে মনের বন্ধন গড়ে ওঠে, সেটাই প্রেম। জিজ্ঞেস কর ওই ফতিমাকে, কোনো মিল নেই আমাদের মধ্যে, দুজনে জীবনের দুটো বিভিন্ন স্তর থেকে এসেছি, একজন আরেক জনের জীবনে জড়িয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না, কিন্তু নিয়তি আমাদের নিয়ে এলো একই পথে, আজ আঠারো বছর ধরে আমাদের দুজনের শুধু একটি মাত্র স্বপ্ন, একটি মাত্র কামনা,—সেটা তোমাকে ঘিরে। তারই জন্যে জীবনের প্রত্যেকটি অমূল্য দিন নিবেদন করে দিয়েছি,—ওই একটি সিদ্ধির জন্যে জীবনের অন্য সব আশা আকাঙ্খা তুচ্ছ করেছি। এবং তারই মধ্যে দিয়ে আমার আর ফতিমার মধ্যে যেই সম্পর্ক যেই ভালোবাসা গড়ে উঠেছে, তার দাম কোনো কিছু দিয়ে হিসেব করা যায় না। এটা যে

পেয়েছি ওসমান, সেটা শুধু তোমারই দৌলতে। এজন্যে আমরাই কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। তুমি তোমার ন্যায্য আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হও, এর বেশী আমরা কিছু চাই না, কোনো প্রতিদান চাই না তোমার কাছ থেকে, শুধু এটুকু মেহেরবাণী করো যে, তোমার কোনো ভুলের জন্য যেন আমাদের আরব্ধ কার্য ব্যর্থ না হয়।”

জল গড়িয়ে পড়ছিলো ফতিমার চোখ বেয়ে। ওর কাঁধে হাত রাখলো ইয়ার ইসমাইল বেগ্। তারপর ওসমানের দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বললো, “ওসমান, তুমি জানো না তুমি কে। অনেক বৃহত্তর জীবনের গণ্ডির মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে তোমাকে, তোমার অনেক দায়িত্ব, অনেক কাজ,—সাধারণ আর দশজন লোকের মতো হতে পারেনা তোমার জীবন।”

ওসমান আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে গেল।

ইসমাইল বেগএর কাঁধে মাথা রাখলো ফতিমা বিবি।

॥ সাত ॥

বিজাপুর আক্রমণ যে আসন্ন একথা জানে সবাই, কিন্তু অভিযান শুরু করবার দিন স্থির হয়নি। শাহজাদা আওরংজেব জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদদের আদেশ দিয়েছেন একটা শুভদিন নির্বাচিত করে দিতে। কিন্তু ওরা যে দিনই স্থির করুক, মাসখানেকের আগে অভিযান শুরু হবে কিনা সে সম্বন্ধে সবারই সন্দেহ আছে, কারণ উজীর মির জুমলা তাঁর গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আওরঙ্গাবাদে উপনীত হবার আগে শাহজাদা আওরঙ্গাবাদ থেকে দক্ষিণে রওনা হবে না এরকম একটা গুজব শোনা যাচ্ছে সবারই মুখে। নিজের অন্তরঙ্গ উপদেষ্টা ও সহচরদেরও আওরঙ্গজেব জানায় নি নিজের মনের কথা। কিন্তু যুদ্ধের আয়োজন চলছে ব্যাপকভাবে। প্রত্যেকদিন পূর্বাহ্নে কেল্লায় মন্ত্রণা সভা বসে, তাতে উপস্থিত থাকে শাহজাদার বিশ্বাসভাজন মনসবদারেরা। অভিযানের ও যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে নিখুঁতভাবে, আক্রমণের কর্মসূচি, রসদ সরবরাহ, অভিযানের ব্যয় বরাদ্দ, সেনা সন্নিবেশ, সব কিছুর বিশদ আলোচনা হচ্ছে প্রত্যেকদিন।

আকিল খাঁ, সাফ শিকান খাঁ আর সেখ মির অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও মজলিসে উপস্থিত হোলো একসঙ্গে। তখনো মন্ত্রণা-সভা আরম্ভ হওয়ার সময় হয়নি। খাঁ-ই-জামান মির খলিল, নজাবত খাঁ, ইসলাম খাঁ এসে গেছে, দেওয়ান মুরশিদ কুলি খাঁ, মির বকশি মহবত খাঁ, রাজা রায় সিং সিসোদিয়া ও হাডার রাও ছত্রসাল তখনো আসেনি।

শাহজাদার গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক বা মির আতশ

-ই-জামান মির খলিল আওরংজেবের মেসো পরলোকগতা মমতাজ বেগমের ভগ্নীপতি। সে স্বভাবতই বেশ দাম্ভিক, তার উপর সম্পর্কে শাহজাদার গুরুজন স্থানীয় বলে অন্য সবার সঙ্গে বেশী কথাবার্ত্তা বলতো না। সে ছিলো একটু তফাতে। মজলিস-[illegible] বাইরে একটি মর্মর-স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে নিচু কণ্ঠে বাক্যালাপ করছিলো নজাবত খাঁ ও ইসলাম খাঁ। আকিল খাঁ, সাফ শিকান খাঁ ও সেখ মিরকে আসতে দেখে ওরা ফিরে তাকালো, তারপর ইসারা করে ওদের কাছে আসতে বললো।

আকিল খাঁ হাসতে হাসতে বললো, "কি ব্যাপার নজাবত খাঁ। সকাল হতে না হতেই আবার কি গোপন ষড়যন্ত্র করছো ইসলাম খাঁর সঙ্গে মিলে ?"

"আমরা আর কি ষড়যন্ত্র করবো আকিল খাঁ," নজাবত খাঁ উত্তর দিলো, "ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠছে আমাদেরই বিরুদ্ধে।"

"কি রকম ?" শেখ মির জিজ্ঞেস করলো।

"শোনা যাচ্ছে শাহ-ই-আলিজা নাকি বিজাপুরের সুলতান আলি আদিল শাহ্‌র সঙ্গে নিজের কন্যা পাক-নিহাদ-বানু বেগমের বিবাহ দেওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেছেন আগ্রায় বিজাপুরী উকীলের কাছে," বললো ইসলাম খাঁ।

"সে কি ?" বলে উঠল সাফ শিকান খাঁ, "তা হলে তো আমাদের এই অভিযানের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

"শাহজাদা আওরংজেব নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়েছেন একথা শুনে ?"

"অসন্তুষ্ট ! সংবাদটা পাওয়া অবধি শাহজাদার চোখ দুটো অঙ্গারের মতো জ্বলেছে।"

"একটা চাপা গুজব শোনা যাচ্ছিলো কয়েকদিন থেকে—।"

"হ্যাঁ, কিন্তু কাল আমাদের আগ্রার মুদিয়া-নবিসের কাছ থেকে যে পত্র পাওয়া গেছে, তাতে এই সংবাদের নিশ্চিত সমর্থন

পাওয়া গেছে। শোনা যাচ্ছে যে শাহ্-ই-আলিজার ব্যক্তিগত দূত গোপনে আগ্রা থেকে বিজাপুর রওনা হয়ে গেছে।"

"কে সে, জানা যায় নি?"

"বোধ হয় না। কেন?"

সাফ শিকান খাঁ হেসে কণ্ঠনালির কাছে আঙুল চালিয়ে জবাই করার ভঙ্গি করলো, বললো, "তাকে পথেই শেষ করে দিতাম। বিজাপুর আর পেঁছাতে হোতো না।"

আকিল খাঁ আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "খাঁ-ই-জামান মির খলিল ঘরের ভিতর একলা বসে কি করছে?"

"অপেক্ষা করছে মুরশিদ কুলি খাঁ ও মহবত খাঁর। ও তো আমাদের ওর সমপদস্থ মনে করে না। হাজার হোক, ও শাহাজাদার পেয়ারের খালুজান।"

"পেয়ারের খালুজান!" শেখ মির হাসলো, "হবে নাই বা কেন? শাহজাদার মাসুক হীরাবাঈ জয়নাবাদী তো এসেছিলো ওরই হারেম থেকে।"

"আস্তে, আস্তে। ওদিকে একলা বসে থাকলে কি হবে, কান খাড়া করে আমাদের কথা শুনছে।"

"আমি ভয় পাই নাকি? কি করবে? ফরিয়াদ জানাবে শাহজাদার কাছে?"

দু-জোড়া ভারী পদশব্দ শোনা গেল। ফিরে তাকালো এরা। দর্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে দুজন রাজপুত মনসবদার।

"আদাব, রাও ছত্রসাল। আজ একটু শান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে। লোকে বলছে, আপনার বয়স নাকি আবার পাঁচ বছর কমে গেছে। গুজব যা শুনছি এখানে, সে সব রাজস্থানে পৌঁছে গেলে কি আমাদের ভগ্নী রাণী সাহিবা আপনাকে হাড়ার কেল্লায় ঢুকতে দেবে?"

রাও ছত্রসাল হেসে গোঁফে তা দিলো। তারপর উত্তর দিলো,

"বয়েস পাঁচ বৎসর কমুক কি দশ বছর বাড়ুক হাডর রাও ছত্রসালকে কখনো ক্লান্ত দেখায় না, রণক্ষেত্রেও না, গোলাপ বাগিচায়ও না। আর হাডার কেল্লার দরজা আমার জন্যে চিরকালই খোলা থাকবে, যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বীরের মতো ফিরে যেতে পারি। রাজপুতানী হাজার বছর ধরে তার স্বামীকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছে, যুদ্ধক্ষেত্রের গুজবে ওরা কান দেয় না। পিঠের উপর অস্ত্রচিহ্ন না থাকলে রাজপুতের সাত খুন মাফ। আপনাকে আর কি বলবো খাঁ সাহেব, আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই নিজেকে রাণী সাহেবার ভাই বলে অভিহিত করেছেন, আমার বলার অপেক্ষা রাখেন নি।"

"আপনি সেকথা বললে অসিযুদ্ধ বেধে যেতো," সাফ শিকান খাঁ হাসতে হাসতে বললো।

রাজা রায় সিং সিসোদিয়া একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক, এই রসালাপে অংশ গ্রহণ করলো না, হাসলোও না অন্য সবার মতো। বললো, "গুজবের কথাই যদি বলেন, তাহলে ভাবনার কারণ হওয়ার মতো দু-চারটা গুজবও আওরঙ্গাবাদের বাজারে চলছে বৈ কি!"

মুসলমান মনসবদার তিনজন একটু চকিত দৃষ্টিতে তাকালো তাদের রাজপুত সহকর্মীর দিকে।

আকিল খাঁ জিজ্ঞেস করলো, "আপনি আবার কি গুজব শুনলেন রাজা রায় সিং?"

"শাহ-ই-আলিজা নাকি গোপনে যোগাযোগ করেছেন পুনার শিবাজী ভোঁসলের সঙ্গে?"

"শিবাজীর সঙ্গে?" শেখ মির বলে উঠলো, "তাতে ভাবনার কি আছে? দুদিন চুপ করে থাকো, দেখবে শিবাজী আবার আমাদের শাহজাদার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আজ কয়েক বছর ধরে তো তাই দেখছি। সেবার শাহজাদা মুরাদের বশ্যতা স্বীকার করে পত্র লিখেছিলো, তারপর শাহজাদা আওরংজেব এখানে

সুবাদার হয়ে আসলে, ওঁর বশ্যতা স্বীকার করতে চাইলো। আবার ওদিকে বিজাপুরের সর্দারদেরও উৎকোচ দিয়ে হাত করে রেখেছে, বিজাপুরের স্থুলতানের কাছ থেকে জায়গিরের সনদ পাওয়ার জন্যেও আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।"

"শিবাজীকে তোমরা চেনো না," আস্তে আস্তে উত্তর দিলো রাজা রায় সিং, "ওর মাথায় কি খেলছে সে শুধু হিন্দুরাই বুঝতে পারে।"

"কি খেলছে?" ঈষৎ ব্যঙ্গের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো নজাবত খাঁ।

রাজা রায় সিংএর চোখ ছুটো একটু জ্বলে উঠলো, কোনো উত্তর দিলো না।

"শিবাজীকে নিয়ে ভাবনার কোনো কারণ নেই," ইসলাম খাঁ বললো, "ও এক সামান্য জায়গিরদার, ওর সমর্থন বা বৈরীতায় আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থের কোনো ইতর বিশেষ হবে না।"

"সত্যি, ভাবনার কোনো কারণ নেই," উত্তর দিলো শেখ মির, "শিবাজী কোনো সমস্যাই নয়, ও অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তি। এর থেকে আরো অনেক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে হয়তো।"

"ভাবনার কোনো করণ নেই, একথা আমি বলতে চাইনা," আকিল খাঁ বললো আস্তে আস্তে, "শাহ-ই-আলিজা স্বয়ং যোগাযোগ করছেন শিবাজীর সঙ্গে এটা ভাবনার কারণ বৈ কি। উনি নিজের কন্যার বিবাহ দিতে চাইছেন বিজাপুরের স্থুলতানের সঙ্গে, উনি গোপনে যোগাযোগ করছেন শিবাজীর সঙ্গে,—সব কিছুর মধ্যে যেন একটা স্থপরিকল্পিত নীতি নিহিত আছে।"

"বিষয়টা গুরুতর বটেই," সাফ শিকান খাঁ বলে উঠলো, "অবিলম্বে মজলিসে এ বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত।"

একটি ঘোষণা শোনা গেল বাইরের চৌকিতে।

তাকিয়ে দেখলো সবাই। প্রশস্ত অলিন্দ ধরে হেলতে দুলতে আসছে দেওয়ান মুরশিদ কুলি খাঁ খোরাসানী। তার পেছন পেছন দাক্ষিণাত্যের মোগল ফৌজের মির বকশি বা প্রধান সেনাপতি মহবত খাঁ।

সবাই অভিবাদন করলো নবাগতদের, আনুষ্ঠানিক সৌজন্যের সঙ্গে নয়, বরং একটা অন্তরঙ্গ হৃদ্যতার সঙ্গে। দেওয়ান কি মির বকশি পদমর্যাদায় সবার উপরে, কিন্তু রাজধানী আগ্রা থেকে বহুদূর এই দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গাবাদ শহরে নানা স্বার্থের সমীকরণে এদের মধ্যে একটা সহজ বন্ধুত্ব ছিলো, বয়েস এবং পদমর্যাদার পার্থক্য সত্ত্বেও। সবাই আওরংজেবের অত্যন্ত অনুগত এবং হিন্দুস্তানের তৎকালীন রাজনীতির অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে এই আনুগত্যও ওদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্য গড়ে তুলেছিলো।

"সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?" জিজ্ঞেস করেলা মুরশিদ কুলি খাঁ।

"আপনাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম," হাসিমুখে বললো আকিল খাঁ।

"আজ কি কোনো বিশেষ উপলক্ষ আছে?" মুরশিদ কুলি খাঁ হাসতে লাগলো।

"আছে বলেই তো জোর গুজব আওরঙ্গাবাদের বাজারে," ইসলাম খাঁ উত্তর দিলো।

মুরশিদ কুলি খাঁ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। মাথা নাড়লো আস্তে আস্তে।

মহবত খাঁ বলে উঠলো, "এত কথা কিসের বুঝিনা। শাহজাদা অনর্থক বিলম্ব করছেন। আমার ফৌজ প্রস্তুত। যেদিন হুকুম পাবো, তার দু-মাসের মধ্যেই বিজাপুরের কিলা অর্কএ মোগল নিশান উত্তোলিত করবো। এই শতরঞ্জ খেলায় আমাদের জন্যে বাজি জেতবার চাল আছে শুধু একটি,—সাতদিনের মধ্যে বিজাপুর।

তখন দেখা যাবে আগ্রায় বসে থেকে শাহ-ই-আলিজা কি করতে পারেন!”

চকিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালো মুরশিদ কুলি খাঁ। তারপর বললো, “এখানে দাঁড়িয়ে জটলা করে লাভ নেই। চলো, সবাই ভেতরে গিয়ে বসি। শাহজাদার আসবার সময় হোলো। এসব আলোচনা গোপনে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।”

মুরশিদ কুলি খাঁর পেছন পেছন সবাই ঢুকে পড়লো মজলিস কক্ষে।

শাহজাদার খাস চৌকি মজলিস কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিলো বাইরে থেকে। সেদিকে আর কারো যাওয়ার উপায় নেই। সশস্ত্র খাস চৌকির নিরলশ সতর্ক পাহারা সেখানে।

মুরশিদ কুলি খাঁ এবং অন্যান্য সবাইকে প্রবেশ করতে দেখে মির খলিল ফিরে তাকালো, তারপর মামুলী সৌজন্যের প্রয়োজনে অভিভাদন জানালো নীরস কণ্ঠে। বৎসরাধিক কাল পূর্বে মির খলিলের হারেমের হীরাবাঈ জয়নাবাদী নামে এক তওআয়ফের রূপমুগ্ধ হয়েছিলো আওরংজেব, তাকে আওরংজেবের হারেমে প্রেরণ করবার জন্যে শাহজাদার প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলো মুরশিদ কুলি খাঁ। অনিচ্ছসত্ত্বেও মির খলিলকে এই প্রস্তাবে রাজী হতে হয়েছিলো আওংজেবের এক পরস্ৎার ছত্তরবাঈকে বিনিময়ে গ্রহণ করে। তখন থেকেই মুরশিদ কুলি খাঁর প্রতি একটা বিদ্বেষভাব আছে মির খলিলের। সেই ভাব আছে আওরংজেবের প্রতিও, কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে পারে না, সুতরাং বেশী করে প্রকাশ পায় মুরশিদ কুলি খাঁর প্রতি। তার উপর, মুরশিদ কুলি খাঁ দেওয়ান, শাসন পরিচালনায় আওরংজেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ, তার পরামর্শ মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় শাহজাদা, কিন্তু মির খলিল স্বয়ং শাহ -ইন-শাহ বাদশাহ্‌র নিকট আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তার পদমর্যাদা মুরশিদ কুলি খাঁর অনেক নিচে। এই কারণেও মুরশিদ কুলি খাঁর

প্রতি একটা বিরূপভাব ছিলো মির খলিলের মনে। গোলন্দাজ বাহিনীর মির আতশ বলে ইদানিং সে আমন্ত্রণ পেতো শাহজাদার মন্ত্রণা সভায়, কিন্তু সব সময় মনে হোতো তাকে কেউ যেন যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে না। আওরংজেব তার পত্নীর ভগ্নীর পুত্র। তারই সঙ্গে হারেমের পরস্ত্তার বিনিময় করেছিলো বলে আড়ালে টীকাটিপ্পনি কাটতো অন্যান্য আমির মনসবদারেরা। একথা মির খলিলের অজানা ছিলো না। এসব কারণে সবার কাছে থেকে একটা দূরত্ব বজায় রাখবার জন্যে একটা দাম্ভিকতা দেখা যেতো তার হাবভাব কথায় বার্তায়।

কিন্তু মুরশিদ কুলি খাঁ অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার করতো তার সঙ্গে। তাকে দেখে প্রত্যভিবাদন করে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি এখানে একা বসে আছেন?"

একটা মাপা হাসি দেখা দিলো মির খলিলের মুখের উপর। বললো, "আপনি ছিলেন না এতক্ষণ, তাই একা ছিলাম। আপনি এসে পড়েছেন, শাহজাদাও অনতিবিলম্বে উপস্থিত হবে, আর একা মনে হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না।"

অন্যান্য অল্প বয়স্কেরা পরস্পরের দিকে তাকালো, কৌতুকে ঝিকমিক করে উঠলো সবার চোখ।

"আমরা তো আপনাকে সঙ্গ দিতে পারতাম," আকিল খাঁ বললো।

"তোমাদের অনেক মেহেরবাণী," কপালে হাত ঠেকিয়ে কপট সৌজন্যে ঈষৎ আনত হোলো মির খলিল, "যুদ্ধক্ষেত্রে আমার প্রতি এই বিবেচনা প্রদর্শন করলে তোমাদের শাহজাদা এবং আমি উভয়েই খুব প্রীত হবো।"

"আপনার যদি প্রয়োজন হয়, আমরা নিশ্চয়ই সর্বক্ষণ আপনাকে সঙ্গদান করবো," আরো বিনীতভাবে উত্তর দিলো আকিল খাঁ।

মির বকশি মহবত খাঁ হাসি চেপে কপট ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালো আকিল খাঁর দিকে। মির খলিলের শুভ্র কর্ণমূল আরক্ত হয়ে গেল। নজাবত খাঁ আর শেখ মির হেসে ফেললো।

"অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তার সময় এখন নয়," মুরশিদ কুলি খাঁ গাম্ভীর্য অবলম্বন করার চেষ্টা করে বলে উঠলো। তারপর মির খলিলের পিঠে হাত রেখে বললো, "ভাই মির আতশ, একটা গুরুতর ব্যাপারে আপনার পরামর্শ প্রয়োজন।"

"বলুন। আমি তো আপনাদের খিদমতে হাজির আছি।"

"আমরা স্থির করেছি, আজ শাহজাদাকে অনুরোধ করবো যুদ্ধ যাত্রায় আর বিলম্ব না করতে। বিজাপুরীদেরও প্রস্তুত হবার বেশী সময় দিতে চাই না, এবং শাহজাদার প্রতিপক্ষদেরও ষড়যন্ত্র জাল বেশীদূর বিস্তৃত হবার অবকাশও দিতে চাইনা।"

"শুনেছি, শাহজাদা উজীর মির জুমলার অপেক্ষায় বসে আছেন।"

"মির জুমলা পরে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিতে পারেন। বিজাপুর আক্রমণের জন্যে শুধু আপনার গোলন্দাজ বাহিনীই কি যথেষ্ট নয়?"

মির খলিল নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো, "আমি আগের থেকে কিছুই বলতে চাইনা। আমার যা মতামত শাহজাদার সামনেই দেবো।"

মুরশিদ কুলি খাঁর মুখমণ্ডল একটু আরক্ত হোলো, কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করে বললো, "আমরা একমত হলে নির্ভাবনায় শাহাজাদাকে জানাতে পারতাম, এই আর কি। ওঁর সামনে কোনো বাকবিতণ্ডা হোতো না, আমাদের কথা শুনে উনি সোজাসুজি ওঁর নিজের মত জানাতে পারতেন।"

"শাহজাদার নিজের মত কোনো বাকবিতণ্ডার অপেক্ষা রাখে না। ওর সামনে কোনো বাকবিতণ্ডা হতে তো দেখিনি," উত্তর দিলো মির খলিল।

আকিল খাঁ একটু বিরক্ত হোলো একথা শুনে। শান্তকণ্ঠে শুধু বললো, "শা-জাদাকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি।"

এমন সময় কক্ষের অন্য প্রান্তের দ্বার উন্মুক্ত হোলো। গুর্জ-বরদারের মুখে শোনা গেল শাহজাদার আগমণ ঘোষণা—বা আদব বা মুলায়জা হুঁশিয়ার······।

সবাই গাত্রোত্থান করলো। ধীর শান্ত পদক্ষেপে তশরিফ আনলো সুবা দক্কানের সুবাদার শাহজাদা মহি-উদ্-দিন মহম্মদ আওরংজেব। শাহজাদার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, ললাটে গভীর চিন্তার রেখা। অর্ধনিমীলিত চক্ষু যেন নিদ্রাতুর। করযুগল পশ্চাতে সংবদ্ধ।

সবাই তসলিম জানালো। আওরংজেব তাকালো না কারো দিকে। আস্তে আস্তে এসে মসনদে উপবেশন করলো। তারপর মাথা নাড়লো একটুখানি। সবাই জানে, এটি উপবেশন করবার অনুমতি। আম দরবারে কেউ বাদশাহ্‌র প্রতিনিধির সামনে উপবিষ্ট হতে পারে না। কিন্তু খাস মজলিসে অনুমতি পেলে উপবিষ্ট হতে কোনো বাধা নেই। সবাই আসন গ্রহণ করলো।

আওরংজেব চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। সুতরাং চুপ করে থাকতে হোলো অন্য সবাইকেও। তার পর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললো, "খাস মুন্সিকে ইত্তলা দেওয়া হোক।"

খাস মুন্সি দবির আহমদ সামনে এসে দাঁড়ালো।

"শাহ-ইন-শাহ আলা হজরতের জন্যে আরজ্-দস্ত্-এর খসড়া করা হোক।"

শ্রুতি-লিখন সমাপ্ত করে খাস মুন্সি চলে গেল।

"ওয়াকিয়া-নবিসকে ইত্তলা দেওয়া হোক।"

ওয়াকিয়া-নবিস্ এসে সাম্প্রতিক সংবাদ পাঠ করে শোনালো শাহজাদার দরবারের প্রকাশিত দৈনিক আখবার থেকে।

"...আগ্রায় জুলফিকার খাঁ মুশরিফদের খওয়াস নিযুক্ত হয়েছেন।"

"হুঁম।"

"বাদশাহ্‌র উপস্থিতিতে শাহ-ই-আলিজার সঙ্গে উদ্ধত ভাবে কথা বলেছেন বলে সফি-উদ্‌-দিন খাঁর মনসব ও জায়গির কমিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

"হুঁম।"

"পুণার শিবাজী ভোঁসলের হরকরা মিনাজী ভোঁসলেকে পর পর তিনদিন বিজাপুরের উকীল ইকবাল খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেখা গেছে।"

হঠাৎ মাথা তুলে সোজা হয়ে বসলো আওরংজেব।

"ইকবাল খাঁ বিজাপুর ফিরে যাওয়ার আয়োজন করছেন।"

"ভালো কথা।"

"শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে তমিজ-উদ-দিন খাঁকে পাঁচহাজারী মনসবদারের পদে উন্নীত করেছেন। তাঁর জায়গির তদনুপাতে বর্ধিত করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মির্জা মনসুরকে দফতর-ই-তন্‌এর দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়েছে…"

হঠাৎ ফেটে পড়লো আওরংজেব, "দারার লোক, সব দারার লোক। শাহ-ইন-শাহ আলা হজরত একেবারে অন্ধ হয়ে আছেন। সবই হচ্ছে দারার নির্দেশে—" বলতে বলতে আত্মসংবরণ করলো শাহজাদা। হাত নাড়লো ওয়াকিয়া-নবিসের দিকে। সে তসলিম করে চলে গেল।

"মির খলিল!"

"আদেশ করা হোক আলিজা।" মির খলিল সগর্বে বললো। শাহজাদা মুরশিদ কুলি খাঁকে অবহেলা করে তাকে প্রথম সম্ভাষণ করলো, এতে গর্ববোধ করলো মির খলিল।

"বন্দুকচিদের তোসদানের সরবরাহ এখনো এসে পৌঁছয়নি। আমাদের মনে হয় না আপনি ওদের গুলি বারুদ জামাহ্‌র জেব্‌এ রেখে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেবেন। আমরা এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের

জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। এসময় এই গাফিলতি, বিশেষ করে আপনার ক্ষেত্রে, আমরা মার্জনা করতে পারিনা। পরশুর মধ্যে যেন তোসদান পেয়ে যায় বন্দুকচিরা।"

শাহজাদার কথা শুনে মির খলিলের মুখমণ্ডল আরক্ত হোলো। মনে মনে খুসি হোলো অন্য সবাই।

আওরংজেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে মুরশিদ কুলি খাঁ উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু দেওয়ানের দিকে দৃষ্টিপাত না করে শাহজাদা বললো, "বিদার, কলিয়ানি ও কুলবর্গার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে নতুন নকসা তৈরী করার হুকুম জারি করা হয়েছিলো। এখনো কি সেগুলো প্রস্তুত হয়নি?"

কিন্তু দেওয়ান মুরশিদ কুলি খাঁ কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই শাহজাদা জানালো নকসাগুলি যেন দু-চারদিনের মধ্যেই পেশ করা হয় তাঁর কাছে।

মুরশিদ কুলি খাঁ একটু কাশলো। কিন্তু শাহজাদা চোখ ফিরিয়ে তাকালোই না তার দিকে। জিজ্ঞেস করলো, "দৌলতপুরের খাজিনাহ্ থেকে পঞ্চাশ হাজার আশরফি ও এক লক্ষ টাকা আনিয়ে নেওয়া হোক। জেনানা মহলের দারোগার কাছে এই অর্থ গচ্ছিত রাখা হবে। যুদ্ধের সময় বেগমদের তাঁবুর রাহা খরচের জন্যে প্রয়োজন হবে।"

মুরশিদ কুলি খাঁ বিস্মিত হোলো। আজ শাহজাদা সাধারণ খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন কেন? কি চিন্তা করছেন আওরংজেব? শাহজাদার মনোভাব খুব ভালো করেই আন্দাজ করতে পারতো এই বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, সে জানতো যে কোনো সমস্যা নিয়ে যখন শাহজাদার মন চিন্তা করতে থাকে, তখন সে কথোপকথনের সময় গুরুতর বা জটিল বিষয় উত্থাপন করে না, সময় অতিবাহিত করে অতি সাধারণ মামুলী বিষয়ের আলোচনায়।

কথাবার্তার মাঝখানে আওরংজেব একটু অন্যমনস্ক হয়ে যেতে মুরশিদ কুলি খাঁ সুযোগ পেয়ে সম্বোধন করলো, "আলিজা!"

ফিরে তাকালো আওরংজেব। "কিছু বলছো মুরশিদ কুলি খাঁ?"

"হ্যাঁ আলিজা। বিজাপুর অভিযান শুরু করার সম্ভাব্য তারিখ সম্বন্ধে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম। আমাদের মনে হয় শত্রুপক্ষ ও অন্যান্য প্রতিপক্ষদের বেশী সময় না দিয়ে যতো শীঘ্র সম্ভব ফৌজ নিয়ে দক্ষিণে রওনা হওয়া প্রয়োজন।"

"আমার তা মনে হয় না মুরশিদ কুলি খাঁ। আপাতত নয়। মির জুমলা আওরঙ্গাবাদে উপনীত হোক, তারপর দিন স্থির করা যাবে।"

"শহরে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়ছে, আলিজা।"

আওরংজেব এক মুহূর্তকাল অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো মুরশিদ কুলি খাঁর দিকে, তারপর বললো, "তুমি গুজবই শুনছো, আসল সংবাদগুলো আসছে শুধু আমারই কাছে।"

"কি সংবাদ, আলিজা?"

"আজ আবার আগ্রা থেকে উদিপুরী নামে সেই নারীর পত্র পেয়েছি। তাতে জেনেছি নাম। আগ্রা থেকে সংবাদ পাঠিয়েছে আমার বিশ্বস্ত খুফিয়া নবিস। তাতে জেনেছি সে লোকটির আগ্রা থেকে রওনা হওয়ার তারিখ। আর এখানে একজন হরকরার কাছে জানতে পেরেছি, সে নাকি পোঁছে গেছে আওরঙ্গাবাদে। খুব তাড়াতাড়ি এসে গেছে বলতে হবে। এত অল্প সময়ের মধ্যে সে আগ্রা থেকে আওরঙ্গাবাদে এসে উপস্থিত হবে, এটা আমি আশা করিনি।"

"কার কথা বলছেন আলিজা?"

"লোকটি খুব সাধারণ। বোধ হয় সওদাগর হিসেবেই তার পরিচয়। কিন্তু আসলে সে দারার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। বিজাপুরের সুলতান ও পুণার শবা নামে সেই লোকটির সঙ্গে যোগাযোগ

করবার জন্যেই সে এখানে এসেছে। হয়তো অল্পদিনের মধ্যে সেও চলে যাবে বিজাপুর। তার আগে তাকে আমার চাই। আকিল খাঁ, এই লোকটিকে ধরবার দায়িত্ব তোমার।"

"কি তার নাম, আলিজা?"

"ইসমাইল বেগ্। তুমি তার সন্ধান করো। সে কোথায় থাকে, আমাদের হরকরা জানতে পারেনি। তোমার প্রথম কাজ সেই খবর যোগাড় করা। তার সঙ্গে তার স্ত্রী, এবং এক তরুণ। তার ছেলে বলেই সবাই জানে। প্রায় প্রত্যেকদিনই এই ইসমাইল বেগ্ দেখা করতে যায় সর্দার ইকবাল খাঁর সঙ্গে। তার সন্ধান করা তোমার পক্ষে শক্ত হবে না। কিন্তু তাদের ধরে আনা ততো সহজ নাও হতে পারে। ওদের আটক করে ফেলার উপর আমাদের অভিযানের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করছে।"

মনসবদারেরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। কে এই লোকটি, যাকে আটক করে ফেলার উপর বিজাপুর অভিযানের সাফল্য নির্ভর করছে।

আওরংজেব বুঝলো তাদের মনের প্রশ্ন। একটু হাসলো তার অতি পরিচিত তুষার শীতল ইস্পাতের মাতো হাসি। বললো, "মুরশিদ কুলি খাঁ, আঠারো উনিশ বছর আগে বিজাপুর থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলো সর্দার হামিদ খাঁ। মনে আছে?

"হ্যাঁ, আলিজা, সে সম্পর্কে নানারকম কথা শুনেছি।"

"আমি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ভাবে সংবাদ পেয়েছি যে, এই ইসমাইল বেগ্ই সেই হামিদ খাঁ। এতদিন সে আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার আশ্রয়েই ছিলো।"

একথা শুনে স্তম্ভিত হোলো সবাই। এ কি অবিশ্বাস্য কথা!

"তা হলে? তা হলে বিজাপুরের সুলতানের পুত্র সম্বন্ধে সেই গুজব কি সত্যি?" জিজ্ঞেস করলো মহবত খাঁ।

"তোমার কি এখনো সন্দেহ আছে? আমার তো নেই,

কোনোদিন ছিলোও না। বেশ, এইবার যাচাই করে দেখা যাবে। আমার অনুমান হোলো এই,—হয়তো তার স্ত্রী সেই ফেরারী খাদিমান আয়েশা বানু, আর, আর—তাদের সন্তান বলে পরিচিত সেই অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক হোলো—" কথা শেষ করলো না আওরংজেব, হাতের ভঙ্গি করে থেমে গেল মাঝখানেই, তারপর আস্তে আস্তে নিচু গলায় বললো, "আঠারো বছর তার বয়েস। বেশী নয়, কম নয়। এবং সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র পত্নী বড়ী সাহিবাও এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন আঠারো বছর আগে। চিন্তা করার বিষয়ই বটে।"

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো আওরংজেব। উঠে দাড়ালো অন্য সবাইও।

"আকিল খাঁ!"

"আদেশ করুণ, আলিজা!"

"দুদিনের মধ্যেই এদের চাই কেল্লার কয়েদখানায়।"

"তাই হবে আলিজা।"

"মহবত খাঁ!"

"হুকুম করুন আলিজা!"

"মালব থেকে যে এক হাজার উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়া এসেছে, আজ অপরাহ্নে আমি তাদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করতে যাবো।"

কেউ আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই আওরংজেব কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলে গেল মহলের ভিতর।

সিদ্দি ওয়াজিদের দোকানের পিছন দিকে বসে গভীর আলোচনায় নিমগ্ন ছিলো দুজন লোক। তাদের একজন সিদ্দি হানিফ, আমাদের পূর্বপরিচিত। সে-ই কথা বলছিলো খুব নিচু গলায়।

যে শুনছিলো মন দিয়ে, তার পোশাক পরিচ্ছদ খুব সাধারণ। কিন্তু মুখের চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় সে সম্ভ্রান্তবংশীয়।

দীর্ঘ পরিপুষ্ট পেশীবহুল তার দেহ, রক্তিমাভ শুভ্র সেই দেহের বর্ণ। হাবসী সিদ্দিকের নাক একটু চাপা, কিন্তু তার নাক দীর্ঘ। সিদ্দি হানিফ থামতে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললো, "আশ্চর্য ব্যাপার!"

"চারজন লোক ওর পেছন পেছন তিনদিন ঘুরে তবে তার খবর যোগাড় করেছে। সে আগ্রা থেকে এসেছে কয়েকদিন আগে তার ওয়ালিদ ও ওয়ালিদার সঙ্গে। ওর ওয়ালিদের নাম ইয়ার ইসমাইল বেগ্, তবে তিনি এদের সঙ্গে থাকেন না। সন্ধ্যাবেলা স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তবে আব্দুল রহিম তিন দিন ওর পেছন নিয়েও ওর ঠিকানার হদিশ পায়নি। খানিকটা পথ গিয়ে হঠাৎ কোথায় যে দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায় কেউ টের পায়না। আব্দুলের দৃঢ় বিশ্বাস ইসমাইল বেগ্ কোনো না কোনো রকমে টের পেয়ে যায় কেউ ওর অনুসরণ করছে এবং নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে যে জন্যে সে অনুসরণকারীকে এড়িয়ে চলতে চায়।"

"তোমার কি মনে হয়," জিজ্ঞেস করলো সিদ্দি হানিফের শ্রোতা।

"আমার কি মনে হয়?" একটু আনমনা হয়ে গেল সিদ্দি হানিফ, আস্তে আস্তে উত্তর দিলো অন্যদিকে তাকিয়ে, "আমার যে কিছু একটা মনে হয়না তা নয়। কিন্তু মুল্লা মুখতার, এ একটা আবছা অনুমান মাত্র। নিশ্চিত না হয়ে সে সম্বন্ধে কারো সঙ্গে কোনো আলোচনা না করাই বাঞ্ছনীয়।"

"কি করবে এখন?" জানতে চাইলো মুল্লা মুখতার।

"সুলতানের এবং তাঁর উজীর খাঁ-মহম্মদের বিশ্বস্ত খাদিম হিসেবে আমার কর্তব্য এই ওসমান নামক যুবককে বিজাপুরে নিয়ে গিয়ে ওঁদের ভেট দেওয়া। তারপর ওঁরা যা করবার করবেন"

"কি করে নিয়ে যাবে বিজাপুর?"

"জানিনা। ছলে বলে কৌশলে, যে করেই হোক ওসমান

সাহেবকে বিজাপুর নিয়ে যেতেই হবে। আজ সকালে একটা মতলব এঁটে সিদ্দি ফজলুল ও সিদ্দি ইব্রাহিমকে ওর কাছে পাঠিয়েছি। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। ওদের ফিরে আসবার সময় হয়েছে। হ্যাঁ, এসেই পড়লো বোধ হয়। পায়ের সাড়া পাচ্ছি বাইরে।"

ওয়াজিদের গলা শোনা গেল, "সিদ্দি হানিফ! ফজলুল আর ইব্রাহিম ফিরে এসেছে।"

"ভেতরে পাঠিয়ে দাও।"

তুজন শ্যামবর্ণ হাবসী ঘরের ভিতর এলো।

"কি খবর ফজলুল।"

সিদ্দি ইব্রাহিমের দিকে তাকালো। ইব্রাহিম উত্তর দিলো, "ওকে রাজী করানো গেল না।"

"কিছুতেই না?"

"না, সিদ্দি হানিফ।"

"কি ব্যাপার?" মুল্লা মুখতার জিজ্ঞেস করলো।

সিদ্দি ফজলুল সিদ্দি হানিফের দিকে তাকালো।

"ওসমানকে বিজাপুর যাওয়ার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম," বললো সিদ্দি হানিফ, "ও অসিবিদ্যায় খুব পারদর্শী। জানতে পেরেছি যে মনসবদার সাফ শিকান খাঁর সঙ্গে ওর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছিলো একদিন। সে খাঁ সাহেবের হাত থেকে তলোয়ার খসিয়ে দিয়েছিলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। ফজলুল আর ইব্রাহিমকে পাঠিয়েছিলাম ওকে গিয়ে বলতে যে বিজাপুরী ফৌজে ওর মতো লোকের চাহিদা খুব। ও যদি যেতে রাজী হয় ওকে উপযুক্ত বেতনে সেখানে নিযুক্ত করা হবে কোনো একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে।"

"আমরা ওকে তুশো হুন আগাম দিতে চেয়েছিলাম," সিদ্দি ফজলুল বললো, "কিন্তু ও বললো, ওর মাকে বাবাকে ছেড়ে বা ওদের অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।"

"ওকে ধরেছিলে কোথায় ?"

"চওকের কাছে এক কাফিখানায়। ওখানে সে কাফি খেতে আসে প্রত্যেকদিন। বড় উদ্ধত, বেশী কথাবার্তা বলতে চায় না। আমরা অনেক কায়দাকৌশল করে ওর সঙ্গে আলাপ করলাম।"

"ও তো আওরঙ্গাবাদে নবাগত। কোথেকে এসেছে জানতে পেরেছো ?"

"না। বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করতে চটে উঠলো। ও যেই মেজাজে কথা বলছিলো অন্য কেউ হলে এমন শিক্ষা দিতাম যে জীবনে ভুলতো না। নেহাত আপনার মানা ছিলো বলেই চুপ করে হজম করে গেলাম।"

"না, না, এখন কোন গণ্ডগোল না করাই উচিত, অনর্থক অন্যের নজর পড়বে আমাদের উপর। আচ্ছা, আমাদের উকিল সাহেবের কি খবর ?"

"বিজাপুরে ফিরে যাওয়ার আয়োজন করছেন।"

"তা তো জানি। কিন্তু সর্দার শর্জা খাঁ, মুল্লা রহমান, ব্যাঙ্কাজী ভোঁসলে, এরা এখনো ফিরে যায়নি কেন ? এখানে তো এদের উপস্থিত থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"ওঁরা প্রায় প্রত্যেকদিনই সর্দার ইকবাল খাঁর ওখানে মিলিত হচ্ছেন। তিনচার ঘড়ি সময় সেইখানেই কাটান।"

"কিছু একটা গোপন পরামর্শ হচ্ছে, সেটা বেশ বুঝতে পারছি," বললো সিদ্দি হানিফ, "এরা তো আমাদের উজীর সাহেবের প্রতি-পক্ষ, দেশের এই দুর্দিনেও এরা আত্মকলহ ভুলে থাকতে পারবে না। এরা এখন কি মতলব আঁটছে সেটা আমার জানা প্রয়োজন।"

"এরা কিছু করতে পারবে না," উত্তর দিলো মুল্লা মুখতার, "আমি জানতে পেরেছি যে বড়ী সাহিবার নির্দেশে উজীর খাঁ-মহম্মদ এদের সম্বন্ধে চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। শর্জা খাঁ, মুল্লা রহমান,

ব্যাঙ্কাজী আর ইকবাল খাঁ বিজাপুর প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের কয়েদ করা হবে। আমাদের উজীর সাহেবের প্রতিপক্ষ যারা, তাদের কয়েকজনকে ইতিমধ্যে কয়েদ করা হয়েছে। দেশের এই দুর্দিনে এদের সম্বন্ধে কোনো কোমল মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।"

"হ্যাঁ, আমাদের উজীর সাহেবের মন বড় নরম। আপনি চাপ না দিলে উনি আমাকে ওদের উপর নজর রাখতে এখানে পাঠাতেন না," সিদ্দি হানিফ গম্ভীর কণ্ঠে বললো। তারপর ফজলুলের দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, ইকবাল খাঁর ওখানে আর যারা যারা আসে, তাদের উপরেও নজর রাখা হয়েছে তো?"

"সবারই উপর নজর রাখা হয়েছে। তবে একজনকে আমরা চিনতে পারছি না। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে মুখ ঢেকে আসে, মুখ ঢেকে চলে যায়। দীর্ঘ দেহ, তবে মনে হয় বেশ বয়েস হয়েছে, প্রৌঢ় ব্যক্তি তো নিশ্চয়ই। তবে আর বেশী কিছু জানা যায়নি।"

"ওর অনুসরণ করা হয়নি কেন?"

"করা হয়েছিলো। বেশীক্ষণ অনুসরণ করা যায়নি। সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় কখন যে কি ভাবে গা ঢাকা দিচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে না।"

"হুম। আর কোনো খবর আছে?"

"হ্যাঁ," বললো সিদ্দি ইব্রাহিম, "সেদিন শাহ্জাদার কন্যারা সর্দার ইব্রাহিম খাঁর মহলে এসেছিলো ওঁর কন্যা আরজুমান-আরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।"

"সে খবর আমি পেয়েছি।"

"শাহজাদার জিলওদার আকিল খাঁ সে সময় বাগানের পেছন দিকের দরজা দিয়ে সর্দার ইকবাল খাঁর মহলে প্রবেশ করেছিলেন।"

সিদ্দি হানিফ মুল্লা মুখতারের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। জেব-উন-নিসার সঙ্গে আকিল খাঁর গোপন প্রণয়ের কথা নিয়ে

একটু কানাঘুসো শোনা যেত কোনো কোনো মহলে। তবে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করলো না সিদ্দি হানিফ। আবার গাম্ভীর্য অবলম্বন করে বললো, "যদি কোনোদিন উজীর খাঁ-মহম্মদকে জানানো প্রয়োজন হয় যে সর্দার ইকবাল খাঁ আসলে আওরংজেবের লোক, সে উৎকোচ গ্রহণ করে মোগল সুবাদারের কাছ থেকে, তখন এই খবরটা কাজে লাগবে। মোগল সুবাদারের জিলওদার কেন গোপনে বাগিচার পেছন দিকের দরজা দিয়ে বিজাপুরী উাকেন্দ্রে মহলে প্রবেশ করবে?—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ইকবাল খাঁকে। তবে আমি বাজী রেখে বলতে পারি, এ কথা শুনলে ইকবাল খাঁ স্তম্ভিত হবে। এ খবর সে নিজেই জানেনা।"

"আরো খবর আছে সিদ্দি হানিফ!"

"বলো—।"

"কাল মিনাজী ভোঁসলেকে ইকবাল খাঁর হাবেলি থেকে নির্গত হতে দেখছি।"

"মিনাজী ভোঁসলে? কে সে?" জিজ্ঞেস করলো মুল্লা মুখতার।

"সে পুণার শিবাজীর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। খুব সম্প্রতি আওরঙ্গাবাদে এসেছে।"

মুল্লা মুখতার আর সিদ্দি হানিফ, দুজনে তাকালো পরস্পরের দিকে। একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল সিদ্দি হানিফের মুখে।

"শিবাজী বিজাপুর সরকারের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন," বললো সিদ্দি হানিফ, "তার সঙ্গেও যোগাযোগ করছে সর্দার ইকবাল খাঁ? উজীর খাঁ-মহম্মদ একথা শুনলে খুশী হবেন না।"

"এখবর উজীর সাহেবকে অবিলম্বে জানানো উচিত," মুল্লা মুখতার বলে উঠলো।

"হ্যাঁ, ওকে নিশ্চয়ই জানানো হবে। আমার মনে হচ্ছে সর্দার ইকবাল খাঁ কয়েদখানার বাইরে থাকা বিজাপুরের পক্ষে নিরাপদ

নয়," সিদ্দি হানিফ উত্তর দিলো। "আর কোনো খবর আছে?" জিজ্ঞেস করলো ফজলুলকে।

"কিছুক্ষণ আগে মোগল গোলন্দাজ ফৌজের মির আতশ খাঁ-ই জামান মির খলিলকে দেখা গেছে গোপন সাক্ষাৎ করতে গেছেন সর্দার ইকবাল খাঁর হাবেলিতে।"

এখবর শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল মুল্লা মুখতার আর সিদ্দি হানিফ। কিছুক্ষণ নীরবতার পর মুল্লা মুখতার বললো," সিদ্দি হানিফ, তুমি ঠিকই বলেছো, সর্দার ইকবাল খাঁকে কয়েদের বাইরে রাখা একেবারে নিরাপদ নয়। বিজাপুর রাজ্যের যে সব সর্দার উজীর খাঁ-মহম্মদ ও বড়ী সাহিবার বিরুদ্ধবাদী, ওরা নিশ্চয়ই কোনো একটা ষড়যন্ত্র করছে শাহজাদা আওরংজেবের সঙ্গে। এমন কি পুণার ওই সামান্য জায়গীরদার শিবাজীর সঙ্গে হাত মেলাতেও তারা কুণ্ঠিত নয়। আমার অবিলম্বে বিজাপুর ফিরে যাওয়া প্রয়োজন।"

"ব্যস্ত হবেন না বন্ধু," উত্তর দিলো সিদ্দি হানিফ, "আমিও ফিরে যাচ্ছি বিজাপুর। এক সঙ্গে যাবো। আমি শুধু সর্দার ইকবাল খাঁ রওনা হওয়ার অপেক্ষা করছি। এবং আরো দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমার বাকী আছে।"

"কি কাজ, সিদ্দি হানিফ।"

"অপরাহ্নের মধ্যেই জানতে পারবেন। ইব্রাহিম, হাসান আলির জন্যে সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ, সিদ্দি হানিফ, মালব থেকে যে এক হাজার ঘোড়া আনানো হয়েছে আওরঙ্গাবাদে, তাদের জন্যে যে নতুন বারগির নিযুক্ত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে হাসান আলিও। সংবাদ পেয়েছি যে, কাল শাহজাদা আওরংজেব ঘোড়াগুলো পরিদর্শন করবেন।"

"তারপর?"

"সুযোগ বুঝে হাসান আলি রিসালার বারগির সেজে রিসালার

কুচকাওয়াজে যোগ দেবে। তাতে সে শাহাজাদার কাছাকাছি আসার সুযোগ পাবে।”

“অন্য অন্য বারগির যারা আছে ওরা যদি অপরিচিত মুখ দেখে কিছু সন্দেহ করে?”

“অনেক নতুন লোক ঢুকেছে। কেউ কাউকে চেনে না।”

“কি ব্যাপার আমি কিছু বুঝতে পারছি না,” বলে উঠলো মুল্লা মুখতার।

“কালই সব জানতে পারবেন,” উত্তর দিলো সিদ্দি হানিফ। ইব্রাহিমকে জিজ্ঞেস করলো, “পরে পালিয়ে আসবার সুযোগ পাবে তো এই হাসান আলি?”

“কেল্লার বাইরে আসার ঝুঁকি হাসান আলির। এই ব্যাপারে কেউ তাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। তবে গোলমাল হৈ-চৈ-এর মধ্যে হয়তো বেরিয়ে আসতে পারবে। একবার বেরিয়ে আসতে পারলে তারপর আমরা আছি। ওকে ঠিক বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।”

সিদ্দি ইব্রাহিমের কথা শুনে খুশী হোলো সিদ্দি হানিফ। বললো, “যাই হোক, বেরিয়ে আসতে পারুক না পারুক পাঁচ হাজার হুন তো পেয়েছে। বেঁচে বেরিয়ে আসতে পারলে আরো পাঁচ হাজার পাবে, প্রাণে না বাঁচলে পাবে তার বিবি। —আর ওসমানের জন্যে যে ব্যবস্থা ভেবে রাখা আছে তার কি হোলো?”

“আমরা সবাই তৈরী। কাল সন্ধ্যেবেলা।”

“কাল?”

“হ্যাঁ। হওজের ওদিকটা নির্জন। দুপুরের দিকে সে বাড়ি ফেরে। তখন লোকজন বড় একটা থাকে না। ও একলা লোক। আমাদের অসুবিধে হবে না।”

“কি ব্যাপার সিদ্দি হানিফ,” জিজ্ঞেস করলো মুল্লা মুখতার।

“ওসমানকে ধরে বিজাপুর নিয়ে যাবো। অনুরোধে যখন

কিছু হোলো না, তখন একটু বলপ্রয়োগ করতে হবে বৈ কি। আমাদের প্রিয় সুলতানকে এরকম একটি জিনিস উপহার দেওয়ার সুযোগ কি আমি ছাড়বো মনে করেছেন ?”

এই পরিকল্পনা যখন আলোচিত হচ্ছিলো সিদ্দি ওয়াজিদের দোকান ঘরের পেছন দিকের কুঠরিতে, বিজাপুরের উকীল সর্দার ইকবাল খাঁর হাবেলিতে এক প্রকোষ্ঠে চিন্তাকুল মুখে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলো ইয়ার ইসমাইল বেগ্, শর্জা খাঁ, মুল্লা রহমান আর ব্যাঙ্কজী ভোঁসলে। তাদের সামনে গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট ছিলো আওরংজেবের ফৌজের মির আতশ খাঁ-ই-জামান মির খলিল।

কিছুক্ষণ পর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে সর্দার শর্জা খাঁ বললো, “ইসমাইল বেগ্, আপনাদের আর আওরঙ্গাবাদে থাকা নিরাপদ নয়। অবিলম্বে আপনাদের এই শহর ত্যাগ করা উচিত।”

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো ইয়ার ইসমাইল বেগ্। তারপর খাঁ-ই-জামান মির খলিলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, “মির খলিল, আপনার এই মেহেরবানি আমি ভুলবো না। আপনি সময় মতো আমায় সংবাদ দিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন। আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা কিভাবে প্রকাশ করতে পারি বলুন। আপনার উপকারের বিনিময়ে কি করতে পারি আপনার জন্য ?”

“আওরংজেবের বিজাপুর সংক্রান্ত নীতি যদি ব্যর্থ করে দিতে পারেন, যদি আপনাদের পরিকল্পনায় সাফল্যলাভ করতে পারেন, তাহলেই আমি পরিতুষ্ট হবো। এর বেশী আমি কিছু চাই না,” উত্তর দিলো মির খলিল।

“শাহজাদা ইয়ার ইসমাইল বেগ্ এবং ওসমানের খবর কি করে জানলেন ?” জিজ্ঞেস করলো মুল্লা রহমান।

“শাহ-ই-আলিজার মহলের ভিতরেই আমাদের শাহজাদার সংবাদদাতা আছে। সেখান থেকেই সংবাদটা এসেছে।

আওরংজেবের সঙ্গে একটা গভীর যোগাযোগ আছে দারা শিকোর কোনো এক পরসতারের সঙ্গে।"

মির খলিলের কথা শুনে স্তম্ভিত হোলো ইয়ার ইসমাইল বেগ্। কি করে জানলো দারার পরসতার? দারা এই দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ ধরে এদের সংবাদ গোপন রেখে কি শেষ পর্যন্ত এক রাক্ষতার কাছে না বলে পারে নি? না, না,—এরকম অবিমৃষ্যকারিতা দারার পক্ষে সম্ভব নয়,—ভাবলো ইয়ার ইসমাইল বেগ্। নিশ্চয়ই সেই নারী অন্য কোনোরকম ভাবে জেনেছে। ইকবাল খাঁর দিকে ফিরে বললো, "আমাদের আগ্রায় হরকরা মারফত এ সংবাদ শাহ-ই-আলিজাকে জানিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।"

ইকবাল খাঁ কি যেন ভাবছিলো। আনমনে বললো, "ওসমান! আমি কোথায় যেন এ নাম শুনেছি। ঠিক মনে পড়ছে না।"

ইসমাইল বেগ্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সর্দার ইকবাল খাঁর দিকে তাকালো, তারপর সহজভাবে বললো, "ওসমান খুব সাধারণ নাম। ওই নামে অনেকেই আছে। আমি ইচ্ছে করেই ওর এই নাম রেখেছিলাম, যাতে আর দশজন সাধারণ লোকের মধ্যে সে সহজেই বৈশিষ্ট্যহীন ভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।"

ব্যাঙ্কজী বলে উঠলো, "একে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা চোখে দেখিনি। ওঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমি খুব উদ্‌গ্রীব। সর্দার ইকবাল খাঁ, সর্দার শর্জা খাঁ এবং মুল্লা রহমানও নিশ্চয়ই আমার চাইতে কম উদ্‌গ্রীব নন।"

অন্য কেউ কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই ইয়ার ইসমাইল বেগ্ দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো, "এখনো সময় হয়নি। আপনাদের সবার উপরই আমাদের প্রতিপক্ষের কড়া নজর আছে। এসময় ওকে আপনাদের সংস্পর্শে না আনাই বাঞ্ছনীয়।"

"এখন আমাদের করণীয় কি?" শর্জা খাঁ জিজ্ঞেস করলো।

"আপনারা স্বাভাবিকভাবে যা [illegible] তাই করুন। শর্জা খাঁ,

মুল্লা রহমান এবং ব্যাঙ্কজী চারপাঁচ দিনের মধ্যেই বিজাপুর ফিরে যাওয়ার কথা। ইকবাল খাঁ পরশু তাঁর কন্যা এবং অন্যান্য পরিজনবর্গকে বিজাপুর পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কয়েকদিনের মধ্যে তিনিও নিশ্চয়ই শহর ত্যাগ করার অনুমতি পাবেন শাহজাদার কাছ থেকে। এই কর্মসূচীর কোনো পরিবর্তন করার কোনো কারণ নেই।"

"আমাদের জন্যে তো ভাবনা নেই," বললো মুল্লা রহমান, "আমি ভাবছি আপনাদের দুজনের কথা। আপনারা কি করবেন স্থির করেছেন?"

"সেটা আমার উপরই ছেড়ে দিন," উত্তর দিলো ইয়ার ইসমাইল বেগ্।

"আমরা যদি জানতে পারতাম—"

"সময় মতো সবই জানতে পারবেন। আপনারা বিজাপুর যেমন ফিরে যাচ্ছেন, তেমনই ফিরে যান।"

"কিন্তু আপনার সঙ্গে তো একটা যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন।"

"আমি সময় মতো যোগাযোগ করে নেবো।"

সবাই একটু চুপ করে রইলো। তারপরে শর্জা খাঁ মির খলিলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "একটা সংবাদ আপনি যদি দিতে পারতেন তো ভালো হোতো। শাহজাদা কি বিজাপুর আক্রমণের দিন স্থির করেছেন?"

মির খলিল একটু হেসে চুপ করে রইলো।

ইকবাল খাঁ উঠে গিয়ে একটি পেটিকা নিয়ে এলো। তার পর সেটি রাখলো মির খলিলের সামনে। বললো, "এর মধ্যে একটি হীরকখচিত গল্‌বন্দ্ আছে। বেগম সলিহাবানুর জন্যে আমাদের সশ্রদ্ধ ভেট হিসেবে যদি আপনি এটি গ্রহন করেন, তাহলে আপনার এই বান্দা খুবই অনুগৃহিত হবে।"

মির খলিলের মুখ লাল হয়ে গেল। ফিরেও তাকালো না

পেটিকার দিকে। কিন্তু শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "খাঁ সাহেব, আমি শাহী ফৌজের মির আতশ। আমার অধীনে যেই গোলন্দাজ বাহিনী বিজাপুর আক্রমণ করবে, সে কামান দেগে কিলা অর্ক ধুলিসাৎ করে দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করবে না। এই গোলাবর্ষণ হবে আমারই নির্দেশে। যদি ভেবে থাকেন আমি আমার বাদশাহ্‌র সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো, যদি ভেবে থাকেন হীরা জহরৎ আশরফি দিয়ে আমার ইমান খরিদ করতে পারবেন, তাহলে আপনারা ভ্রান্ত।"

সবাই একটু বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালো। তারপর শর্জা খাঁ আস্তে আস্তে বললো, "আপনি যে আমাদের এই গরীবখানায় তশরিফ এনেছেন, তাতে যে মনে মনে আমরা কিঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন হই নি, একথা তো অস্বীকার করতে পারবো না।"

"আমার আসার কারণ শাহজাদা আওরংজেব," উত্তর দিলো মির খলিল, "তার ব্যক্তিগত গুণাবলী ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে আমাদের কারো কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে সে যে যে-কোনো নীচ পন্থা অবলম্বন করতে পারে, সেটা আমি সমর্থনযোগ্য মনে করি না। আমারই হারেমের হীরাবাঈ নামে এক রমণীকে তার হাতে সমর্পণ করার জন্যে সে আমায় বাধ্য করেছিলো, এবং এই জন্যে তার মাতৃস্বসা আমার স্ত্রীকে আমার কাছে তার প্রস্তাব পেশ করার জন্যে নিয়োগ করতে সে দ্বিধাবোধ করে নি। আজ তার উচ্চাভিলাষ প্রসারিত হয়েছে আগ্রার তখ্‌ত্‌-এ-তাউসের দিকে। তারই জন্যে বিজাপুরের খা[illegible]হ্‌র বিপুল ঐশ্বর্য তার প্রয়োজন। এবং এই উদ্দেশ্যে সে অন্যায়ভাবে বিজাপুর আক্রমণ করবার পরিকল্পনা করেছে। আমি শাহ্‌-ইন্‌-শাহ্‌ বাদশাহ্‌র বান্দা, ওঁর হুকুমে আমি শাহী ফৌজের পরিচালনা করবো, কিন্তু এই অন্যায় যুদ্ধের প্রতি আমার কোনো নৈতিক সমর্থন থাকতে পারে না। আওরংজেবের এই

নীতি যাতে সফল না হয় সেজন্যে স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র বৈধ সন্তানের তখ্‌ত্‌-এ হাসিল হওয়া প্রয়োজন। আওরংজেব তার সন্ধান পেতে বসেছে। সন্ধান পেলে তাকে অবৈধ ভাবে কারারুদ্ধ করবে, হয়তো হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। তাই আমার মনে হোলো, স্বর্গীয় সুলতানের সন্তানকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। আমি যোদ্ধা, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মোকাবিলা করতে আমি কুণ্ঠিত হবো না, কিন্তু ছলনা চাতুরির দ্বারা তাঁকে কুক্ষিগত করা আমার ইজ্জতে বাধে। আমি চাই যে আওরংজেবের বিজাপুর আক্রমণ ব্যর্থ হোক, সে এই শিক্ষা পাক যে, জীবনের কোনো মহান উদ্দেশ্য কুটিলতা ও নীচতার দ্বারা সাধিত হয় না। সর্দার ইকবাল খাঁ, আপনার মেহ্‌মান জারির জন্যে আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, এবার আপনার অনুমতি পেলে আমি বিদায় গ্রহণ করতে পারি।”

মির খলিল চলে যাওয়ার পর শর্জা খাঁ একটু হাসলো। বললো, “আসল ব্যথাটা কোথায় বুঝতে পারছেন ইক্‌বাল খাঁ? আওরংজেব যে হীরাবাঈ নামে সেই তওআয়ফকে নিজের মহলে নিয়ে আসতে পেরেছিলো মির খলিলের হারেম থেকে, সে দুঃখ মির খলিল ভুলতে পারেনি। এর প্রতিশোধ সে এভাবেই নিতে চায়।”

“হ্যাঁ, আমি জানি,” ইকবাল খাঁ উত্তর দিলো, “সে সময় আমিও বুরহানপুরে ছিলাম।”

“যাই হোক,” বলে উঠলো ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌, “আশরফি দিয়ে কেনা যায় না এরকম মনসবদার মোগল রিয়াসতে এখন খুব বেশী নেই। মির খলিল তাদের মধ্যে একজন। নিজের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার মধ্যে ওঁর একটা মর্যাদাবোধ আছে। কোথায় সীমারেখা টানতে হয় উনি জানেন। তার জন্যে ওঁকে হাজার সেলাম।”

* * *

সেদিনই রাত্রিকালে ইয়ার ইসমাইল বেগ্ ফতিমা বিবিকে বললো, "আয়েশাবানু, ওসমানের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রেখে দাও। ওকে কালই বিজাপুর রওনা হতে হবে।"

"কালই!" বিস্মিত হোলো ফতিমা বিবি, "কখন?"

"সন্ধ্যার পর।"

"আর আমরা কখন যাবো হামিদ খাঁ?"

"সে আমি তোমায় জানিয়ে দেবো সময়মতো। হ্যাঁ, ওসমানকে এখন কিছু বোলো না। হয়তো আত্মসংবরণ করতে না পেরে বিদায় গ্রহণ করতে যাবে ইকবাল খাঁর কন্যার কাছে। এবং আওরংজেবের গুপ্তচরেরা আজকাল কড়া নজর রেখেছে ইকবাল খাঁর হাবেলির উপর।"

"ওসমান আমাদের সঙ্গে যেতে পারতো না?"

"না, আয়েশাবানু, হয়তো আওরংজেবের লোকেরা আমারও সন্ধান করবার চেষ্টা করছে।"

"সে কি।" রক্তহীন হোলো ফতিমা বিবির মুখমণ্ডল।

"হ্যাঁ আওরংজেব আমাদের সংবাদ কিছু কিছু পেয়েছে। সে তৎপর হয়ে উঠেছে আমার সন্ধান করবার জন্যে।"

"ওসমান সম্বন্ধে কিছু জানেনা তো?"

"সন্দেহ করে নিশ্চয়ই। সেজন্যেই কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবার আগেই ওকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে চাই।"

"তা হলে ওকে আর বাড়ি থেকে বেরোতে দেবো না—।"

"না, যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ওকে কিছু জানতে দিতে চাইনা। একদিনে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। ও প্রত্যেকদিন যেরকম শহরে তফরি করতে যায়, কালও তেমনি যাবে।"

"যদি কোনো বিপদ হয়?" আশঙ্কাজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো ফতিমা বিবি, "আমার কিন্তু ভয় করছে।"

"কোনো ভয় নেই। আমার লোক থাকবে দূর থেকে ওর উপর খবরদারি করবার জন্যে। মিনাজী ভোঁসলে নামে আমাদের একজন বিশ্বস্ত মারাঠী বন্ধুর উপর আমি এই কাজের ভার দিয়েছি। দ্বিপ্রহরে বাড়ি ফিরে ওসমান প্রত্যেকদিনকার মতো ভোজনের পর দিবানিদ্রা দেবে নির্ভাবনায়। ওর এই বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। কাল সারারাত ওকে অশ্বারোহণে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে। মোগল রাজ্যের সীমানা অতিক্রম না করা পর্যন্ত আর বিশ্রামের অবকাশ পাবে না। সন্ধ্যার পর আমি আসবো। তখন ওকে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হবে।"

দুজনে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর ইয়ার ইসমাইল বেগ্ বললো, "ওসমানের জীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন অধ্যায় এবার শুরু হবে আয়েশাবানু। এরই জন্যে ওকে এতদিন ধরে তৈরী করেছি। এরই জন্যে এতদিন আমরা অপেক্ষা করে বসেছিলাম। আঠারো উনিশ বছর বড় দীর্ঘ সময় আয়েশা, কিন্তু দেখতে দেখতে কেটে গেল।"

মিনাজী ভোঁসলের কাছে শিবাজীর নির্দেশ এসেছিলো, সে যেন ইয়ার ইসমাইল বেগকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করে, কারণ বিজাপুরের উজীর খাঁ-মহম্মদ এবং সেনানায়ক সর্দার আফজল খাঁর বিরোধী-দলভুক্ত সর্দারদের যে কোনো পরিকল্পনাতেই তাঁর সম্পূর্ণ নৈতিক সমর্থন আছে। এ সংবাদ পেয়ে উল্লসিত হয়েছিলো ইয়ার ইসমাইল বেগ্। রাজনৈতিক ব্যাপারে শিবাজীর সহকর্মীরা অত্যন্ত কূটনীতিপ্রিয় হলেও তাদের ব্যক্তিগত সততার উপর ইসমাইল বেগের আস্থা ছিলো। এজন্যে সে অকুণ্ঠিত চিত্তে মিনাজী ভোঁসলের উপর ভার দিয়েছিলো ওসমানকে নিরাপদে মোগল এলাকার ভিতর দিয়ে পার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে; এবং এই একটি দিন সে যে আওরঙ্গাবাদে আছে, এদিনও যেন সতর্ক দৃষ্টি

রাখে তার নিরাপত্তার প্রতি। ওসমানের কোনো পরিচয় ইসমাইল বেগ্ দেয়নি, শুধু বলেছিলো, ওসমান বেগ্ আমার পুত্রস্থানীয়, এখন থেকে মোগল সীমান্ত অতিক্রম করা পর্যন্ত ওর দায়িত্ব তোমার।

মিনাজী অনুমান করে নিলো ওসমানের আসল পরিচয়, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললো না।

সেই দিনের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার কিছু আগে সে উপনীত হয়েছিলো একটি পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে। এসে দেখে ইয়ার ইসমাইল বেগ্ এসে গেছে তার আগেই। কাছেই চওড়া সড়ক, বড়ো বড়ো হাবেলি মঞ্জিলের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে শহর কেন্দ্রের দিকে। ওরা দাঁড়িয়েছিলো একটি ঢিবিব আড়ালে। কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেলো এক সুদর্শন তরুণ প্রফুল্ল মুখে মন্থর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে।

মিনাজী তাকালো ইসমাইল বেগের দিকে। ইসমাইল বেগ্ মাথা নাড়লো।

ঢিবির পাশ কাটিয়ে পথ অতিক্রম করে চলে গেল ইয়ার ওসমান বেগ্। তাদের দেখতে পেলো না। ও খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর মিনাজী বললো, “আচ্ছা, ইসমাইল বেগ্। এবার আমিও ওঁর সঙ্গ নিই।”

ইসমাইল বেগ্ হাত বাড়িয়ে দিলো। মিনাজী চাপ দিলো ইসমাইল বেগের হাত ধরে।

“মিনাজী! ও যেন টের না পায়, কেউ যদি তোমায় চিনে ফেলে, তারাও যেন জানতে না পারে তুমি ওর উপর নজর রাখছো। আজকের দিন একটু ভাবনার, আর কোনো কারণে বিশেষ নয়, শুধু এই শহরে ওর শেষ দিন বলেই।”

“আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ওর কোনো বিপদ ঘটতে দেবো না।”

মিনাজী হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল। পথের প্রান্তে দুটি বিলীয়মান মানুষের দিকে তাকিয়ে রইলো ইয়ার ইসমাইল বেগ্।

চওকের বাজার অঞ্চলটা জনাকীর্ণ। ভিড়ের মধ্যে পথ করে নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে যাচ্ছিলো ইয়ার ওসমান বেগ্। কিছু তফাতে থেকে তার অনুসরণ করছিলো মিনাজী ভোঁসলে। ওসমান ভাবতেও পারেনি কেউ তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। তার মনে তখন অন্য ভাবনা। খবর পেয়েছে যে ইকবাল খাঁর কন্যা আরজুমান-আরা দু-এক দিনের মধ্যেই আওরঙ্গাবাদ পরিত্যাগ করবে। সে মনে মনে ভাবছিলো, কি করে ওর সঙ্গে আরেকবার দেখা করা যায়।

বাজারের মাঝখানে লতিফ মিঞার কাফিখানা। প্রত্যেক-দিনকার রেওয়াজ মতো সেদিনও সে কাফির সমাওয়ার নিয়ে বসলো সেখানে। মুসলমানের কাফিখানায় মিনাজী ভোঁসলে ঢুকতে পারেনা। সে একটু দূরে একটি আতরের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আতরের দাম যাচাই করতে লাগলো দোকানদারের সঙ্গে। হঠাৎ কি রকম যেন একটা অসোয়াস্তি বোধ করলো। আজন্ম সৈনিক সে, পর্বতে কন্দরে অরণ্যে ঘুরে বেরিয়েছে। মন বন্য পশুর মতো অত্যন্ত সজাগ। অস্বাভাবিক কোনো কিছু যেন শুঁকতে পারে সে। মন হঠাৎ অকারণে তটস্থ হয়ে উঠলো। সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকালো চারিদিকে। তারপর ঠিক ধরে ফেললো।

ওই তিনচারজন বিজাপুরী সিদ্দি বা হাবসীকে সে পথে আরো দু-এক জায়গায় দেখেছে। দু-তিনবার ওরা মিনাজীকে অতিক্রম করে গেছে। তখন কোনো সন্দেহ হয়নি। এখন দেখতে পেলো যে ওরা খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে ওসমানকে। মিনাজী আনমনে নিজের তরবারির বাঁট অনুভব করে আশ্বস্তবোধ করলো।

কাফি খেয়ে একটু পরে উঠে পড়লো ওসমান। ওর অনুসরণ

করলো সেই তিন চারজন সিদ্দি। একটু তফাতে থেকে মিনাক্ষী ভোঁসলেও চললো ওদের পেছন পেছন।

কেল্লার কাছাকাছি চওড়া সড়ক ধরে আনমনে হাঁটছিলো ইয়ার ওসমান বেগ্। হঠাৎ মনে হোলো কেউ যেন তার নাম ধরে ডাকছে। ফিরে তাকিয়ে দেখে পথের একপাশে দুটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে। তার উপর বসে আছে আকিল খাঁ আর শেখ মির।

আকিল খাঁ হাসি মুখে বললো, "কি খবর ওসমান! এত আন-মনা কেন? মাশুকের কথা ইয়াদ করছো বুঝি? পথ চলতে চলতে তোমায় দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কেল্লায় আমার কাছে তশরিফ আনবে কথা দিয়েছিলে, এলে না কেন? আমার বন্ধুদের কাছে তোমার গল্প করেছি। ওরা তোমায় দেখতে চায়।"

"বেশ, আসবো একদিন। কবে আসবো বলুন।"

শেখ মির বলে উঠলো, "ওসমান আজই আসতে পারে আমাদের সঙ্গে। কি বলো আকিল খাঁ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,—ওসমান, তুমি আসবে আমাদের সঙ্গে?"

"কোথায়?"

"কেল্লার ভিতরে?"

"কেল্লার ভিতরে!" ওসমান অবাক হোলো এই প্রস্তাব শুনে।

"হ্যাঁ। সেখানে রিসালার কুচকাওয়াজ হবে। খুদ শাহজাদা তদারক করতে আসছেন। এসো না। আমাদের সঙ্গে এলে বেশ ভালো করে দেখতে পাবে। সবাই তো যেতে পারবে না, আম-জনতার জন্যে এটা নয়। শুধু বড়ো বড়ো মনসবদারেরা দেখতে আসছে।"

"তা হলে আমি কি হিসেবে যাবো?" জিজ্ঞেস করলো ইয়ার ওসমান বেগ্।

"কেন? আমাদের বন্ধু হিসেবে যাবে।"

"কিন্তু যাবো কি করে? আমার তো ঘোড়া নেই।"

"ঘোড়া কি দরকার? কেল্লা তো কাছেই, আমরা হাঁটতে হাঁটতে যাবো। ঘোড়া তো আর কেল্লার ভিতরে নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

ওরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। ওসমান যোগ দিলো ওদের সঙ্গে। শেখ মির আর আকিল খাঁ ঘোড়ার জিন ধরে হাঁটতে লাগলো, তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললো ওসমান বেগ্। কিছুক্ষণের মধ্যে সামনে দেখা গেল কেল্লার দরওয়াজা। ওরা ভে র ঢুকতে দুজন সইস এসে ঘোড়া দুটোর লাগাম ধরে নিয়ে গেল অন্য দিকে। আকিল খাঁ আর শেখ মিরের সঙ্গে ওসমান বেগ্ ঢুকে গেল কেল্লার ভিতরে।

বিস্মিত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লো সেই তিন চারজন সিদ্দি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো মিনাজী ভোঁসলেও। এরকম পরিস্থিতির জন্যে সে প্রস্তুত ছিলো না। আকিল খাঁ আর শেখ মিরের মুখ সে চিনতো। তাদের সঙ্গে ওসমানের পরিচয় থাকবে, তাদের সঙ্গে সে কেল্লায় প্রবেশ করবে, একথা সে কল্পনা করতে পারেনি। ওসমান কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করায় সে একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হোলো, কারণ যতক্ষণ সে বেরিয়ে না আসছে, ততক্ষণ সে মিনাজীর চোখের আড়াল হয়ে রইলো,—এবং বিনা দস্তকে মিনাজীর পক্ষে কেল্লার ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। যতক্ষণ ওসমান বেরিয়ে না আসে ততক্ষণ তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে যদি কোনো প্রয়োজন হয়, কোনোরকম সাহায্য করতে পারবে না মিনাজী।

নিরুপায় হয়ে সে বাইরেই ঘুরে বেড়াতে লাগলো, কেল্লার দরওয়াজার উপর নজর রেখে। লক্ষ্য করতে লাগলো সেই তিন চারজন সিদ্দিকেও। ওরা প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এলো। সরে গেল দু-একজনের ভারী সূতির কাবা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিনাক্ষী লক্ষ্য করলো, প্রত্যেকেরই জামার উপর রঙীন কোমরবন্ধে গোঁজা রয়েছে একটি হ্রস্ব চওড়া তরবারি।

কেল্লার ভিতরে সরকারী কাছারি দফতর সবগুলো। সেগুলো পেরিয়ে গেলে একটি প্রশস্ত ময়দান। তার ওপাশে একটি প্রশস্ত মর্মরবাঁধানো প্রাঙ্গন। রোজ স্থবাদারের আম-দরবার বসে সেখানে। তারপরই আবার উঁচু পাঁচিল, একপাশে একটি প্রশস্ত ফটক। তার ভেতরে শাহজাদার মহল। সেখানে পাহারা দিচ্ছে শাহজাদার খাস চৌকি।

সেদিন কেল্লার ভিতরে খুব জনসমাগম। নানা রঙের কাবা জামাই পরে, মাথায় রঙিন পাগ্ এঁটে, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে সেখানে এসে জমায়েত হয়েছে আওরঙ্গাবাদের মোগল মনসবদারেরা। আওরঙ্গাবাদ আগ্রা থেকে অনেক দূর, রাজধানীর বিভিন্ন আনন্দ উৎসবের সমারোহ উপভোগ করবার অবকাশ এখানে হয়না, যেটুকুও বা হবার উপলক্ষ হয়, শাহজাদা আওরংজেবের রক্ষণশীলতা ও মিতব্যয়িতার জন্যে জাঁকজমকপূর্ণ হয় না,—যদি না সেই জাঁক-জমকের কোনো রাজনৈতিক প্রয়োজন থাকে। স্থতরাং যে কোনো উপলক্ষেই একটা সামাজিক মিলনের পরিবেশ গড়ে ওঠে এই প্রত্যন্ত দেশীয় শহরে। সাধারণ লোকের সঙ্গে মুষ্টিমেয় অভিজাতবর্গের কোনো যোগাযোগ নেই, প্রান্তীয় শহরের পরিমিত আভিজাত্যে ওরা সামাজিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এইটুকু গণ্ডির মধ্যে ওদের ঈর্ষা বিদ্বেষ দ্বন্দ্বসংঘাত উচ্চাকাঙ্ক্ষা গর্ব দম্ভ সবই অপরিমিত, এই সব কিছু মিলিয়ে শ্রেণী-সচেতনতার বৈশিষ্ট্যে ওরা একসূত্রে বাঁধা।

সেদিনের উপলক্ষ শুধু এই যে, শাহজাদা রিসালার কুচকাওয়াজ

পরিদর্শন করবেন। শুধু এই উপলক্ষেই কেল্লার ভেতর একটা ছোটোখাটো উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ যে আসন্ন, তার গাম্ভীর্য পরিলক্ষিত হোলো না কোথাও। মনসবদারদের সবারই উৎসবের বেশ, খাদিমরা অভ্যাগতদের গায়ে আতর ছিটিয়ে দিচ্ছে, রুপোর তশতরীভরা রেশমী সূতোয় বাঁধা সুগন্ধী জয়সওয়ার গিলোরী অর্থাৎ পান নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। ময়দানের এক প্রান্তে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে জমকালো পোশাক পরা একদল বারগির বা অশ্বারোহী সেনা। সবারই গাঢ় হলদে পোশাক, কোমরে বেগুনী কমরবন্দ, মাথায় লাল উষ্ণীষ, হাতে দীর্ঘ বর্শা। তাদের পুরোভাগে একটি দীর্ঘকায় বাদামীরঙের আরবী ঘোড়ার উপর বসে আছে সাফ শিকান খাঁ। অশ্বারোহী সেনাবাহিনী বা রিসালার মির বকশির পদে তাকেই নিযুক্ত করা হয়েছে সম্প্রতি।

ঘোড়াগুলি চঞ্চল, একজায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলো না কিছুতেই। অশ্বারোহীদের তৎপর থাকতে হচ্ছিলো ওদের সামলে রাখবার জন্যে। ঘণঘন অস্থির হয়ে মাটিতে পা ঠুকছিলো ঘোড়াগুলো।

ইয়ার ওসমান বেগ্ নিজে অশ্বারোহণপ্রিয়, বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো সেদিকে।

আকিল খাঁ বললো, "সব বাছা আরবী ঘোড়া, সম্প্রতি আনানো হয়েছে মালব থেকে, বিজাপুরের যুদ্ধে নিয়োজিত করা হবে এদের।"

একটু দূরে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। একটি ঘোড়া বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছে, পেছনের দুটো পা শূন্যে তুলে ছুঁড়ছে বারবার। মাঝে মাঝে সামনের পা দুটো তুলে দাঁড়িয়ে পড়ছে পেছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারছে না কিছুতেই। তার উপর আরূঢ় বার্গির অতিকষ্টে সামলে নিচ্ছে তাকে।

"ওসমান, তুমি এখানে শেখ মিরের সঙ্গেই থাকো, আজ ওর কোনো কাজ নেই," বললেন আকিল খাঁ, "আমাকে শাহজাদার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে, উনি এখানে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।"

আকিল খাঁ ওসমানকে শেখ মিরের কাছে রেখে এগিয়ে চলে গেল ময়দানের অন্য প্রান্তের দরওয়াজার দিকে, যেখানে পাহারা দিচ্ছে শাহজাদার খাস চৌকি। সেখানে আরো কয়েকজন হোমরা চোমরা ব্যক্তিকে দেখা গেল।

"ওই যে দেখছো, একটু স্থূলকায় লোকটিকে, উনি হচ্ছেন দিওয়ান মুরশিদ কুলি খাঁ খোরাসানী, দেখিয়ে দিলো শেখ মির, "ওর ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন শাহী ফৌজের মির বকশি মহবত খাঁ। যে লোকটিকে অভিবাদন করলো আকিল খাঁ, উনি শাহজাদার মাতৃস্বষা সলিহাবানুর স্বামী খাঁ-ই-জামান মির খলিল, গোলন্দাজ বাহিনীর মির আতশ। ওই যে দুজন রাজপুত যোদ্ধাকে দেখছো, ওঁদের এক জন হলেন হাডার রাও ছত্রসাল। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন রাজা রায়সিং সিসোদিয়া।"

হঠাৎ নাকাড়াধ্বনি শোনা গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল চারদিকের সবাই, থেমে গেল মনসবদারদের গুঞ্জরণ।

"শাহজাদা আসছেন," নিচু গলায় বললো শেখ মির।

দরওয়াজা দিয়ে বেরিয়ে এলো জমকালো পোশাক পরা একজন গুর্‌জবরদার। ময়দানের উপর দিয়ে পরিষ্কার ভেসে এলো উচ্চ কণ্ঠের ঘোষণা, "বা আদব বা মুলায়জা হুস্‌য়ার……"

দীর্ঘ কেতাদুরস্ত আগমনবার্তা সমাপ্ত হতে দেখা গেল শাহজাদা আওরংজেবের তাঞ্জাম। দরওয়াজায় সমবেত রাজপুরুষেরা আনত হয়ে তসলিম জানালো।

তাঞ্জাম এগিয়ে এলো আস্তে আস্তে। তাঞ্জামের পেছন পেছন পদব্রজে এগিয়ে এলো মুরশিদ কুলি খাঁ, আকিল খাঁ, মহবত খাঁ,

মির খলিল ও অন্য সবাই। ময়দানের এদিকে অভ্যাগতদের শাম্ আনাহ্র কাছাকাছি আসতে সমাগত মনসবদার ও অন্যান্য অভ্যাগতেরা সামনে ঝুঁকে পড়ে তসলিম জানালো। তাঞ্জাম এগিয়ে গেল ময়দানের মাঝখানে।

আবার শোনা গেল নাকাড়া ধ্বনি। দূরের প্রাচীরের দিকে ফিরে মনসবদারেরা তসলিম জানালো। প্রাচীরের উপরে বুর্জ্এ জাফরির আড়ালে উপনীত হয়েছেন আওরংজেবের পত্নী কন্যা এবং মহলের অন্যান্য মহিলারা।

প্রাচীরের অন্য প্রান্তে একটি দরওয়াজা খুলে গেল। অশ্বারোহী বাহিনীর এক দীর্ঘ মিছিল সেখান থেকে বেরিয়ে ময়দান পরিভ্রমণ করে আবার ফিরে গেল অন্যদিকের আরেকটি দরওয়াজা দিয়ে। কেটে গেল দীর্ঘ সময়, কেউ টেরই পেলো না।

মুরশিদ কুলি খাঁর দিকে ফিরে শাহজাদা মাথা নেড়ে কি যেন বললো। মুরশিদ কুলি খাঁ গুর্জ্বরদারের দিকে ফিরে শাহজাদার কথার পুণরাবৃত্তি করলো। গুর্জ্বরদার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো, "রিসালার কুচকাওয়াজ দেখে শাহজাদা অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন। ওঁর ধারণা দাক্ষিণাত্যে এমন কোনো ফৌজ নেই যে এই রিসালার আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে।"

"কেরামত, কেরামত,—" সায় দিয়ে বলে উঠলো অভ্যাগতেরা।

ময়দানের মাঝখানে সাফ শিকান খাঁর নেতৃত্বে যে অশ্বারোহী বারগিরেরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, এবার তাদের পরিদর্শন করা হবে। আওরংজেব তাঞ্জাম থেকে উঠে এলো। একজন সইস কাছে নিয়ে এলো একটি শুভ্র আরবী ঘোড়া। তাতে চড়ে বসলো আওরংজেব। অত্যন্ত সুপটু অশ্বারোহীর সচ্ছন্দ ভঙ্গিতে আওরংজেব অশ্বচালনা করে একলা এগিয়ে এলো।

এদিকটায় এককোণে অন্য অভ্যাগতদের থেকে একটু দূর শেখ মিরের সঙ্গে একলা দাঁড়িয়ে ছিলো ওসমান বেগ্। সে বার বার

লক্ষ্য করলো সেই বারগিরকে, যার অশ্ব অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠছিলো ঘন ঘন।

"ঘোড়াটিকে ও সামলাতে পারছেনা কেন," বলে উঠলো ওসমান।

"অত্যন্ত বেয়াড়া ঘোড়া," উত্তর দিলো শেখ মির।

"ওকে [illegible]তে আমার বেশিক্ষণ লাগতো না।"

সেই ঘোড়া হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লো তার নিজস্ব জায়গা থেকে। বারগির তাকে সামলাতে পারলো না। ঘোড়াটি ছুটতে ছুটতে চলে গেল ময়দানের অন্যপ্রান্তে। সেখানে যেন নিজের চঞ্চল ছায়াটিকে দেখে আরো চঞ্চল হয়ে উঠলো সেই উদ্ধত অশ্ব। সবার দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ। শাহজাদার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হোলো ঈষৎ বিরক্তিতে।

ঘোড়াটি হঠাৎ গতি পরিবর্ত্তন করে এদিকে ছুটে এলো। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই এসে গেল আওরংজেবের অশ্বের কাছাকাছি। আকিল খাঁ এবং আরো দুতিনজন মনসবদার ছুটে এলো এদিকে। কিন্তু ওরা এসে পড়ায় আগেই অ[illegible]ত সেই বারগির প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো আওরংজেবের উপর। আওরংজেব অত্যন্ত সুদক্ষ সওয়ার। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বের রাশ টেনে সরে গেল একপাশে। কিন্তু সবাই স্তম্ভিত হয়ে দেখলো সেই বারগির অকস্মাৎ আওরংজেবের দিকে উদ্যত করেছে তার বর্শা। ইস্পাতের তীক্ষ্ণ ফলা পূর্বাহ্ন সূর্যের তীক্ষ্ণকিরণ সম্পাতে ঝকমক করে উঠলো। এক আশঙ্কা ও ভীতির চাপা আওয়াজ বেরিয়ে এলো সবার মুখ থেকে।

হঠাৎ একটি রৌদ্ররশ্মি প্রতিফলনের ক্ষুদ্র দ্যুতি বিদ্যুতগতিতে ছুটে গেল সেদিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বারগির হঠাৎ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে স্খলিত হয়ে ভূপাতিত হলো। তার শিথিল হাত থেকে খসে পড়লো উদ্যত বর্শা। আরোহীবিহীন অশ্ব ছুটতে ছুটতে চলে গেল ময়দানের অন্যপ্রান্তে।

ছুটে এলো অনেকে। অজ্ঞাত পরিচয় বারগির বক্ষদেশ থেকে বেরিয়ে আছে একটি ছোরার বাঁট। রক্তে ভিজে গেছে তার হলদে জামাহ্। প্রাণহীন চোখ ছুটো উল্টে শূণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

কয়েকজন খাদিম এসে নিহত বারগিরের দেহ তুলে নিয়ে চলে গেল।

আওরংজেব ফিরে তাকালো এদিকে। সবার সপ্রশংস দৃষ্টি ওসমানের উপর নিবদ্ধ। সে নিজে নিরস্ত্র। কিন্তু শাহজাদার জীবন সংশয় দেখে সে চোখের পলকে শেখ মিরের কমরবন্ধের খাপ থেকে ছোরা বার করে নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিলো সেই বারগিরের দিকে। তার লক্ষ্য অব্যর্থ।

"কে এই ব্যক্তি," আওরংজেব মুরশিদ কুলি খাঁর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "তাকে আমার সমক্ষে উপনীত করা হোক।"

মুরশিদ কুলি খাঁর ইসারা পেয়ে শেখ মির আর আকিল খাঁ ওসমানকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো আওরংজেবের কাছে। ওসমান আনত হয়ে তসলিম জানালো শ্রদ্ধার সঙ্গে।

আওরংজেব আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো ওসমানকে। তার সৌম্য সুদর্শন আভিজাত্য মণ্ডিত চেহারা দেখে যেন প্রীতই হোলো। মুরশিদ কুলি খাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "এ কে? আমি তো একে আগে কোনোদিন দেখিনি—।"

"আমি আওরঙ্গাবাদে এসেছি অল্পদিন," উত্তর দিলো ওসমান।

আওরংজেব একটু বিস্মিত হলো। কেল্লার এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অভ্যাগত ও মনসবদারদের ছাড়া আর কারো উপস্থিত থাকবার কথা নয়। নতুন মনসবদার যারা আওরঙ্গাবাদে আসে, তাদের প্রত্যেককে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শাহজাদার দরবারে হাজির হতে হয়। এ নিশ্চয়ই মনসবদার নয়।

"একে এখানে কে এনেছে?" জিজ্ঞেস করলো শাহজাদা।

প্রকাশ্য স্থানে অনুষ্ঠানিক কোনো উপলক্ষে দিওয়ান ছাড়া আর কারো সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলা শাহী খানদানের রেওয়াজ নয়। এর ব্যতিক্রম চলে শুধু সমপদস্থের সঙ্গে। তাই প্রশ্ন করা হয় দিওয়ানের মারফতে।

আকিল খাঁ উত্তর দিলো, "আলিজা, এ আমার আর শেখ মিরের বন্ধু। আমরাই একে এখানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি।"

"বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত লোকই বটে," সপ্রশংস কণ্ঠে আওরংজেব বললো, "কিন্তু আকিল খাঁ, শেখ মিরের এই বন্ধুর খবর আমি আগে কোনোদিন পাইনি কেন?"

"আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে অল্পদিন," আকিল খাঁ উত্তর দিলো, "সাফ শিকান খাঁর সঙ্গে এর একদিন অসিযুদ্ধ হয়েছিলো। এ সাফ শিকান খাঁর তলোয়ার হস্তচ্যুত করে ফেলে কয়েক নিমেষের মধ্যেই। আলিজা সে সংবাদ পেয়েছিলেন, এ সংবাদ অনেকের কৌতূহলের উদ্রেক করেছিলো।"

মাথা নাড়লো আওরংজেব। তাকালো ওসমানের দিকে। মুরশিদ কুলি খাঁকে বললো, "এর মতো যোদ্ধা আমার ফৌজে যোগদান করবে না কেন?"

"আপনার অনুগ্রহ লাভ করলে নিশ্চয়ই যোগদান করবে আলিজা," বলে উঠলো মুরশিদ কুলি খাঁ।

"আমি এর নাম জানতে ইচ্ছে করি মুরশিদ কুলি খাঁ।"

"এই দীন বান্দার নাম," ওসমান উত্তর দিলো, "ইয়ার ওসমান বেগ্।"

আওরংজেব হঠাৎ চক্ষু মুদিত করলো। তারপর তাকালো ওসমানের দিকে। আস্তে আস্তে বললো, "ইয়ার—ওসমান বেগ? ইয়ার ইসমাইল বেগ্ তোমার কিছু হয়?"

শাহজাদা ওসমানকে সোজাসুজি প্রশ্ন করছেন দেখে যতোনা বিস্মিত হোলো সবাই, আরো বিস্মিত হোলো শাহজাদার প্রশ্ন শুনে

ইয়ার ইসমাইল বেগ্? কালই তো মজলিসে ওর প্রসঙ্গ তুলেছিলো আওরংজেব। মুরশিদ কুলি খাঁ, মহবত খাঁ, আকিল খাঁ, মির খলিল, শেখ মির সবাই সাগ্রহে তাকালো ওসমানের দিকে।

ওসমানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। শাহজাদা তাহলে চেনেন তার পিতাকে! সরল আনন্দে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, আলিজা, ইয়ার ইসমাইল বেগ্ আমার ওয়ালিদ্।"

ইসমাইল বেগ্ এর পিতা! শেখ মির আর আকিল খাঁ তাকালো পরস্পরের দিকে। ইসমাইল বেগ্ তো সেই নিখোঁজ সর্দার হামিদ খাঁ, এ কথাই তো শুনেছে আওরংজেবের কাছে। সে আওরঙ্গাবাদে এসেছে অল্পদিন, স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র তথাকথিত বৈধ সন্তান ইসমাইল বেগেরই পুত্র বলে পরিচয় দেওয়া হোতো আগ্রায়,—এখবর সবই এসেছে আগ্রা থেকে।

তাহলে এই ওসমানই কি······! বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলো আকিল খাঁর সারা মুখে। কী ভাগ্য আওরংজেবের! একে খুঁজে বেড়াচ্ছে এত বছর ধরে, আর সে নিজে এসে উপস্থিত হোলো শাহজাদার সমক্ষে, প্রাণ বাঁচালো শাহজাদার। কিন্তু—কিন্তু একে নিজের মুঠোর মধ্যে পেয়ে কি ছেড়ে দেবে আওরংজেব? যদিও সে শাহজাদার প্রাণ বাঁচিয়েছে, কিন্তু শাহজাদা কি ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাকে স্থান দেবেন রাজনীতির উপরে? আকিল খাঁ চিনতো আওরংজেবকে, ভয়ে তার বুক কেঁপে গেল। ওসমানকে সে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে, ভাবনা হোলো তার জন্যে।

সে তাকিয়ে দেখলো শেখ মিরের দিকে। তারও সারা মুখে ঘাম দেখা দিয়েছে। আকিল খাঁ বুঝলো, তার মনের ভাবনাও আকিল খাঁরই অনুরূপ। অন্য সবার দিকে তাকালো আকিল খাঁ। মুরশিদ কুলি খাঁর চোখে গভীর কৌতূহল, কিন্তু মুখ ভাবলেশহীন। মির খলিলের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত। মহবত খাঁ হাতদুটো পেছনে সংবদ্ধ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে ওসমানকে।

আওরংজেবের মুখের ভাব খুব স্নিগ্ধ, প্রশান্ত। আস্তে আস্তে বললো, "ওসমান, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছো। আমি তার জন্যে খোদার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

বাঃ!—চমৎকার—! আওরংজেবের কথা শুনে ভাবলো আকিল খাঁ।

"তোমার প্রতিও আমি প্রসন্ন," বলে গেল আওরংজেব, "কাল প্রকাশ্য আম-দরবারে তোমায় সরোপা ও খেলাত দেওয়া হবে। আমি চাই যে তোমার ওয়ালিদ ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌ও দরবারে হাজির থাকে। তোমার ওয়ালিদাও কি এই শহরেই আছেন?"

"হ্যাঁ আলিজা।"

অর্ধনিমীলিত নেত্রে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো আওরংজেব।

একজন খাদিমান এসে উপস্থিত হোলো। সে এসেছে প্রাচীরের বুরজএর ওদিক থেকে। মুরশিদ কুলি খাঁ আওরংজেবকে জানালো যে, এই যুবাপুরুষ শাহজাদার প্রাণরক্ষা করেছেন বলে শাহজাদার দুইকন্যা এর জন্যে মুক্তাহার পাঠিয়েছেন নিজেদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং একে এখানে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন বলে এর বন্ধু আকিল খাঁ ও শেখ মিরের জন্যে দুটি মুক্তার পাগ্‌-বন্দ পাঠিয়েছেন। আলিজার হুকুম হলে সেগুলো তাঁদের হাতে অর্পণ করা হোক।

মাথা নাড়লো আওরংজেব। রাজকন্যাদের প্রেরিত উপহার গ্রহণ করলো ওসমান, আকিল খাঁ ও শেখ মির।

আওরংজেব মুরশিদ কুলি খাঁকে বললো, "ওই বারগিরকে কেউ নিয়োজিত করেছিলো আমাকে হত্যা করবার জন্যে। সে সম্বন্ধে বিশদ তদন্ত করা হোক। শুনছি আমাদের শত্রুরা গুপ্তচর পাঠিয়েছে আওরঙ্গাবাদে। ওদের অবিলম্বে কয়েদ করা প্রয়োজন। ওরাই এই ষড়যন্ত্রের রহস্য ভেদ করতে পারবে।"

তারপর ওসমানের দিকে ফিরে বললো, "আমি আশা করি

কাল তুমি এবং তোমার ওয়ালিদ আম-দরবারে হাজির হবে সর্ব সমক্ষে সম্মানিত হবাব জন্যে। আমি ইতিমধ্যে বিবেচনা করে দেখবো তোমায় যথাযোগ্য মনসব দেওয়ার জন্যে শাহ্-ইন-শাহ্ বাদশাহ্‌র কাছে সুপারিশ করা যায় কিনা।"

ইয়ার ওসমান বেগ্ তসলিম করলো।

"আকিল খাঁ," বললো আওরংজেব, "ইতিমধ্যে আমার ব্যক্তিগত উপহারস্বরূপ ওসমানকে একটি সুসজ্জিত অশ্ব দেওয়া হোক, সে সেই অশ্বে আরোহন করে গৃহে প্রত্যাগমন করবে। তুমি তার সঙ্গে গিয়ে তাকে তার গৃহে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌কে নিজের মুখে জানাবে তার এবং তার এই পুত্রের প্রতি আমার অনুগ্রহের কথা।"

আকিল খাঁ আর ওসমান তসলিম করে চলে গেল। তাদের সঙ্গে গেল শেখ মিরও। ওরা দৃষ্টির অন্তরাল হওয়ায় পর মুরশিদ কুলি খাঁকে কাছে ডেকে বললো, "মেহের উদ্দিন খাঁকে পঁচিশজন সিলাহ্‌দারের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও ওদের অনুসরণ করতে। ওসমান তার গৃহে প্রবেশ করবার পর ওরা গৃহ ঘেরাও করে ফেলবে। পঁচিশজন নয়, পঞ্চাশজন পাঠাও। হামিদ খাঁ খুব সুদক্ষ যোদ্ধা। ওসমানও তলোয়ার চালাতে শিখেছে। ওদের কয়েকজন সশস্ত্র অনুচরও যে নেই, সে কথা আমার মনে হয় না। হামিদ খাঁ, সেই খাদিমান আয়েশা বানু, আর এই ওসমানকে আমি জীবন্ত চাই, অক্ষত দেহে চাই।"

"ওসমানকে এখানে আটকে রাখলে হোতো না?" জিজ্ঞেস করলো মুরশিদ কুলি খাঁ।

"না। তাহলে হামিদ খাঁ আর আয়েশা বানুকে ধরা যাবে না। তাছাড়া ওসমান আকিল খাঁ আর শেখ মিরের মেহ্‌মান হয়ে এখানে এসেছে। ওকে এখানে আটক করলে ওরা দুজন খুশী হোতো না।—বিলম্ব কোরো না মুরশিদ কুলি খাঁ। পাঠিয়ে দাও মেহের

খাঁকে। ওদের তিনজনকে আমার আজই চাই। আমার প্রতি খোদার অসীম কৃপা।"

প্রায় তিন ঘড়ি সময় ধরে অপেক্ষা করছিলো মিনাজী ভোঁসলে। অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে উঠেছিলো সে। হঠাৎ একসময় দেখলো কেল্লার দরওয়াজা দিয়ে তিনটি ঘোড়ার উপর চেপে বেরিয়ে আসছে ওসমান, আকিল খাঁ আর শেখ মির। ওসমানকে অশ্বোপবিষ্ট দেখে মিনাজী বিস্মিত হোলো। অত্যন্ত রহস্যময় মনে হোলো সমস্ত ব্যাপার। কেল্লার বাইরে এসে শেখ মির অন্য দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। এরা দুজনে ঘোড়া ছুটিয়ে চললো শহরতলির উদ্দেশে।

বিজাপুরী সিদ্দিরা যেখানে অপেক্ষা করছিলো, সেদিকে তাকিয়ে দেখলো মিনাজী ভোঁসলে। কেল্লার ভিতর থেকে একটি লোক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে এগিয়ে গেল তাদের কাছে। তাকে দেখে মনে হোলো সে যেন খুব উত্তেজিত হয়ে আছে। ও এসে এদের নিচুগলায় কি যেন বললো। কিছুক্ষণ সলা-পরামর্শ হোলো তাদের মধ্যে। একজন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো যেদিকে গেছে আকিল খাঁ ও ওসমান। একটু পরে ওরা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে হেঁটে গিয়ে মিশে গেল বাজারের লোকজনের ভিড়ের মধ্যে।

মিনাজীর একটু ভাবনা হোলো। আর সময় নষ্ট না করে এখন ওর ওসমানের অনুসরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু ওরা গেছে অশ্বারোহনে। পদব্রজে গিয়ে ওদের ধরতে পারবে না মিনাজী। এসময় একটি অশ্বের প্রয়োজন।

কি করা যায়?—ভাবতে লাগলো মিনাজী ভোঁসলে। হঠাৎ অনেকগুলো অশ্বের পদধ্বনি শুনে ফিরে তাকালো। কেল্লা থেকে বেরিয়ে আসছে অনেকগুলি সশস্ত্র ঘোড় সওয়ার। ওরা ঘোড়া

ছুটিয়ে চলে গেল যে পথ ধরে আকিল খাঁ আর ওসমান ছুটে গেল সেদিকে।

একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ভরে উঠলো মিনাজীর মন। মনে হোলো, এ সময় ওসমানের কাছাকাছি তার থাকা প্রয়োজন,—কিন্তু ঘোড়া না পেলে যাবে কি করে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখলো একজন মোগল সিলাহদার পথের পাশে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ওধারে একটি কুপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় তৃষ্ণার্ত সে, ওদিকে যাচ্ছে জল খেতে।

মিনাজী মারাঠা যোদ্ধা। প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুযায়ী নীতিবোধের হিসেব করে সে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল আরোহীবিহীন অশ্বের দিকে।

খাঁ-সাহেব পরিতৃপ্তির সঙ্গে জল পান করছিলো একটি লোটা থেকে। হঠাৎ দ্রুতধাবমান অশ্বক্ষুরের শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো। বেশী লোকজন কাছাকাছি ছিলো না। যারা ছিলো ওরা কিছু বুঝে উঠবার আগেই মিনাজী ভোঁসলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল অনেক দূর। সোজা পথ ধরলো না সে। খানিক এগিয়ে একটি বিস্তৃত ময়দান। তার উপর দিয়ে ছুটে চললো সে। এদিক দিয়ে পথ অনেক সংক্ষিপ্ত। হওজ অঞ্চলের কাছাকাছি গিয়ে ধরা যাবে আকিল খাঁ ও ওসমানকে। মোগল সিলাহ্দারেরা ওদের কাছে পৌঁছানোর অনেক আগেই ওদের ধরে ফেলা যাবে।

আস্তে আস্তে ঘোড়া ছুটিয়ে চলছিলো আকিল খাঁ ও ওসমান। ওসমানের মন খুশিতে ভরপুর। স্বয়ং আওরংজেব তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন, কে জানে হয়তো এখন থেকে তার ভাগ্যের মোড় ফিরলো। নিষ্কর্মা থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, তার মন ব্যাকুল হয়ে চাইছিলো কর্মব্যস্ততা। তার অনেক দিনের স্বপ্ন

মোগল ফৌজে মনসব পাওয়া। এ স্বপ্ন যে এভাবে এত তাড়াতাড়ি সফল হতে যাবে কে ভাবতে পেরেছিলো? মনসব পেলে আরজুমান-আরাকে বিয়ে করতে আর কোনো বাধা থাকবে না। আরজুমান-আরাকে ওর পিতা বিজাপুর পাঠিয়ে দেওয়ার আগেই হয়তো সে উপস্থিত হতে পারবে ইকবাল খাঁর সামনে।

কিন্তু মোগল ফৌজের মনসবদারকে কি কন্যা দান করবে বিজাপুর দরবারের সর্দার ইকবাল খাঁ? বিশেষ করে, যখন মোগল ফৌজের বিজাপুর অভিযান আসন্ন? মনসব পেলে ওসমান নিজেই হয়তো যোগ দেবে সেই অভিযানে।

শাহজাদা আওরংজেবকে অত্যন্ত মেহেরবান মনে হচ্ছিলো ওসমানের। কি আর এমন করেছে সে, শুধু একজন আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করেছে শাহজাদাকে। রাজ্যের যে কোনো প্রজার এটা কর্ত্তব্য।—আর এরই জন্যে আওরংজেব তাকে দিতে যাচ্ছে সরোপা, খিলাত, মনসব? স্বয়ং শাহজাদার কন্যারা পাঠিয়ে দিয়েছে মুক্তাহার!—বলতে বলতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ওসমান। লক্ষ্য করলো না যে আকিল খাঁ নীরবে শুনে যাচ্ছে গম্ভীর চিন্তাকুল মুখে।

"শাহজাদার কি কিছুই অজানা থাকে না," বলে গেল ওসমান বেগ্, "আমার ওয়ালিদ ইয়ার ইসমাইল বেগ্এর মতো নগণ্য ব্যক্তির খবরও তিনি রাখেন।"

"ওসমান!"

আকিল খাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে ওসমান ফিরে তাকালো, বিস্মিত হোলো তার অন্ধকার মুখ দেখে।

"ওসমান, দক্কান সুবার মোগল সুবাদার শাহজাদা আওরংজেবও যখন তোমার ওয়ালিদ ইয়ার ইসমাইল বেগ্এর খবর রাখেন, তখন তিনি কি সত্যিই খুব নগণ্য লোক?" জিজ্ঞেস করলো আকিল খাঁ, "ওঁর খবর রাখার কোনো রাজনৈতিক প্রয়োজন না থাকলে কি শাহজাদা ওঁর খবর রাখতেন?"

ওসমান স্তম্ভিত হোলো। নিবিড় অন্ধকারে বিদ্যুৎশিখার মতো হঠাৎ চমকে উঠলো উপলব্ধির দীপ্তি। ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌কে কোনো একটা গোপন রাজনৈতিক প্রয়োজনে দক্ষিণে পাঠিয়েছেন শাহ্‌-ই-আলিজা দারা শিকো। সেটা কি, ওসমানের জানা না থাকলেও সে কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে ওর কোনো সন্দেহ ছিলো না। ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌ যে একাজের প্রয়োজনে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে চাইতো, সে কথাও জানতো ওসমান। কিন্তু শাহজাদার সামনে কি করে সে বিস্মৃত হয়েছিলো একথা? শাহজাদা ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌এর নাম উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে ওসমানের সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু উত্তেজনার উল্লাসের আতিশয্যে এবং নিজের বাহাদুরির তারিফ শুনে বুঝি তার মাথা ঘুরে গিয়েছিলো! হঠাৎ ক্রোধে, ক্ষোভে এবং অনুশোচনায় তার মুখমণ্ডল ঝড়ের আকাশের মতো হয়ে গেল।

আকিল খাঁ বুঝলো তার মনের কথা। কোমল কণ্ঠে বললো, "বিচলিত হোয়ো না ওসমান। ভুল সবারই হয়। তোমার বয়েস কম। ওই পরিবেশে তোমার বিচারবুদ্ধি যে হারিয়ে ফেলেছিলে ক্ষনিকের জন্যে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু ওসমান, তুমি কি কিছুই জানো না?"

"কি বিষয়ে?"

আকিল খাঁ একটু চুপ করে রইলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, তুমি সর্দার হামিদ খাঁর নাম শুনেছো?"

"হামিদ খাঁ!" ভ্রুকুঞ্চিত করে একটু ভাবলো ওসমান, "হামিদ খাঁ? আমি এ নাম আগেও একবার শুনেছি।"

"কার কাছে?"

"আমায় মাপ করো বন্ধু, আমি সে কথা বলতে পারবো না।"

"আমি বলবো?" আকিল খাঁ একটু হাসলো।

"তুমি!"

"আগ্রায় হয়তো ছোটী বেগম সাহিবার কাছে শুনেছো।"

স্তম্ভিত হয়ে আকিল খাঁর দিকে তাকিয়ে ওসমান ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো।

তুমি—তুমি কি করে জানো?

"আমরা সবাই জানি। তোমার পরিচয় আমাদের কাছে কিছুই গোপন নেই। কিন্তু, তুমি চেনো না হামিদ খাঁকে?"

"না তো। কে এই হামিদ খাঁ?"

আকিল খাঁও ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। একটু চুপ করে থেকে বললো, "বেশ বুঝতে পারছি, তোমায় এখনো কিছু জানানো হয়নি। তোমায় একথা জানানোর অধিকার যাঁর আছে, সময় হলে তিনিই তোমায় একথা জানাবেন বন্ধু, আমার সে অধিকার নেই।"

কি যেন ভাবছিলো ওসমান, সে বলে উঠলো, "বুঝতে পারছিনা, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।"

"আয়েশাবান্নুর নামও তুমি নিশ্চয়ই কোনোদিন শোনো নি, ওসমান?"

"আয়েশাবান্নু!" তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলো ওসমান বেগ্। মনে পড়লো নিভৃতে ইসমাইল বেগ্ তার জননী ফতিমাকে আয়েশা বলে সম্বোধন করতে সে শুনেছে। আস্তে আস্তে বললো আনমনা হয়ে, "হ্যাঁ, এ নাম আমি শুনেছি, দু-তিনবার শুনেছি।"

"ওসমান!"

"কি?"

"আমি তোমার বন্ধু, তোমায় যখন বন্ধু বলে মেনেছি, তোমার বিপদে সাহায্য করা আমার কর্তব্য।"

"আমার বিপদ!"

"হ্যাঁ। তোমার সামনে ঘোর বিপদ। তুমি শাহজাদা আওরংজেবের মধুর বাক্য শুনে বিগলিত হয়েছো, কারণ ওঁকে তুমি

চেনো না। কিন্তু আমি ওঁর জিলওদার, আজ এত বছর ওঁর সান্নিধ্যে আছি, ওঁকে আমি চিনি। ওসমান, তোমার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।"

"আমি কোনো বিপদকে ভয় পাই না।"

"সে আমি জানি। কিন্তু এখানে তুমি দুর্বল, নিঃসহায়। তুমি এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে পালিয়ে যাও এখান থেকে, অবিলম্বে আওরঙ্গাবাদ পরিত্যাগ করো। তুমি এই মুহূর্তে ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সব জানাও, উনি নিশ্চয়ই তোমার আওরঙ্গাবাদ পরিত্যাগ করার ব্যবস্থা করে দেবেন।"

"ওঁকে আর মাকে এখানে একলা ফেলে? প্রাণ থাকতে নয়।"

"বৃথা সাহস দেখিয়ে কোনো লাভ নেই ওসমান। আমি যা বলছি শোন। তোমার তরবারি কোষমুক্ত করো।"

"কেন?"

"এসো, এখানে তোমার আমার মধ্যে একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ হোক—।"

"তোমার সঙ্গে?" ওসমান হেসে উঠলো। কেল্লাতে যখন তার জন্য সুসজ্জিত অশ্ব এনে দেওয়া হয় আওরংজেবের আদেশ অনুযায়ী, আকিল খাঁর নির্দেশে শেখ মির একটা তরবারিও সংগ্রহ করে এনে দিয়েছিলো ওসমানকে। ওসমান জিজ্ঞেস করলো, "সে জন্যেই কি তুমি শেখ মিরকে বলেছিলে আমায় তলোয়ার এনে দিতে?"

আকিল খাঁ হাসলো না। গম্ভীর মুখে উত্তর দিলো, "আমি অনেক চিন্তা করে সে ব্যবস্থা করে ছিলাম। আমার কথা শুনলে তুমি বুঝতে পারবে। আমার প্রতি শাহজাদার নির্দেশ আছে, তোমার সঙ্গে গিয়ে ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌এর সঙ্গে পরিচিত হওয়া—এর গূঢ়ার্থ হোলো এখন থেকে তোমাদের দুজনকে চোখে চোখে রাখা। আমি শাহজাদার খাদিম, ওঁর হুকুম অমান্য করতে পারি না। কিন্তু ওসমান, তুমি কি চাও ইয়ার ইসমাইল বেগ্ কোনো বিপদে পড়ুক?"

"না, আকিল খাঁ।"

"কিন্তু যেখানে আমি শাহজাদার হুকুম তামিল করছি, সেখানে তুমি এর প্রতিরোধ করবে কি করে?"

তলোয়ারে হাত দিলো ওসমান।

"হ্যাঁ, আমিও তাই চাইছিলাম," আকিল খাঁ হাসলো, "তবে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ বেশীক্ষণ চলা বাঞ্ছনীয় নয়। আমার যদ্দুর ধারণা, শাহাজাদা আমায় একলা একাজে পাঠাচ্ছেন না। পেছনে নিশ্চয়ই আরো অনেকে আসছে আমার সহায়তা করতে। সুতরাং তোমার অবিলম্বে আমায় জখম করে পালানো প্রয়োজন। কিন্তু অসিযুদ্ধে আমিও অপটু নই। সুতরাং—"

ওসমান কোনো উত্তর দিলো না।

"ওসমান, আমরা বন্ধু,—" আকিল খাঁ বলে গেল, "আমার কথা মন দিয়ে শোনো, কোনো প্রতিবাদ কোরো না। দু-চারটা ঘাত প্রতিঘাতের পরেই তুমি আমার ডান হাতের কব্জিতে মৃদু আঘাত কোরো, যাতে জখমটা খুব জোর না হয়, কিন্তু একটু রক্তপাত হয়। আমি সে আঘাত আটকাবো না। আমার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যাবে। আমি পড়ে যাবো ঘোড়ার উপর থেকে। তুমি তখন ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যাবে।—কিন্তু তারপর আর সময় নষ্ট করবে না। মোগল পিয়াদা কি সিলাহ্‌দারেরা তোমার ঠিকানা খুঁজে বার করবার আগেই তোমাকে চলে যেতে হবে এই শহর ছেড়ে।"

ওসমান হেসে ফেললো, বললো, "নসীবে এও ছিলো, যুদ্ধ করবো তোমার মতো একজন বন্ধুর সঙ্গে, জখম করবো তোমাকে!"

"এসো, দেরি কোরো না," বলে আকিল খাঁ তলোয়ার বার করে নিলো।

ওসমানও তলোয়ার বার করলো সঙ্গে সঙ্গে,—এবং শুধু এই কারণেই বেঁচে গেল তাদের প্রাণ।

কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে পথের বাঁকের ঘন ঝাড়ঝোপের অন্তরাল

থেকে পাঁচ ছয়জন ঘোড়সওয়ার লাফিয়ে পড়লো তাদের উপর। একজনের তলোয়ার পেছন দিক থেকে বিদ্ধ করলো আকিল খাঁর পৃষ্ঠদেশ, ওসমান অসিচালনা করে সে আঘাত ব্যর্থ করে দিলো। আরেকজনের তলোয়ার উদ্যত হয়েছিলো ওসমানের মস্তক লক্ষ্য করে, আকিল খাঁ প্রতিহত করলো সেই আঘাত।

"বিজাপুরী সিদ্দি!" আকিল খাঁ বিস্ময়ে বলে উঠলো ওদের চেহারা লক্ষ্য করে।

একথা শুনে অশ্লীল কটুক্তি করলো সিদ্দি ফজলুল। সিদ্দি ইব্রাহিম তাকে ডেকে বললো, "আকিল খাঁ যেন প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে না পারে। ওকে এখানে এভাবে পেয়ে যাবো ভাবতে পারিনি।"

"কিন্তু ওসমান যেন জখম না হয়," বলে উঠলো হাসান আলি, "ওসমানকে অক্ষত দেহে ধরে ফেলতে হবে।"

কিন্তু পাঁচ ছয়জন বিজাপুরীর পক্ষে সহজ হোলো না এই দুজনকে কাবু করা বা ঘায়েল করা। দুজনেই সুদক্ষ যোদ্ধা, আশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে দুজনে অস্ত্রচালনা করে আত্মরক্ষা করতে লাগলো।

"তুমি পালাও ওসমান," আকিল খাঁ বলে উঠলো, "আমি একাই এদের কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবো।"

"তোমাকে একলা ফেলে নয়," উত্তর দিলো ওসমান, "ইয়ার ওসমান বেগ্ যুদ্ধের সময় অস্ত্রসংবরণ করে পালাতে শেখে নি।"

একটা বিকট চিৎকার করে হাসান আলি পড়ে গেল ঘোড়ার উপর থেকে। আকিল খাঁর তলোয়ার তার কণ্ঠদেশ বিদীর্ণ করে তার ইহলীলা সমাপ্ত করে দিয়েছে।

এমন সময় আরেকজন এসে যোগ দিলো সেই খণ্ডযুদ্ধে। সেও এসে পড়েছে অশ্বারোহনে, হট্টগোলের মধ্যে তার অশ্বের পদধ্বনি শুনতে পায়নি এরা কেউ। একসঙ্গে দুজন সিদ্দি চড়াও হয়েছিলো

ওসমানের উপর, সে এসে একজনকে আক্রমণ করলো পেছন দিক থেকে। ওসমান আর আকিল খাঁ বিস্মিত হয়ে দেখলো নবাগত একজন মারাঠী। তাকে আকিল খাঁ আগেও দেখেছে, সামান্য রকম পরিচয়ও ছিলো। বলে উঠলো, "মিনাজী ভোঁসলে, আপনি ?"

"হ্যাঁ," একজন সিদ্দির আক্রমণ প্রতিহত করে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো মিনাজী, "ওসমান বেগ্, আপনি পালিয়ে যান এখান থেকে, ইসমাইল বেগ্ আপনার অপেক্ষা করছে।"

"কক্ষনো না," অস্ত্রচালনা করতে করতে উত্তর দিলো ওসমান, "আমার বন্ধুকে একলা ফেলে আমি যেতে পারবো না।"

"আপনি জানেন না," অধৈর্যকণ্ঠে বললো মিনাজী, "একদল মোগল সিলাহ্দার আসছে এদিকে। আপনার এখানে থাকা নিরাপদ নয়।"

শঙ্কিত হোলো আকিল খাঁ। একজন বিজাপুরীর অস্ত্রাঘাত ব্যর্থ করে চিৎকার করে উঠলো, "ওসমান, তুমি চলে যাও। আমি আর মিনাজী এদের ঠেকিয়ে রাখছি।"

আকিল খাঁর দিকে তাকাবার ফুরসত নেই যুদ্ধরত মিনাজী ভোঁসলের কিন্তু একথা শুনে সে বিস্মিত হোলো। মনে হোলো, যে কারণেই হোক, এই মোগল মনসবদার ওসমানের অহিতাকাঙ্খী নয়। হঠাৎ তার চোখ পড়লো দূরে পথের বাঁকে। অনেকগুলি দ্রুত ধাবমান অশ্বের পদধ্বনি ভেসে আসছে সেদিক থেকে। আকিল খাঁ আর ওসমানও দেখতে পেয়েছে।

"পালান ওসমান বেগ্," মিনাজী বলে উঠলো, "ওরা আসছে।"

"না, সে হয়না।"

"ওসমান," বললো আকিল খাঁ, "আমার জন্যে ভাবনার আর কারণ নেই। এই কয়েক মুহূর্ত আমি একলাই এদের রুখতে পারবো। মিনাজী, আপনিও চলে যান ওসমানের সঙ্গে। আপনিও নিরাপদ হন।"

প্রথমে ওসমান, তারপর মিনাজী ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। একজন বিজাপুরী ওদের অনুসরণ করতে গেল। তার পথ রোধ করলো আকিল খাঁ। সরু পথ, এদের দুজনকে অতিক্রম করে অন্যদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

বহুকণ্ঠের কোলাহল শোনা গেল। এসে পড়েছে মেহেরউদ্দিন খাঁর মোগল সিলাহ্‌দারেরা। বিজাপুরীরা চেষ্টা করলো পালিয়ে যাওয়ার। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হোলো মোগলদের উদ্যত তরবারির সামনে। তাদের প্রিয় মনসবদার আকিল খাঁকে বিপন্ন দেখে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

আকিল খাঁ একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলো, বহুদূরে বিলীন হয়ে গেছে ওসমান আর মিনাজী ভোঁসলে। তার মনের উপর থেকে একটা ভার নেমে গেল। মোগল অশ্বারোহীদের দিকে ফিরে উত্তর দিলো, "এরা বিজাপুরী দুশমন, একজনও যেন পালাতে না পারে।"

ওরা কেউ শাহজাদা আওরংজেবকে এত অস্থির হতে দেখেনি। কক্ষের ভিতর সংযত উত্তেজনায় দ্রুত এদিক থেকে ওদিক পদচারণা করছিলো আওরংজেব। একধারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলো মুরশিদ কুলি খাঁ, আকিল খাঁ, শেখ মির, সাফ শিকান খাঁ, ইসলাম খাঁ আর রাও ছত্রসাল।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো আওরংজেব। জিজ্ঞেস করলো, "একজনও বাঁচে নি ?"

"না, আলিজা," উত্তর দিলো আকিল খাঁ। অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো তাকে।

"তার জন্যে আমার কিছুমাত্রও দুঃখ নেই, ওদের জীবন্ত ধরে আনতে পারলেও আমি তাদের বাঁচতে দিতাম না, কিন্তু তাদের টুকরো টুকরো করে বিতরণ করতাম কুকুরদের মধ্যে। ওরা আমার

সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিলো। কোতোয়াল নাসির উদ্দিন খাঁ কি করছিলো এতদিন? শহরের ভিতর কয়েকজন সশস্ত্র বিজাপুরী সিদ্দি নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো এতদিন আর আমার কোতোয়াল তাদের উপর নজর রাখেনি? কোথায় সে?"

মুরশিদ কুলি খাঁ উত্তর দিলো, "সে বাজারের ভিতর সমস্ত সিদ্দিদের দোকানগুলো খানাতল্লাশ করতে গেছে। খবর পাওয়া গেছে যে বিজাপুরীদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ওখানেই কোনো একটা দোকানে।"

"আকিল খাঁ! সেই লোকটি কে?—যে তোমার আর ওসমানের সহায়তা করতে তোমাদের সঙ্গে যোগ দিলো মেহের উদ্দিন খাঁ উপস্থিত হওয়ার আগে?"

"আমি চিনি না আলিজা," চোখ নিচু করে আকিল খাঁ বললো, "নিশ্চয়ই ইয়ার ইসমাইল বেগেরই কোনো অনুচর হবে। সেই তো পালালো ওসমানকে নিয়ে। একজন বিজাপুরী আমার পথ না আটকালে আমি ওদের চোখের আড়াল হতে দিতাম না।"

"ওই বিজাপুরী সিদ্দিরা নিশ্চয়ই চিনতো ওকে। ওদের অন্তত একজনকে জীবন্ত পেলে তার পরিচয় জেনে নিতাম। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যময় মনে হচ্ছে।"

আকিল খাঁ কোনো উত্তর দিলো না।

"আশ্চর্য! এটুকু সময়ের মধ্যেই নিখোঁজ হয়ে গেল সবাই?—ইয়ার ইসমাইল বেগ্, তার স্ত্রী, ওসমান, সবাই? বিজাপুরীদের নিহত করে তোমরা তো ওসমানের অনুসরণ করেছিলে।"

"হ্যাঁ, আলিজা, কিন্তু ওদের আর ধরতে পারিনি।"

"কোতোয়াল নাসির-উদ্দিন খাঁ একটা অপদার্থ। চারঘড়ি সময় লাগিয়ে দিলো ওদের ঠিকানা খুঁজে বার করতে, দু-ঘড়ি সময় লাগলো শহরের প্রবেশ ও নির্গমন পথের উপর পাহারা বসাতে, তিন-ঘড়ি সময় লাগলো বিজাপুর যাওয়ার সড়কে ফৌজ পাঠাতে,

সামন্তের পাহারাদার সেনাদের উর্দ্ধতে পিয়াদা পাঠাতে। আমি ওটুকু সময় পেলে একটা রাজ্য জয় করতে পারি। নিশ্চয়ই কোথাও কেউ বেইমানি করেছে। তা-নইলে এত অল্প সময়ের মধ্যে সবাই আওরঙ্গাবাদ ছেড়ে পালিয়ে গেল কি করে?"

মুরশিদ কুলি খাঁ বললো, "আলিজা, আমার কাছে এটুকু খবর আছে যে, আমাদেরই কোনো একজন উচ্চপদস্থ মনসবদারের সঙ্গে উকীল ইকবাল খাঁর যোগাযোগ আছে। আজ সকালের কুচ কাওয়াজের পরেও তাঁকে ইকবাল খাঁর হাবেলির দিকে খুব দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখা গেছে। তিনি হলেন—"

"থাক, সর্বসমক্ষে নাম ঘোষণা করতে হবে না মুরশিদ কুলি খাঁ। আমি সবই জানতে পেরেছি।"

সবাই বিস্মিত হয়ে আওরংজেবের দিকে তাকালো।

আওরংজেব বলে গেল, "আমি যদি অন্তত একদিন আগেও জানতে পারতাম! মুরশিদ কুলি খাঁ! ব্যাঙ্কজী, মুল্লা রহমান আর শর্জা খাঁ আওরঙ্গাবাদ পরিত্যাগ করেছে?"

"হ্যাঁ, আলিজা, আজ প্রত্যুষে। ইকবাল খাঁর কন্যা এবং অন্যান্য পরিজনবর্গও তাঁদের সঙ্গে গেছে। তবে ইকবাল খাঁ এখনো শহরে আছেন। শুনেছি, উনি রওনা হবেন পরশু পূর্বাহ্নে।"

"ওঁকে আটকে রাখা যাবে না। তাতে কোনো লাভ নেই। তিনি অন্য এক রাষ্ট্রের উকীল। তাঁর পদাধিকারের যোগ্য মর্যাদা আমাদের না দিয়ে উপায় নেই।"

"হয়তো ইসমাইল বেগ্ ও ওসমান সীমান্ত অতিক্রম করার আগেই আমাদের টহলদার ফৌজ তাদের পথ রোধ করতে সক্ষম হবে।"

"আমার তা মনে হয় না মুরশিদ কুলি খাঁ। এই ইসমাইল বেগ্,—অর্থাৎ হামিদ খাঁ—অত্যন্ত চতুর লোক। আঠারো বছর সে আমার চরদের চোখে ধুলো দিয়ে আগ্রায় কাটিয়ে দিলো,

আজ সে যে আমার টহলদার ফৌজের দৃষ্টি অতিক্রম করে মোগল সীমান্ত পার হয়ে যেতে পারবে না, সে কথা আমার মনে হয় না। তার যা কিছু পরিকল্পনা সে আগের থেকেই করে রেখেছে। ভুল আমারই হয়েছে। উজীর খাঁ-মহম্মদের বিজাপুরী হরকরারাও যে ওদের সন্ধান পেতে পারে, এই সম্ভাবনাও আমার অনুমান করে নেওয়া উচিত ছিলো। তার চেয়েও বড়ো ভুল আমার হয়েছে ওসমানকে আমার হাতের মুঠোয় পেয়েও তাকে কেল্লার বাইরে যেতে দেওয়ায়। আকিল খাঁ নিজে তার সঙ্গে ছিলো, ফৌজ নিয়ে মেহের উদ্দিন খাঁ তাদের অনুসরণ করছিলো, সুতরাং আমার ভাবনার কোনো কারণ ছিলো না। কিন্তু এই বিজাপুরীরাও যে ওসমানকে অপহরণ করার চেষ্টা করবে একথা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।"

খাস চৌকির একজন পিয়াদা এসে জানালো, কোতায়াল নাসির উদ্দিন খাঁ ফিরে এসে আলিজার খিদমতে হাজির হয়েছেন।

অনুমতি পেয়ে কোতোয়াল ভিতরে এলো। জানালো, বাজারে সিদ্দি ওয়াজিদের দোকান ঘেরাও করা হয়েছিলো। তিনজন বিজাপুরী সিদ্দিকে গিরফ্‌তার করা হয়েছে।

"ওরা কোথায় ?"

"কেল্লার ভেতরেই নিয়ে আসা হয়েছে তাদের। কোতোয়ালিতে নিয়ে যাওয়া হয়নি। দিওয়ান সাহেবের তাই নির্দেশ ছিলো।"

"ওদের মধ্যে যে প্রধান তাকে পাওয়া গেছে ?"

"হ্যাঁ, আলিজা, সিদ্দি হানিফ নামে একজন আছে এদের মধ্যে, জানা গেছে যে, সে বিজাপুরের উজীর খাঁ-মহাম্মদের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র।"

"তাকে আমার সামনে হাজির করা হোক।"

শৃঙ্খলিত অবস্থায় ভিতরে নিয়ে আসা হোলো সিদ্দি হানিফকে। শাহাজাদা তার দিকে তাকালোও না। কোতোয়ালের দিকে

ফিরে বলল, "শত্রুপক্ষের খুফিয়া-নাবিন্দের শাস্তি মৃত্যু। অন্য দুজনকে কেল্লার সামনে হাতির পায়ের নিচে ফেলে দেওয়া হোক।"

সিদ্দি হানিফের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করলো।

"দিওয়ান মুরশিদ কুলি খাঁ ছাড়া অন্য সবাইকে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হোক।"

সবাই বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

"মুরশিদ কুলি খাঁ! এই লোকটিকে জিজ্ঞেস করো, এ প্রাণে বাঁচতে চায় কিনা।"

সিদ্দি হানিফ হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লো। বলে উঠলো ব্যাকুল কণ্ঠে, "শাহজাদা মেহেরবান! প্রাণভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে। আমি চিরজীবন আপনার খাদিম হয়ে থাকবো।"

"ওকে বলো মুরশিদ কুলি খাঁ, সব কিছুর জন্যে একটা মূল্য দিতে হয়।"

"আমি যে কোনো মূল্য দিতে রাজী আছি আলিজা," বললো সিদ্দি হানিফ।

"বেশ," এবার সোজাসুজি সিদ্দি হানিফকেই সম্বোধন করে কথা বললো আওরংজেব, "আমি তোমায় বিজাপুরে ফিরে যেতে দিতে পারি দুটো শর্তে।"

"হুকুম করুন আলিজা।"

"আমার একটা নিশান নিয়ে যেতে হবে তোমাদের সুলতান আলি আদিল শাহ্‌র কাছে। সে নিশান খুব গোপনীয়, তোমাদের সুলতান স্বয়ং এবং উজীর খাঁ-মহম্মদ ছাড়া আর কেউ এ নিশানের সংবাদ জানতে পারবে না।—হ্যাঁ, এমন কি বড়ী সাহিবাও নয়।"

"আপনার এই হুকুম আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই পালন করবো আলিজা।"

আওরংজেব একটু হাসলো, মৃত্যুর মতো শীতল সেই হাসি। খুব নিচু গলায়, আরো আস্তে আস্তে বললো, "বিজাপুরের ফৌজের

অবস্থিতি ও সংস্থান সম্বন্ধে আমায় নিয়মিত খবর দিতে হবে বিজাপুর থেকে। আমরা যা জানতে চাই তার বিস্তারিত বিবরণ মির বকশি মহবত খাঁর কাছে পাবে।”

মাথা নিচু করলো সিদ্দি হানিফ। প্রথম শর্তে রাজী হয়েছিলো যেই ব্যগ্রতার সঙ্গে, সেটা আর দেখা গেল না।

“এ প্রস্তাব তোমার ভালো না লাগতে পারে,” বলে গেল শাহজাদা, “হয়তো এর চাইতে অনেক বাঞ্ছনীয় মনে হবে কোনো একটা মন্থর মৃত্যু,—যেমন ধরো, একটি করাত তোমায় দ্বিখণ্ডিত করবে খুব আস্তে আস্তে আস্তে…”

সিদ্দি হানিফ শিউরে উঠলো। বলে উঠলো ব্যাকুল কণ্ঠে, “না, না, আলিজা, আপনি যা বলবেন, তাতেই আমি রাজী।”

“বেশ, তাহলে প্রস্তুত হও,—আজ সন্ধ্যায়ই তোমায় বিজাপুর রওনা হতে হবে।”

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সিদ্দি হানিফের মুখ।

আওরংজেব আবার হাসলো। মুরশিদ কুলি খাঁর দিকে ফিরে বললো, “একে কিছু আশরফি আর বিজাপুরী হুন দিয়ে দেওয়া হোক। আর—হ্যাঁ, গত দু তিন বছরের বিভিন্ন তারিখের কয়েকটি রসিদ লিখিয়ে নাও ওর হাতে, যাতে প্রয়োজন হলে একথা প্রমাণ করা যায় যে এ লোকটি অনেকদিন ধরে আমাদের গুপ্তচর হিসেবে নিযুক্ত আছে বিজাপুরে। তবে আশা করা যাক যে, সে সব রসিদ উজীর খাঁ-মহম্মদ কি সিদ্দি মর্জনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন আমাদের হবে না। এ লোকটির মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছে, এ আমাদের হুকুম তামিল করতে কোনো গাফিলতি করবে না।”

আওরংজেব চলে যাচ্ছিলো। দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এলো, বললো, “মুরশিদ কুলি খাঁ, কোতোয়াল নাসির উদ্দিনকে বরখাশ্‌ত্‌ করো। সে এরকম বড়ো শহরের কোতোয়াল

হওয়ার উপযুক্ত নয়। অন্য কারো নাম কাল আমার কাছে সুপারিশ কোরো এই পদের জন্যে। আচ্ছা, বিজাপুরের সুলতানের কাছে আমার গোপন নিশান পাঠানো উচিত হবে না। তাই না? বেশ, শুধু আমার মৌখিক নির্দেশ বহন করে নিয়ে যাবে এই লোকটি। ওর কথা যাতে বিশ্বাসযোগ্য হয়, তার জন্যে যথাযথ অভিজ্ঞান দেওয়া হবে একে। তোমরা এবার বিদায় গ্রহণ করতে পারো। বাইরে গিয়ে আকিল খাঁকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে।"

আকিল খাঁ ভেতরে এসে তসলিম করে দণ্ডায়মান হোলো।

"আকিল খাঁ! ওসমান যে পালিয়ে যেতে পেরেছে তার জন্যে তোমায় দোষ দিতে চাইনা। তোমার নসিব খারাপ, তুমি কি করবে। কিন্তু আমার হুকুম তামিল করতে যে সক্ষম হওনি, শুধু এই কারণেই আমি তোমায় শাস্তি দিতে পারতাম। ওসমানের প্রতি তোমার যে কিঞ্চিৎ দুর্বলতাও আছে সেটা যে আমি উপলব্ধি করতে পারিনি তা নয়, তবে এই দুর্বলতা যে তোমার কর্তব্যপালনে কোনো বাধা হতে পারে সেকথাও আমি বিশ্বাস করি না।"

আকিল খাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হোলো। কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

আওরংজেব বলে গেল, "একথা মনে কোরো না যে, ইয়ার ওসমান বেগ্ কি ইয়ার ইসমাইল বেগ্ আমার হাত থেকে পালাতে পারবে। তবে আপাতত ওই ইসমাইল বেগ্ বা হামিদ খাঁর সম্বন্ধে আমার কোনো আগ্রহ নেই। শুধু ওই ওসমানকেই আমার চাই। আমি নিশ্চিত যে, অচিরেই তাকে আবার আমার হাতের মুঠোয় পাবো। তার যথাযথ ব্যবস্থা আমি করছি। এই ব্যাপারে তোমার উপর একটা দায়িত্ব অর্পন করতে চাই, আকিল খাঁ।"

"হুকুম করুন আলিজা।"

"তুমি আজই রওনা হও শেখ মির আর ইসলাম খাঁর সঙ্গে। মোগল এলাকার সীমান্তে নসরতপুরের উর্দুতে তুমি অপেক্ষা করবে। হয়তো,—হয়তো কয়েকদিন পরে বন্দী অবস্থায় তোমার কাছে নিয়ে আসা হবে ওসমানকে। তুমি তাকে সুরক্ষিত অবস্থায় নিয়ে আসবে আমার কাছে। তাকে জীবন্ত যদি না পাই, অন্তত তার ছিন্নমুণ্ডও যেন এসে পৌঁছায় আমার কাছে।"

বিবর্ণ হোলো আকিল খাঁর মুখ।

আওরংজেব বলে গেল, "যদি এবারও তুমি অক্ষম হও, তাহলে, তোমার ওই শির থাকবে না তোমার দেহের উপরে, এবং—," মৃত্যুশীতল হাসি হাসলো আওরংজেব, "এবং আমি এই নির্দেশ দেবো, তোমার ছিন্ন মুণ্ড যেন ঝুলিয়ে দেওয়া হয় মহলের ভিতরের বাগিচায়। হারেমের মহিলারা তোমার খুবসুরত মুখ দেখে নিশ্চয়ই বিমুগ্ধ হবে।"

আওরংজেব আর দাঁড়ালোনা, চলে গেল মহলের ভিতর।

আকিল খাঁর মেরুদণ্ড বেয়ে একটি তুষার শীতল শিহরণ নামলো।

নিজের কক্ষে একা ঝরোকার সামনে দাঁড়িয়েছিলো জিনত-উন-নিসা। ঝরোকার ওপারে অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশ, নিচে আবছা বাগিচা। কিছু দূরে মহলের উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের উপর উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে টহল দিচ্ছে খোজা প্রহরী।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন জিনত-উন-নিসার মুখমণ্ডল। কখন কক্ষের ভিতর অন্ধকার হয়ে গেছে, কখন খাদিমান এসে চিরাগ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে ফতিল সোজ্‌এর উপর তার খেয়াল নেই।

এক সময় আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলো জেব-উন নিসা, তাও টের পেলো না তার কনিষ্ঠা ভগ্নী। জেব-উন-নিসা তাকিয়ে দেখলো জিনত-উন-নিসার দিকে, তারপর কিছু না বলে

নিঃশব্দে বসে পড়লো গালিচার উপর। একপাশে পড়েছিলো একটি দিওয়ান, সেটি তুলে নিয়ে পাতা উল্টে যেতে লাগলো আনমনে। কিন্তু তারও মুখমণ্ডল বিষণ্ণ, নয়ন অশ্রুসিক্ত। মন দিতে পারলো না দিওয়ানের পাতায়।

অনেকক্ষণ পরে জিনত-উন-নিসা ফিরে তাকালো। জেব-উন-নিসাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো তার কাছে।

"তুমি কখন এসেছো আকাজান!"

"বেশ কিছুক্ষণ।"

"আমায় ডাকলে না কেন?"

"এমনি।"

জিনত-উন-নিসা লক্ষ্য করলো জেব-উন-নিসার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর। জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কি হয়েছে আকাজান!"

মাথা নাড়লো জেব-উন-নিসা।

"দেখা হয়েছে?"

"না," মৃদুকণ্ঠে জেব-উন-নিসা বললো।

"আসেনি?" উদ্বিগ্ন শোনালো জিনত-উন-নিসার কণ্ঠ।

"না। খবর পাঠিয়েছে যে আসতে পারলো না। আবার কবে দেখা হবে কে জানে।"

"নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর ব্যাপারে আটকে গেছে। নিশ্চয়ই কাল আসবে।"

"না, জিনত-উন-নিসা। আলিজা ওঁকে আওরঙ্গাবাদের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"সে কি! কোথায়?"

"নসরতপুরের উর্দুতে।"

"নসরতপুর? সে যে একেবারে মোগল এলাকার সীমানায়। তারপর থেকে বিজাপুরী এলাকা শুরু। সেখানে কেন?"

"ওসমানকে ধরে আনতে।"

মহলের ভিতর নারীদের সমস্ত খবরই পৌছেছিলো। ওসমানকে ধরে নিয়ে যেতে যে চড়াও হয়েছিলো বিজাপুরীরা, এবং পরে ওসমান, ইসমাইল বেগ্, আরো অনেকে আওরঙ্গাবাদ থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলো, এখবর জানতো আওরংজেবের কন্যারা।

তুজনে চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ।

তারপর একসময় জিনত-উন-নিসা ফিরে তাকালো জেব-উন-নিসার দিকে। জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, খবরটা কি সত্যি?"

"কোন খবর?"

"আমাদের সহেলী আরজুমান-আরার আশিক এই ওসমানই স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র বৈধ সন্তান এবং ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌ই সেই নিরুদ্দিষ্ট সর্দার হামিদ খাঁ?"

"আলিজার তো তাই ধারণা।"

"কিন্তু এই ধারণা তো ভুলও হতে পারে,—।"

"আলিজা ভুল করেন না," উত্তর দিলো জেব-উন-নিসা, "ওসমান যে স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র বৈধ সন্তান, এ খবর যদি তাঁর বানানোও হয়, তাহলে এর পেছনেও কোনো গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। তুমি যদি এই আশা করে থাকো যে, তাঁর ধারণা ভুল প্রমানিত হলে তিনি ওসমানকে ধরে আনার প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হবেন, তাহলে তুমি আমাদের পিতাকে আজো চিনতে পারোনি।"

"আরজুমান-আরা আমাদের প্রিয় সহেলী। ওসমান তার প্রেমাস্পদ। আমি তাকে ভাই বলে মেনেছি। তাকে বাঁচানো আমাদের কর্তব্য," বলতে বলতে জিনত-উন-নিসার নয়ন অশ্রুসিক্ত হোলো, "ওসমান তো কোনো অন্যায় করেনি। তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। সে আলিজার প্রাণ বাঁচিয়েছে।"

জেব-উন-নিসা গভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করছিলো। আস্তে

আস্তে উত্তর দিলো, "আমরা অন্দর মহলের সামান্য নারী, আমাদের কতোটুকুই বা ক্ষমতা।"

"আকিল খাঁকে তুমি কোনোরকমে খবর পাঠাও, সে যেন ওসমানকে রক্ষা করে যেভাবেই হোক।"

"খবর পাঠানোর প্রয়োজন নেই জিনত-উন-নিসা। সে ওসমানকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, ওর যথাসাধ্য সে করবে। তবে আলিজা তাকে জানিয়েছেন, ওসমান যদি এবারও কোনোরকমে তার হেপাজত থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়, তাহলে আলিজা তার ছিন্নমুণ্ড মহলের ভিতর ঝুলিয়ে রাখবেন—।"

জিনত-উন-নিসা শিউরে উঠলো জেব-উন-নিসার কথা শুনে, অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "মহলের ভিতর! কেন? আলিজা কি কিছু সন্দেহ করেন?"

জেব-উন-নিসা ম্লান হাসি হাসলো। একথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললো, "আলিজা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। কিন্তু আমার কোনো অনুরোধ তিনি রাখবেন, এটা দুরাশা মাত্র। তবু একবার বলে দেখি—।"

সন্ধ্যা অতীত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রাত্রির প্রথম প্রহরের নিস্তব্ধতা নেমেছে কেল্লার চারদিকে। অন্য কোনো শাহজাদার মহল হলে হয়তো এতক্ষণে নৃত্যগীত আনন্দ কোলাহলে মুখর হয়ে উঠতো। কিন্তু আওরংজেবের মহলের অভ্যন্তরীণ জীবনে এসব উদ্দাম প্রবৃত্তির স্থান নেই, সেখানে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের শান্ত কঠোরতায় সন্ধ্যাগুলি নিস্পন্দ মনে হয় বাহ্যদৃষ্টিতে। মহলবাসিনীদের জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব নেই, উত্তেজনার অভাব নেই,—কিন্তু একটা সংযত গাম্ভীর্যের আড়ালে চাপা থাকে সব কিছুই।

দৈনন্দিন কাজকর্ম সেরে আওরংজেব সেদিন বিশ্রাম করতে এসেছিলো প্রথমা বেগম দিলরস-বানুর মহলে। আখরোট ও

কিসমিস দিয়ে তৈরী একরকম গরম পানীয় পান করতে করতে কন্যাদের কুশল জিজ্ঞেস করতে দিলরস-বানু বেগম জানালো, জেব-উন-নিসা আর জিনত-উন-নিসা আলিজার পাক কদমে তসলিম জানাতে অভিলাষী, আলিজার হুকুম হওয়ার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে পাশের প্রকোষ্ঠে।

হুকুম হোলো। কন্যারা কক্ষে প্রবেশ করে অভিবাদন করলো পিতাকে। আওরংজেব তাদের দিকে তাকালো না। আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগলো গরম পানীয়ের পানপাত্রে।

কন্যারা দাঁড়িয়ে রইলো মুখ নিচু করে। একটু পরে শাহজাদা আওরংজেব তাদের উপবেশন করবার অনুমতি দিলো। ওরা হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো এক পাশে।

"তোমাদের শারীরিক সংবাদ কুশল তো?" জিজ্ঞেস করলো আওরংজেব।

জেব-উন-নিসা ও জিনত-উন-নিসা তুজন তুজনের মুখের দিকে তাকালো। আওরংজেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলো তাদের দিকে। তারপর নিরস কণ্ঠে বললো, "বলো কি বলতে চাও।"

একটু চুপ করে থেকে জেব-উন-নিসা বললো, "আলিজা, আমরা কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।"

"কেন?"

"একজনের জীবন আশঙ্কা করে। আমরা আপনার কাছে একটা আরজ্ নিয়ে এসেছি।"

"কি আরজ্?"

"আলিজা, আমাদের এই আরজ্ যে, আপনি ওসমানকে দয়া প্রদর্শন করবেন।"

"আমি তো দয়া প্রদর্শন করতে চেয়েছিলাম," আওরংজেব আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "কিন্তু সে বেইমানি করে পালিয়ে গেল, আমি কি করবো।"

"সে নিশ্চয়ই ভয়ে এবং কারো প্ররোচনায় পালিয়ে গেছে। আলিজার মহানুভবতার পরিচয় পেলে সে কিছুতেই এ ভুল করতো না।"

"তোমরা ওর হয়ে বলতে এসেছো কেন?" চক্ষু অর্ধনিমীলিত করে আওরংজেব জিজ্ঞেস করলো।

"আলিজা, আমরা ওসমানের প্রতি কৃতজ্ঞ।"

"কৃতজ্ঞ! কেন?"

"সে আলিজার প্রাণরক্ষা করেছে। যদি সে সেখানে উপস্থিত না থাকতো, যদি আলিজার কোনো দুর্ঘটনা ঘটতো, তাহলে আমাদের ভবিষ্যত হোতো অনিশ্চিত ও আশঙ্কাময়।"

"আওরংজেবের প্রাণ রক্ষা করেছেন পরম দয়াময় আল্লা রসুল। সে শুধু আমার আততায়ীকে নিহত করেছে। —যাই হোক, তোমরা বলতে চাও তোমরা ওসমানের প্রতি কৃতজ্ঞ। এবং সেজন্যে তার হয়ে আমার কাছে আরজ্ এনেছো। এই তো তোমাদের কথা?"

"হ্যাঁ, আলিজা।"

"আমার প্রশ্ন,—শুধু কৃতজ্ঞতাবশতই এই আরজ্ এনেছো, আর কোনো কারণে নয়?"

জেব-উন-নিসা ও জিনত-উন-নিসা একটু চকিত হয়ে তাদের পিতার দিকে তাকালো।

আওরংজেব শান্তকণ্ঠে বলে গেল, "আমাদের এই শহরের কোতোয়াল তার দায়িত্ব পালনে ঠিকমতো যোগ্যতা প্রদর্শন করেনি। তা নইলে যে সব সংবাদ আমি একটু একটু করে আজ অপরাহ্ণ ও সায়াহ্নে পেয়েছি, সে সব সংবাদ পেয়ে যেতাম অনেক আগেই। একথা এখন আমি অবগত হয়েছি যে, ওসমান বেগ্ গোপনে ইকবাল খাঁর কন্যা আরজুমান-আরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো। তোমরা কি বলতে চাও তোমরা একথা জানো না? আরজুমান-আরা তো তোমাদেরই সহেলী।"

তুই কন্যাই মাথা নিচু করে বসে রইলো। আওরংজেব দিলরস-বানুর দিকে ফিরে বললো, "যেদিন জিনত-উন নিসা আরজুমান-আরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইকবাল খাঁর হাবেলিতে তশরিফ নিয়ে গিয়েছিলো, সেদিন ঠিক সেই সময়ে সেখানে ইসমাইল বেগ্ সামনের মহলে গোপনে আলোচনা করছিলো ইকবাল খাঁ ও অন্যান্য বিজাপুরী সর্দারদের সঙ্গে। এবং সেই সময়, ওসমান বেগ্ লুকিয়ে ছিলো মহলের পেছন দিকের বাগিচায়। শোনা যায়, সেদিন সেখানে ওসমান বেগ্ আরেকজন মজনুর সঙ্গে অসিযুদ্ধে প্রায় প্রবৃত্ত হয়েছিলো।"

জেব-উন-নিসার মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হয়ে গেল। সে মুখ তুললো না, কিন্তু জিনত-উন-নিসা স্তম্ভিত হয়ে চোখ তুলে তাকালো আওরংজেবের দিকে। এখবরও গোপন নেই শাহজাদার কাছে!

আওরংজেব গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "জিনত-উন-নিসা, এক অপরিচিত যুবকের সামনে বেপর্দা হয়ে তুমি অত্যন্ত বেশরমের মতো কাজ করেছো। তুমি এখনো অপরিণতবুদ্ধি, সেজন্যে তোমায় কঠোর শাস্তি আমি দিতে চাই না। তোমার এক মাসের মাসো-হারা বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হোলো। সেই অর্থ আমার নির্দেশে এতিম্‌খানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে দরিদ্রের সেবার জন্যে।"

জিনত-উন-নিসা চোখ নামালো না, শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো "আলিজা, আপনার দেওয়া সাজা আমার শিরোধার্য। কিন্তু আমার বিবেকের কাছে আমি কোনো অপরাধ করিনি। ওসমান আমার সহেলী ইকবাল খাঁর কন্যার ভাবী স্বামী, তাকে আমি ভাই বলে সম্বোধন করেছি। আমার ভাইয়ের হয়ে আমি আরজ্ নিয়ে এসেছি আপনার কাছে, আপনি মহান, আপনি ওসমানের উপর কোনো অবিচার হতে দেবেন না, যদি সে নিজের অজ্ঞাতে বা আনিচ্ছায় কোনো অপরাধ করেওবা থাকে, আপনি তাকে মার্জনা করবেন।"

আওরংজেব কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইলো নিজের কন্যার দিকে, তারপর ঈষৎ হাসলো। খুব আস্তে আস্তে বললো, "রাজনীতির গূঢ় তত্ত্ব তুমি বুঝবেনা কন্যা। তোমায় আমি শুধু এটুকু আশ্বাস দিতে পারি,—আমার আপন ভাইদের প্রতি আমি যে রকম সুবিচার করতে পারি আজকের দিনের এরকম জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, তোমার এই পাতানো ভাইটির প্রতি আমার সুবিচার তার চাইতে এতটুকু কম হবে না।"

জেব-উন-নিসা আর জিনত-উন-নিসা বসে রইলো চোখ নিচু করে।

"এবার তোমরা বিদায় গ্রহণ করতে পারো," জানালো আওরংজেব।

তসলিম করে চলে গেল জেব-উন-নিসা ও জিনত-উন-নিসা।

দিলরস-বানু এতক্ষণ চুপ করে ছিলো। এবার বললো, "ওসমান যদি সত্যি সত্যি মহম্মদ আদিল শাহ্‌র বৈধ সন্তান হয়, তাহলে কি আলিজার উচিত নয় বিজাপুর সম্পর্কে আমাদের নীতি একবার পুনর্বিবেচনা করে দেখা?"

"এই ব্যাপারে কি আমাকে স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে চলতে হবে?"

দিলরস-বানু চটে গেল আওরংজেবের কথা শুনে। বলে উঠলো, "ওসমান যদি বিজাপুরের তখ্‌ত্‌এর বৈধ অধিকারী হয়, তাহলে আলিজার কর্তব্য তাকে তার ন্যায্য অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করা।"

আওরংজেব হেসে ফেললো দিলরস-বানুর কথা শুনে। উত্তর দিলো, "ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কজন বৈধ দাবিদার তাদের ন্যায্য তখ্‌ত্‌ পেয়েছে? ভবিষ্যতেই বা কজন পাবে? বৈধ দাবী কাকে বলে? সহায়তাই বা কে কাকে করে? একমাত্র দাবি হচ্ছে তলোয়ারের দাবি। আর যার দাবি ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বৈধ, আল্লা তার সহায়।"

॥ আট ॥

বিজাপুর নগরীর প্রায় কেন্দ্রস্থলে কিলা-অর্ক্। দুর্গ প্রাচীরের ভিতরেই আরেকটি ছোটোখাটো শহর। সরকারের সমস্ত দফ্তর এবং সুলতানের মহল তো এখানে ছিলোই, তা ছাড়া উজীর, ফৌজের মির বক্‌শি এবং প্রধান রাজপুরুষদের অনেকের জন্যে নির্দিষ্ট সরকারী বাসভবনগুলিও অবস্থিত ছিলো কেল্লার ভেতরেই। তাদেরই প্রয়োজনে দুর্গতোরণের কাছে গড়ে উঠেছিলো একটি নাতিবৃহৎ শৌখিন বাজার। চারদিকের বাঁধানো পথগুলি সব সময়েই জনাকীর্ণ।

সেদিন অপরাহ্ণে ভিড়ের মধ্যে পথ করে নিয়ে সুলতানের মহলের দিকে এগিয়ে গেল একজন অশ্বারোহী। সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলো সবাই। অশ্বারোহী আর কেউ নয়, বিজাপুরী ফৌজের মির বক্‌শি সিদ্দি মর্‌জন। কেল্লার ভেতরে অশ্বারোহণে যাওয়া-আসা করবার অধিকার ছিলো উজীর খাঁ-মহম্মদ, প্রধান সেনাপতি সিদ্দি মর্‌জন এবং রাজমাতা বড়ী সাহিবার ভগ্নীপতি সর্দার আফজল খাঁর। স্বয়ং সুলতান এবং এই তিনজন ছাড়া আর সবাইকেই কিলা অর্কএর ভিতরে চলাফেরা করতে হোতো পদব্রজে।

সুলতানের মহলের প্রবেশদ্বারে এসে সিদ্দি মর্‌জন অশ্ব থেকে অবতরণ করলো। একজন সইস এসে ঘোড়া ধরলো। ভেতরে ঢুকতেই দেউড়ির দারোগা এসে সিদ্দি মর্‌জনকে অভিবাদন করলো।

"উজীর খাঁ-মহম্মদ এসে গেছেন?" জিজ্ঞেস করলো সিদ্দি মরজন।"

"হ্যাঁ, উনি বড়ী সাহিবার কাছেই আছেন।"

"সর্দার আফজল খাঁ?"

"উনি এখনো আসেন নি।"

"বড়ী সাহিবার কাছে যাওয়ার আগে আমি একবার মালিক-ই-জাহাঁ স্থলতান-এ-আদেলকে তসলিম জানাবার সম্মান পেতে চাই।"

দেউড়ির দারোগা খোজা নুরউদ্দিন একটু বিব্রত বোধ করলো। আস্তে আস্তে বললো, "মালিক-ই-জাহাঁ নার্গিস্-বাগ্এ বিশ্রাম করছেন।"

এই বিশ্রাম করার অর্থ কারো অজানা ছিলো না। সিদ্দি মর্জনের ভুরু কুঞ্চিত হোলো। একটু উষ্মার সঙ্গে বলে উঠলো, "দেশের এরকম বিপদ, আর স্থলতান এখনো শরাব আর স্থন্দরী নারীর নেশায় মশ্গুল হয়ে আছেন। আমি আজ দুদিন ধরে স্থলতানের সাক্ষাৎ পাওয়ার চেষ্টা করছি।"

"আপনারা সবাই আছেন। তাই বোধ হয় মালিক-ই-জাহাঁর মনে কোনো দুভাবনা নেই।"

"না, নুরউদ্দিন, এখন আর অত নিশ্চিন্ত হয়ে থাকার সময় নেই। দেশের লোকের মনোবল যাতে ভেঙে না পড়ে, তার জন্যে স্থলতানের কেল্লার বাইরে আসা উচিত, সৈন্যদের পরিদর্শন করা উচিত, নাগরিকদের মধ্যে একটু সফর করা উচিত। আমি স্থলতানকে এ কথাটাই বুঝিয়ে বলতে চাই।"

খোজা নুরউদ্দিন সতর্ক দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকালো, তারপর নিচু গলায় বললো, "হয়তো অনেকেই চান না যে, একথাটা মালিক-ই-জাহাঁ বুঝুক। আপনি যে একলা ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এও হয়তো তাঁরা পছন্দ করেন না।"

"ওঁরা আর কারা, উজীর খাঁ-মহম্মদ আর আফজল খাঁ," উত্তর দিলো সিদ্দি মর্জন, "আমি সৈনিক, রাজনীতির অতো ঘোর প্যাঁচ আমি বুঝি না। আমি শুধু এটুকু জানি যে আমার সৈন্যেরা চায়

সুলতানের নেতৃত্ব, উজীর ও রাজনীতিবিদদের নয়। এ যার তার সঙ্গে যুদ্ধ নয়, প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুস্তানের বাদশাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ। সৈন্যেরা যদি সুলতানকে না পায় তাদের মধ্যে, ওরা কার জন্যে লড়বে? ওরা জান দেবে সুলতানের জন্যে, খাঁ-মহম্মদের জন্যে নয়।"

"সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌ আজ বেঁচে থাকলে এত দুর্ভাবনা হওয়ার কারণ থাকতো না," খোজা নুরউদ্দিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো।

"হ্যাঁ, ওঁর একটা ব্যক্তিত্ব ছিলো। এই তরুণ সুলতান শুধু তাঁর চেহারা পেয়েছে, আর কোনো গুণ পায়নি।"

"উজীর সাহেবই মালিক-ই-জাহাঁকে নষ্ট করেছেন। তিনিই দুশ্চরিত্র লোক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন তাঁকে। এবং ওরাই তাঁকে লিপ্ত করে নানারকম ব্যাভিচারে।"

"শুধু উজীরকে দোষ দিচ্ছো কেন নুরউদ্দিন, আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদা বড়ী সাহিবা এর জন্যে খানিকটা দায়ী। উনি এরকম দৃঢ় চরিত্রের লোক, কিন্তু নিজের সন্তানের বেলা অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত। তিনি সুলতানকে প্রশ্রয় না দিলে, সুলতান আলি আদিল শাহ্‌ এই অল্পবয়েসেই এরকম সুরাসক্ত ও দুশ্চরিত্র হয়ে উঠতে পারতো না।"

একথা অস্বীকার করবার উপায় ছিলো না। রাজ্যের সবাই জানে এসব বৃত্তান্ত। চুপচাপ সায় দিলো খোজা নুরউদ্দিন। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি এখনই বড়ী সাহিবাকে তসলিম জানাতে আসবেন, না উজীর সাহেব চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন?"

"অপেক্ষা কেন করবো?" একটু রুষ্ট হোলো সিদ্দি মরজন, "আমার কোনো গোপনীয় কথা নেই বড়ী সাহিবার সঙ্গে। যা বলার, আমি সবার সামনেই বলতে পারি।"

"আপনি দেউড়িতে অপেক্ষা করুন, আমি সংবাদ পাঠাচ্ছি।"

রাজ্য পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করতেন বলে স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র পত্নী বড়ী সাহিবা পর্দা মানার ব্যাপারে বেশী বাড়াবাড়ি করতেন না। স্বল্প পরিচিতদের সঙ্গে দেউড়িতে জাফরির অন্তরালে থেকে দেখা করলেও, উজীর খাঁ-মহম্মদ, সিদ্দি মর্‌জন এবং অন্যান্য প্রধান সর্দারদের সঙ্গে গুসলখানাতেই সাক্ষাৎ করতেন। মুখের উপর রাখতেন শুধু একটি নকাব। এবং এভাবে সম্মানিত হবার অধিকার যাদের ছিলো তারাও পর্দার প্রতি সম্মানবশত তাঁর উপস্থিতিতে চোখ নামিয়ে রাখতো, তাকাতো না তাঁর দিকে। এখন তিনি প্রবীন বয়স্কা, সবাই তাঁকে মাতৃস্বরূপা বলে মানতো, তাই বাছা বাছা কয়েকজনের সামনে তিনি প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত থাকলেও সেটা অস্বাভাবিক বা তৎকালীন রেওয়াজের ব্যতিক্রম সত্ত্বেও অশোভন মনে হোতো না।

গুসলখানায় তখন উজীর খাঁ-মহম্মদের সঙ্গে কথোপকথন করছিলেন বড়ী সাহিবা। তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী খোজা মেহবুব ছাড়া আর কেউ সামনে উপস্থিত ছিলো না।

"তাহলে শর্জা খাঁ, মুল্লা রহমান আর ব্যাঙ্কজী ভোঁসলের দৌত্য সফল হোলো না," বললো বড়ী সাহিবা।

"না, বেগম সাহিবা," খাঁ-মহম্মদ উত্তর দিলো, "ওদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আওরংজেব কোনো শর্তই গ্রহণ করতে রাজী নয়।"

"আমার পুত্রের সঙ্গে শাহজাদা আওরংজেবের কন্যা জিনত-উন-নিসার বিবাহের প্রস্তাবেও তিনি স্বীকৃত হননি?"

"না, তাও স্বীকৃত হন নি।"

"কেন?"

আসল কথাটা বলতে পারলো না উজীর খাঁ-মহম্মদ। কোনো জননীর সম্মুখে কি করে বলা যায় যে তাঁর সন্তানের জন্মের বৈধতা অপর পক্ষ স্বীকার করে না। একটু ইতস্তত করে প্রবীণ উজীর উত্তর দিলো, "শাহজাদা তো কোনো কথা পরিস্কার করে বলেন না। তবে মনে হোলো, ওঁদের খানদানে যে রেওয়াজ আছে, কন্যার বিবাহ হয় নিজেদের পরিবারভুক্ত কোনো শাহজাদার সঙ্গে কিংবা আদৌ হয়ই না, বোধ হয় সেই রেওয়াজের ব্যতিক্রম করতে চান না শাহজাদা আওরংজেব।"

"হ্যাঁ, আওরংজেব আমার আলির সম্বন্ধে কি বলে আমি জানি," শান্ত কণ্ঠে বললো স্বর্গীয় সুলতানের বেগম।

খাঁ-মহম্মদের মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে গেল। কোনো উত্তর দিলো না।

"মির জুমলা আওরঙ্গাবাদে পৌঁছাচ্ছেন কবে?" বড়ী সাহিবা জিজ্ঞেস করলো।

"সংবাদ পেয়েছি, তিনি দিন কুড়ির মধ্যেই পৌঁছে যাবেন।"

"আমার মনে হচ্ছে, আওরংজেব তার পরই বিজাপুর সীমান্তে হানা দেবে।"

"হ্যাঁ, আমাদেরও খবর তাই। আজ সকালে খবর পেয়েছি যে, শাহজাদার জিলওদার আকিল খাঁ আমাদের রাজ্যের সীমানায় নসরতপুরে এসে উপস্থিত হয়েছে কোনো একটা গোপনীয় কাজের উপলক্ষে।"

"গোপনীয়! সেটা কিসের সম্পর্কে, কিছু জানা গেছে?"

"না, এখনো জানতে পারিনি, তবে আমাদের হরকরা ও খুফিয়া-নবিসেরা নজর রেখেছে সীমান্তের উপর। আশা করছি দু-একদিনের মধ্যেই জানতে পারবো।"

"খাঁ-মহম্মদ!"

"হুকুম করুন বেগম সাহিবা।"

"কাল বাজারের সামনে গোলমাল হয়েছিল কেন? ব্যাপারটা কি? আমি যাদের খবর নিতে পাঠিয়েছিলাম, ওরা কেউ এসে সঠিক কিছু বলতে পারলো না।"

"খুব সামান্য ব্যাপার," নিস্পৃহ কণ্ঠে খাঁ-মহম্মদ উত্তর দিলো, "সুলতান-এ-আদিল যখন ঘোড়ায় চড়ে টহল দিতে বেরিয়েছিলেন, তখন হঠাৎ এক ব্যক্তি তাঁর অশ্বের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে তাঁর গতি-রোধ করে একটি আরজ্ পেশ করবার জন্যে।"

"কি আরজ্?"

"এমন বিশেষ কিছু নয়। বেগম সাহিবা, এসব সামান্য ব্যাপার আপনার শ্রুতিগোচর হওয়ার মতো নয়।"

"আমি শুনতে চাই।"

"ওই লোকটার ফরিয়াদ ছিলো এই যে, সুলতানের কয়েকজন খওয়াস্ নাকি তার যুবতী কন্যাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। সে বলতে চায়,—তার কন্যাকে নিয়ে আসা হয়েছে কেল্লার ভিতর। বাজারে জোর গুজব, খুদ সুলতানের নির্দেশেই নাকি এই অন্যায় সংঘটিত হয়েছে।"

বড়ী সাহিবার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হোলো। কিন্তু অনুত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "তারপর?"

"লোকটা পথের মাঝখানেই চিৎকার করে বলছিলো, তার কন্যাকে ফিরে না পেলে সে সুলতানের পথ ছেড়ে নড়বে না।"

"কিন্তু তাকে প্রকাশ্য রাজপথে চাবুক মারা হোলো কেন?"

"ঘটনাটা খুবই অপ্রীতিকর। সুলতান জানালেন, এসব ছোটো-খাটো অভিযোগের প্রতিকার করা তাঁর দায়িত্ব নয়, এর জন্যে সে কোতোয়ালিতে যেতে পারে। কোতোয়াল যদি তার অভিযোগের তদন্ত না করে তাহলে সুলতান কোতোয়ালকে নির্দেশ দেবেন। কিন্তু একথা শুনেও সে পথ ছেড়ে উঠলো না।"

"সেই অপরাধে কি তাকে চাবুক মারতে হয়?"

"না, বেগম সাহিবা, সেজন্যে তাকে চাবুক মারা হয়নি। সুলতানের ডান দিকে ছিলো মুল্লা করিম বক্স্। সে নাকি শুনতে পেয়েছিলো লোকটি খুব নিম্ন কণ্ঠে সুলতানকে উদ্দেশ করে একটা কটূক্তি করছে। তাই সে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে চাবুক মেরেছিলো।"

শুনতে শুনতে বড়ী সাহিবার নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠেছিলো। গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "সব কাজ একটু বিবেচনা করে করতে হয়। পথের পাশে লোকেরা তো শুনতে পায়নি সেই কটূক্তি। ওরা শুধু দেখলো যে এক নির্যাতিত যুবতীর পিতা সুলতানের কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে চাবুকের প্রহারে জর্জরিত হোলো। সুলতানের নামে একটি অবাঞ্ছনীয় গুজব সৃষ্টি করার জন্যে কি এই ঘটনা যথেষ্ট নয়? তাতে কি প্রজাদের কাছে সুলতানের ইজ্জত বাড়ে? দেশের এই পরিস্থিতিতে সুলতান যদি জনপ্রিয়তা হারায়, তাহলে সেটা কি রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলকর হবে? আপনি বিজাপুরের উজীর, আপনার কর্তব্য এই পরিস্থিতির হাত থেকে সুলতানকে বাঁচানো।"

"সুলতান অল্পবয়স্ক তরুণ," খাঁ-মহম্মদ কুণ্ঠিতস্বরে বললো, "বয়েসের খেয়ালে যদি—"

"ওসব যুক্তি আমি শুনতে চাই না," বড়ী সাহিবা কঠিন কণ্ঠে বললো, "কিছুদিন আগে দৌলতপুরের একটি হিন্দু যুবতীকে নিয়ে এরকম ঘটনা শোনা গেছে। মুল্লা আসরফ্-উদ্দিনের কন্যাকে আমার নাম করে মহলে আমন্ত্রণ করে আনিয়ে আলি যেই অশোভন আচরণ করলো তার সঙ্গে, তার ফলে আসরফ্-উদ্দিনের মতো একজন বিশ্বস্ত সর্দার আমাদের শত্রু হয়ে গেল। এরকম ঘটনা যে আরো ঘটেনি তা নয়। আপনার অজানাও কিছু নেই। সেদিন বেগম-হওজের কাছে একটি লোককে আলি অকারণ তলোয়ারের আঘাতে নিহত করলো শুধু এই অপরাধে যে, লোকটা সুলতানকে তসলিম জানায়নি। লোকটা যে অন্ধ, সেটা পর্যবেক্ষণ করবার ধৈর্যও আলির ছিলো না। সামান্য অপরাধে খোজা হারুনকে জ...

কবর দিলো তিন দিন আগে। আপনার মতো বিচক্ষণ উজীর থাকতে এসব ঘটনা ঘটে কেন?”

“তিনি আপনার সন্তান—,” খুব মৃদু কণ্ঠে খাঁ-মহম্মদ বললো।

“মা নিবৃত্ত করবে সন্তানকে, কিন্তু দুর্বিনীত সুলতানকে রাশ টেনে রুখে রাখবে তার উজীর। সুলতান হয়ে যে-ক্ষমতা তার হাতে এসেছে, সেই ক্ষমতার গর্বে সে এসব অন্যায় করছে। সুতরাং এসব ব্যাপারে আমার কোনো দায়িত্ব নেই। দায়িত্ব আপনার। আমার সন্তান হিসাবে সে যদি কোনো অন্যায় করে, তাহলে আমিই রুখবো তাকে।”

বড়ী সাহিবার যুক্তি শুনে উজীর চমৎকৃত বোধ করে মনে মনে হাসলো। মুখে বললো, “আপনি যদি মানা করেন, তা হলে—”

“এসব ব্যাপারে কিছু বলতে যাওয়া আমার পক্ষে কি করে সম্ভব? এধরণের হীন প্রসঙ্গ নিয়ে আমার সন্তানের সঙ্গে কোনো আলোচনা করতে আমার ইজ্জতে বাধে। এরকম ব্যাপারে নিজের মুখে তাকে কিছু বলা আমার পদমর্যাদায় সাজে না।”

খাঁ-মহম্মদ কোনো উত্তর দিলো না।

বড়ী সাহেবা আস্তে আস্তে বললো, “সুলতানকে বুঝিয়ে বলবেন, দেশের এই চরম বিপদের মুহূর্তে, যখন আমাদের আজাদী বিপন্ন, জনসাধারণের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালোবাসা, এসব হারানো বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের শত্রুপক্ষ যথেষ্ট শক্তিমান। দেশের ভিতরেও আপনার প্রতিপক্ষ দুর্বল নয়। সবাই সুলতানের এই ক্রমবর্ধমান কুখ্যাতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। আপনি বুদ্ধিমান লোক। আপনিই উপায় নির্ধারণ করুন যাতে আমার সন্তান সুলতান আলি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে, তার খ্যাতনামা পূর্বপুরুষদের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি লাভ করে।”

এমন সময় একজন খোজা খাদিম এসে জানালো আলা-উল-মুল্‌ক সিদ্দি মর্‌জন বড়ী সাহিবার খিদমতে হাজির আছেন।

অনুমতি পেয়ে আনত মুখে কক্ষে প্রবেশ করলো বিজাপুরী ফৌজের মির বক্‌শি সিদ্দি মর্‌জন্। মাটির দিকে চোখ রেখে অভিবাদন করলো বড়ী সাহিবাকে।

"আমাকে ইত্তলা দিয়েছেন বেগম সাহিবা?"

"হ্যাঁ, সিদ্দি মর্‌জন। এক মাসের মধ্যেই আমরা মোগল ফৌজের আক্রমণ আশা করতে পারি বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।"

"বিজাপুরী ফৌজ যে-কোনো অবস্থার জন্যে প্রস্তুত আছে, বেগম সাহিবা।"

"কিন্তু আমাদের সমস্যা অনেক। অবিলম্বে প্রধান সর্দারদের নিয়ে একটা মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন আমাদের প্রতিরক্ষা ও সমরনীতি নির্ধারণের জন্যে। এই ব্যাপারে উজীর খাঁ-মহম্মদ সিদ্দি দিলাওয়ার, মুল্লা আহমদ, মুস্তাফা খাঁ, আফজল খাঁ, শর্জা খাঁ, খওয়াস খাঁ, সিদ্দি মসাউদ, বাহ্‌লোল খাঁ ও আবদুল করিম প্রমুখ বিভিন্ন সর্দারদের অভিমত ও পরামর্শ চেয়েছিলেন। কিন্তু ওঁদের মধ্যে অনেকেই সহযোগিতা করতে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না।"

"দেশের এই সংকটেও?"

"হ্যাঁ," উত্তর দিলো খাঁ মহম্মদ, "আফগান ও সিদ্দিদের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক বৈরিতাই এই সহযোগিতার প্রধান অন্তরায়। মাহ্‌দবি সৈয়দেরা অনেকে আমাদের পক্ষ সমর্থন করে, কিন্তু নবাইয়ত গোষ্ঠীভুক্ত আরবী মুল্লারা সবাই আমাদের বিপক্ষে।"

"ওঁদের কি এই ইচ্ছা যে, মোগলেরা বিজাপুর অধিকার করুক," সিদ্দি মর্‌জন জিজ্ঞেস করলো।

"তা নয়। ততোখানি দেশদ্রোহী ওরা হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না," উত্তর দিলো বড়ী সাহিবা, "কিন্তু ওরা উজীর খাঁ-মহম্মদকে অপসারিত করতে চায়। তাঁর উপর তাদের আস্থা নেই। অথচ আপনি জানেন খাঁ-মহম্মদ স্বর্গীয় সুলতানের আমল থেকেই রিয়াসতের খিদমত করে আসছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতার

প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে। তাঁর স্থান গ্রহণ করতে পারে, এরকম যোগ্য ব্যক্তি বিজাপুরে আর নেই।”

“শুধু খাঁ-মহম্মদকে উপলক্ষ করেই যে ওদের বিরুদ্ধাচরণ, একথা আমি স্বীকার করে নিতে পারছিনা,” বললো সিদ্দি মর্জন, “রাজ্যের এই বিভিন্ন গোষ্ঠিদের মধ্যে বৈরিতা বংশানুক্রমিক।”

“কিন্তু আপনাদের স্বর্গীয় সুলতানের আমলে,” বড়ী সাহিবা উত্তর দিলো, “এসব ঝগড়া বিবাদ বৈরিতা অনেক মিটে গিয়েছিলো।”

“স্বর্গীয় সুলতানকে সবাই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর নেতৃত্ব ছিলো অবিসংবাদিত।”

“হ্যাঁ! তাঁর অবর্তমানে এসব বিরোধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবার প্রবল হয়ে উঠেছে। এসব আশু প্রশমিত হওয়া প্রয়োজন। সেজন্যেই আপনাকে আজ স্মরণ করেছি সিদ্দি মর্জন।”

“হুকুম করুন। আমি আমার যথাসাধ্য করবো।”

“আপনার প্রতি সকলে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে। আপনি রাজ্যের প্রধান সেনাপতি, আপনার যোগ্যতা সম্বন্ধে কারো কোনো দ্বিমত নেই। বিজাপুরী ফৌজকে আপনি যেভাবে পুনর্গঠিত ও সুশিক্ষিত করেছেন, তাতে সবাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন দলভুক্ত সর্দারেরা আপনাকে মানে। তাই আমার অনুরোধ, আপনি উদ্যোগী হয়ে রাজ্যের সর্দারদের বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব গ্রহণ করুন।”

সিদ্দি মর্জন অপাঙ্গদৃষ্টিতে উজীর খাঁ-মহম্মদকে নিরীক্ষণ করলো। ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো “আমার খুবই 'খুশ্-কিসমতি যে, আপনি আমাকে এই গুরুদায়িত্বের যোগ্য স্থির করেছেন। কিন্তু, এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলে আমাকে কয়েকটি কথা বলতে হয়। সেসব কথা কিন্তু ঈষৎ অপ্রিয় মনে হতে পারে।”

“আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন সিদ্দি মর্জন।”

"বেগম সাহিবা, স্বর্গীয় সুলতানের আমলে যে এসব দলাদলি ছিলো না, তার প্রধান কারণ সুলতানের ব্যক্তিত্ব, এবং তাঁর দৃঢ় চরিত্র। তিনি ছিলেন প্রজাসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়। তাঁর দয়া করুণা, মহত্ত্ব ও অন্যান্য চরিত্রগুণ আমরা কেউ আজো বিস্মৃত হইনি। কিন্তু বেগম সাহিবা, এসব কথা আমাদের শ্রদ্ধেয় মালিক-ই-জাহাঁ বর্তমান সুলতান সম্বন্ধে বলা যায় না। সুন্দরী যুবতী, সুরা এবং দুশ্চরিত্র মুসাহিব ছাড়া আর কিছুতে আগ্রহান্বিত নন্ আমাদের সুলতান। আমি আজ দুদিন ধরে চেষ্টা করে কিছুতেই তাঁর সাক্ষাৎ পাচ্ছি না। বিজাপুরী ফৌজের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করাতে চাই তাঁকে। কিন্তু—"

"তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা আমার মারফতেই করা উচিত ছিলো মির বকশি সাহেব," গম্ভীর কণ্ঠে বললো উজীর খাঁ-মহম্মদ।

"উজীর সাহেব, আপনার দায়িত্ব রাজ্যশাসন। আমার দায়িত্ব দেশরক্ষা। আমি আপনার অধীনস্থ নই। সুলতান এ রাজ্যের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সুতরাং ফৌজের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করার অধিকার আমার আছে।"

খাঁ-মহম্মদ ক্রোধভরে উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাকে নিবৃত্ত করে বড়ী সাহিবা বললো, "আমরা অনর্থক উত্তেজিত হয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি।'

সিদ্দি মর্জন সংযত হয়ে বলতে লাগলো, "বেগম সাহিবা, আপনি আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করছেন, আমি সেটা গ্রহণ করতে সক্ষম একটি শর্তে।"

"বলুন- "

"বর্তমান শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।"

"কি রকম ?" ভ্রূকুঞ্চিত করে বড়ী সাহিবা জিজ্ঞেস করলো।

"রাজ্যের সবাই জানে যে সুলতান রাজকার্যে নিস্পৃহ, তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পড়ে থাকেন মহলের ভিতর। রাজ্য পরিচালনা

করেন আপনি, খাঁ-মহম্মদ আর আপনার ভগ্নীপতি আফজল খাঁ। আপনাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার কোনো কিছু বলবার নেই, কিন্তু আপনাদের তিনজনই যে হয়ে পড়েছেন রাজ্যের প্রকৃত মালিক, এই পরিস্থিতি অনেক সর্দারের কাছেই অপ্রীতিকর মনে হচ্ছে। তারা মালিক-ই-জাহাঁ সুলতান আলি আদিল শাহ্‌র হুকুম মানবে, সুলতানের প্রতিভূদের নয়। আপনারা নেপথ্যে সরে যান, সুলতানকে সামনে আসতে দিন, তারপর আমি একদিনের মধ্যে সব বিবাদ বিরোধের অবসান ঘটিয়ে দিচ্ছি। তা নইলে আমি নিরুপায়।"

উজীর খাঁ-মহম্মদের মুখে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট, রাজমাতা বড়ী সাহিবার মুখে অপ্রসন্ন গাম্ভীর্য। দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বড়ী সাহিবা বললো, "সিদ্দি মর্‌জন বিজাপুরের হিতৈষী, তাঁর প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করে দেখবো। তবে আলি এখনো অনভিজ্ঞ। রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার হাতে তুলে দেওয়া বিজাপুরের পক্ষে মঙ্গলকর হবে কিনা সেটা বিচার্য। আলি আমার একমাত্র সন্তান। সে বিজাপুরের যোগ্য সুলতান হোক, তার রাজত্ব বিজাপুরের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় হোক, এই আমার একমাত্র কাম্য। সে এখনো অপরিণত বয়স্ক। এই গুরু-দায়িত্ব একলা বহন করবার শক্তি সে এখনো অর্জন করেনি। যদ্দিন সে সম্পূর্ণ সক্ষম না হচ্ছে, তদ্দিন আমাকে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেই হবে। দেশের ভিতরে দলীয় সংঘাত, দেশের বাইরে প্রবল প্রতিপক্ষ, এই জটিল পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত হলে সে দিশা-হারা হয়ে যাবে। সে আরো একটু প্রবীণ হোক, তার বয়েসের এই সব সাময়িক দোষগুলি কেটে যাক, মোগলদের সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া হয়ে দেশ নিরাপদ হোক, শান্তি ফিরে আসুক। দেশ আরো সমৃদ্ধিশালী হোক।—সেই অবস্থায় শাসনভার তার হাতে তুলে দেবো, তার আগে নয়।"

সিদ্দি মর্‌জন কোনো উত্তর দিলো না।

"আপনি এবার বিদায় গ্রহণ করতে পারেন আলা-উল-মুল্‌ক," বললো বড়ী সাহিবা।"

সিদ্দি মর্‌জন তসলিম করে চলে যাচ্ছিলো, দ্বারপ্রান্তে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো, তারপর বলে উঠলো, "বেগম সাহিবা, যদি কোনো একদিন কেউ এসে বলে,—আমিই সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ এবং হজরত বড়ী বেগম সাহিবার আসল সন্তান, এই তখ্‌ত্‌ আমার, এখন যাকে তখ্‌ত্‌এ কায়েম দেখছো ইনি অজ্ঞাতকুলশীল,—তার কথা সত্যি হোক বা মিথ্যে হোক, রাজ্যের ভিতরে যেই অন্তর্বিপ্লব শুরু হওয়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রস্তাব বিবেচনা করবেন। কারণ, সে রকম কোনো অবস্থায়—"

তার কথাগুলো ডুবে গেল খাঁ-মহম্মদের অট্টহাসিতে। উজীর হাসতে হাসতে বললো, "সিদ্দি মর্‌জন, জানেন এরকম কথা কেউ বললে তাকে কোতল করা যেতে পারে?"

ডান হাত কোষবদ্ধ তরবারির হাতলে স্থাপনা করে সিদ্দি মর্‌জন বললো, "কেউ চেষ্টা করে দেখুক—।"

"খাঁ-মহম্মদ, সিদ্দি মর্‌জন," ভর্ৎসনার সুরে বড়ী সাহিবা বলে উঠলো, "আপনারা দুজনেই আমার সামনে অশালীন হয়ে উঠছেন।"

"আমাদের মার্জনা করবেন বড়ী সাহিবা—।"

"খাঁ-মহম্মদ, সিদ্দি মর্‌জনের সঙ্গে আপনিও বিদায় গ্রহণ করতে পারেন। আমার মনে হয়, অবিলম্বে সুলতানের সঙ্গে সিদ্দি মর্‌জনের সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যান ওঁকে।"

উজীর খাঁ-মহম্মদ আর সিদ্দি মর্‌জন অভিবাদন করে চলে গেল। ওরা দৃষ্টির অন্তরাল হবার পর বড়ী সাহিবা আর নিজের উত্তেজনা চাপতে পারলো না। অধীরভাবে পদচারণা করতে লাগলো ঘরের ভিতর।

এমন সময় খোজা খাদিম এসে জানালো, সর্দার ইকবাল খাঁ বড়ী সাহেবের খিদমতে হাজির আছেন।

মহার্ঘ আসবাবপত্রে সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষের মাঝখানে গালিচার উপর একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে চুপচাপ কি যেন চিন্তা করছিলো ইয়ার ওসমান বেগ্।

এমন সময় একজন খাদিম থালাভর্তি ফল ও রৌপ্যনির্মিত পান-পাত্র ভর্তি শরবত নিয়ে ঘরে ঢুকলো। আনত হয়ে তসলিম করে বললো, "নাশ্‌তা করে নিন, মালিক।"

ওসমান মুখ ফিরিয়ে তাকালো খাদিমের দিকে। একটা কৌতুকের হাসি স্ফুরিত হোলো তার অধরের কোণে। জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা হুসেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

"হুকুম করুন, মালিক।"

"তোমরা সবাই আমাকে তসলিম করো কেন?"

একটু চুপ করে রইলো হুসেন। তারপর উত্তর দিলো, "আমাদের উপর তাই হুকুম করা আছে, মালিক।"

ওসমান একটি আঙুর মুখে দিলো। তাকিয়ে দেখলে হুসেনকে। জিজ্ঞেস করলো, "হুসেন, এ অঞ্চলটার নাম কি?"

"জুহ্‌রাপুর।"

"এখান থেকে বিজাপুর শহর কতদূর?"

"জুহ্‌রাপুর হোলো বিজাপুরের শহরতলি। এই অঞ্চল শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে।"

চুপচাপ আবার ভাবতে লাগলো ওসমান। দুদিন হোলো সে এখানে এসেছে। কিন্তু এঘরের বাইরে কোথাও যায় নি। দিনের বেলা তার এঘর থেকে বেরোনো মানা। শুধু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনায় আসবার পর হুসেনের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে একতলায়

নেমে বাড়ির পাশের বাগিচায় ঘোরা ফেরা করতে পারে কিছুক্ষণ। এটা মহলের সামনের দিক। পেছন দিকে যাওয়ার উপায় নেই। দু-তিনজন খোজা অন্দরমহলের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে থাকে সব সময়। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দূর থেকে দেখতে পায় ওসমান বেগ্। হুসেন তাকে ওদিকে এগোতে দেয় না। বাগিচা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। কেউ আসেনা এদিকে। ওসমান বেগ্ বুঝতে পারে যে, পাহারা আছে বাইরে, আশে পাশে, চারদিকে। সবাই যেন ওসমানে দৃষ্টির আড়ালেই থাকে, ক্বচিৎ কদাচিৎ ছায়ার মতো দেখা যায় দু-একজনকে। দেখে মনে হয় সাধারণ ভৃত্য, কিন্তু হুসেনের কাছে শুনেছে, প্রত্যেকেই সশস্ত্র, খাটো কৃপাণ লুকোনো আছে প্রত্যেকের বসনের অন্তরালে।

হুসেনের দিকে তাকিয়ে ওসমান একটু হেসে বললো, "আজ কয়েকমাস ধরে আমি যেন কয়েদি হয়ে আছি। আগ্রায় সুখে ছিলাম।"

হুসেন উত্তর দিলো, "আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থা করার হুকুম আছে আমার উপর। কোনো ত্রুটী হলে আমায় আদেশ করবেন।"

"আমি বাইরে বেরোতে চাই।"

"আমার উপর সেই হুকুম নেই, মালিক।"

"আমি জানি," আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো ওসমান বেগ্, "আমার ওয়ালিদ ইয়ার ইসমাইল বেগ্ আমায় বলেছেন,— তুমি যা চাও, হুকুম করার সঙ্গে সঙ্গেই পাবে, কিন্তু— এ আমার কড়া হুকুম, এ হুকুম তোমায় মুখ বুজে মেনে নিতে হবে,—দিনের বেলা এই কক্ষের বাইরে তুমি যেতে পারবে না। রাত্রির অন্ধকারে কিছুক্ষণের জন্যে বাগিচায় টহল দিতে পারো। কিন্তু হুসেন সব সময় তোমার সঙ্গে থাকবে। আর তোমার তলোয়ার কক্ষনো কাছ-ছাড়া করবে না, এক মুহূর্তের জন্যেও নয়।"

"কিন্তু আমাকে এ ভাবে থাকতে হচ্ছে কেন ?—ওসমান জিজ্ঞেস করেছিলো ইসমাইল বেগকে—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ধৈর্য ধরো।—উত্তর দিয়েছিলো ইসমাইল বেগ্—আর অল্প কয়েকদিন মাত্র। তারপর সবই জানতে পারবে।

ইসমাইল বেগ্এর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো পূর্বদিন অপরাহ্নে। ওসমান শুনলো যে, ইসমাইল বেগ্ ঠিক সেই মাত্র বিজাপুরে উপনীত হয়েছে। এসেই আর অপেক্ষা করেনি কোথাও। সোজা এসে মিলিত হয়েছে ওসমানের সঙ্গে।

আম্মাজান কোথায় ?—জিজ্ঞেস করেছিলো ওসমান।

ইসমাইল বেগ্ এবং ওর সঙ্গে অন্য তুজন যারা ছিলো সবাই পরস্পরের দিকে তাকালো। তারপর ইসমাইল বললো,—ফতিমা আমার এক পুরাতন বন্ধুর গৃহে মেহ্মান হয়ে আছে।

—ওঁকে আমার কাছে এনে রাখলেন না কেন ?

—ওসমান, কিছুদিন আমাদের আলাদা আলাদা থাকাই প্রয়োজন। আমিও ফতিমার সঙ্গে নেই, আতিথ্য গ্রহণ করেছি আরেক জায়গায়।

—কেন ?"

—যারা আমাদের ক্ষতি করতে চায়, এমন একদল লোক আমাদের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। সেজন্যে এই সতর্কতা।

ওসমানের আর কিছু বলার ছিলো না। ইসমাইল বেগ্এর কথার অবাধ্য হতে শেখেনি কখনো।

ইসমাইল বেগ্ চলে গেল। ওঁর সঙ্গে অন্য তুজনও চলে গেল, যাওয়ার আগে তসলিম করে গেল ওসমানকে।

"হুসেন," জিজ্ঞেস করলো ওসমান, "ওরা আমাকে তসলিম করলো কেন ? আমি কি আগ্রার বাদশাহ্ ?"

নির্বিকার কণ্ঠে হুসেন উত্তর দিলো, "মালিক, মেহ্মানকে বাদশাহ্র মতো খাতির্ করাই এই মহলের রেওয়াজ।"

"এটা কার মহল হুসেন ?"

"বিজাপুরের এক সর্দারের মহল।"

"ওঁর নাম কি ?"

"মালিক সবই জানবেন কয়েকদিন পরে।"

"আমার ওয়ালিদের সঙ্গে যে দুজন ছিলেন, ওঁদের খুব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলে মনে হোলো। ওঁরা কারা ?"

"ওঁরাও বিজাপুরের দুজন বিশিষ্ট সর্দার।"

"আমার কি ওঁদের নাম জানাও মানা ?"

"মানা কিছুই নয় মালিক, শুধু কিছুদিন আপনাকে সম্পূর্ণ নির্ভাবনায় আরাম করতে দেওয়ার হুকুম আছে আমার উপর। নানাকথা জেনে আপনি ভাবনা চিন্তা না করেন, সেজন্যই এই ব্যবস্থা।"

"যদি ভাবনা চিন্তা করি ?" ওসমান হাসলো, "জানো হুসেন, এই তলোয়ার আমায় কে দিয়েছেন ? এটা ইনাম দিয়েছিলেন আগ্রার শাহ-ই-আলিজা দারা শিকো। বলেছিলেন, আমার হাতে যেন এই তরবারির অমর্যাদা না হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই তলোয়ারকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার সুযোগ পাইনি। আগ্রা ত্যাগ করার আগেই কিছু সময় কয়েদখানায় ছিলাম। তারপর থেকেও একরকম নজরবন্দী হয়ে আছি। আওরঙ্গাবাদে শাহজাদা আওরংজেব বলেছিলেন, উনি আমায় মনসব দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করবেন। তাই যদি হোতো তো মোগল ফৌজের সঙ্গে আমিও শিগ্‌গিরই বিজাপুরে হানা দিতাম। তা তো হোলোনা, আমি বিজাপুরে এসে এখানকার এক মশ্‌হুর ব্যক্তির মেহ্‌মান হয়ে আছি। ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌এর কাছে শুনলাম শাহজাদা আওরংজেব নাকি ওঁকে আর আমাকে কয়েদ করবার চেষ্টায় ছিলেন। সে জন্যেই এরকম তাড়াতাড়ি বিজাপুরে পালিয়ে আসা। জানিনা, কেন এ ইচ্ছা হয়েছিলো শাহজাদার, বোধ হয় আমার

ওয়ালিদ শাহ-ই-আলমের প্রিয়পাত্র বলে। কিন্তু, একটা কথা তোমায় বলে রাখি হুসেন, যতক্ষণ আমার হাতে ওই তলোয়ার, ততক্ষণ শাহজাদা আওরংজেব কি খুদ বাদশাহ শাহ জাহান কারো সাধ্য নেই আমার ওয়ালিদকে বন্দী করে। তবে সুযোগ আর হোলো কোথায়? এখানে এত আরামে জেনানার খাতুনদের মতো জীবন যাপন করলে দুদিনে আমার মেরুদণ্ড নরম হয়ে যাবে। তখন আর এ তলোয়ার আমার কোনো কাজে আসবে না। এ শুধু আমার সাজ-পোশাকের শোভাবর্ধন করবে মাত্র। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ইয়াদ্ করবো, ছিলো এক জমানা, যখন ইয়ার ওসমান বেগ্ তলোয়ার চালাতে জানতো।”

নিজের মনে একটানা কথা বলে চলেছিলো ওসমান। নির্বিকার ভাবলেশহীন মুখে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলো হুসেন। ওসমান থামতে বললো, “মালিক, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, হয়তো শিগ্‌গিরই আপনার তলোয়ার তার যথাযথ মর্যাদা পাবে।”

“সে আর কবে!” অবিশ্বাসের হাসি হাসলো ওসমান। মনে হচ্ছে এই দুদিনেই যেন এক দীর্ঘ যুগ অতিক্রম হয়ে গেছে। অথচ তার আগে কয়েকটা দিন কেটে গেছে এক উত্তেজনার মধ্যে।

মোগল সিলাহ্‌দারদের আসতে দেখে মিনাজী ভোঁসলের সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে এসেছিলো ওসমান। গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখে ইসমাইল বেগ্ অধৈর্য হয়ে তার প্রতীক্ষা করছে। আসতেই বললো, —এখানে আর নয়, এই মুহূর্তে মিনাজী ভোঁসলের সঙ্গে তুমি বিজাপুরের দিকে রওনা হও। আমরাও আসছি অন্য পথে। আওরঙ্গাবাদ আমাদের জন্যে আর নিরাপদ নয়।

আপনি খবর পেয়েছেন?—মিনাজী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো।

হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে খাঁ-ই-জামান মির খলিল ইকবাল খাঁর ওখানে এসে খবর দিয়ে গেছে,—উত্তর দিয়েছিলো ইসমাইল বেগ্।

খাঁ-ই-জামান মির খলিল? ওসমান অবাক হয়েছিলো এই নাম শুনে। কেল্লার ভিতরে শেখ মির তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলো ওসমানকে।

তারপর কয়েকটা দিন একটানা পথ অতিক্রম করতে হয়েছে অশ্বারোহণে। সোজা পথে মোগল টহলদার সেনার হাতে ধরা পড়বার ভয় ছিলো। শাহজাদার সিলাহ্‌দারেরা যে তার অনুসরণ করবে সেই সম্ভাবনাও ছিলো। সুতরাং তাদের যেতে হয়েছে ঘোরা পথে। অত্যন্ত দুর্গম সেই পথ, কিন্তু মারাঠা যোদ্ধা মিনাজী ভোঁসলের তা অজানা নয়।

ওরা বিজাপুর সীমান্তে উপনীত হয়েছিলো একদিন সায়াহ্নে। তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো চারজন লোক। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। একজনকে দেখে মনে হোলো অত্যন্ত সম্ভ্রান্তবংশীয়। ওসমান দেখলো, সে মীনাজী ভোঁসলের পরিচিত, তাকে খাঁ সাহেব বলে সম্বোধন করলো মিনাজী। পুরো নাম ওসমান জানতে পারলো না।

ওরা ওসমানকে দেখে যেন খুব আশ্চর্যান্বিত হোলো, নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। তারপর সেই খাঁ-সাহেব জিজ্ঞেস করলো মীনাজীকে, "ইনিই কি—"

"হ্যাঁ, ইনিই ইয়ার ওসমান বেগ্," মীনাজী উত্তর দিলো তাদের প্রশ্ন সমাপ্ত হওয়ার আগে, "এরই সংবাদ ইয়ার ইসমাইল বেগ্ পাঠিয়েছেন আপনাদের কাছে।"

নতুন লোক দেখলে মানুষের যে কৌতূহল হয়, এ যেন তা নয়, এদের দৃষ্টিতে এক দুর্বোধ্য বিস্ময়,—অন্তত ওসমানের তাই মনে হোলো। ওরা চারজন একসঙ্গে অবতরণ করলো অশ্ব থেকে। তারপর একসঙ্গে ভূতলে জানু রেখে ওসমানকে অভিবাদন করলো।

এই অভ্যর্থনায় ওসমান আরো বেশী বিস্মিত হোলো।

সীমান্ত থেকেই মিনাজী ভোঁসলে বিদায় নিলো, ওসমানকে এদের হেপাজতে দিয়ে। এদের সঙ্গেই ওসমান এলো বিজাপুরে।

আওরঙ্গাবাদের দিনগুলো মনে পড়ছিলো ওসমানের। হঠাৎ হুসেনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, সর্দার ইকবাল খাঁ কি বিজাপুরে ফিরে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ, উনিও কাল ফিরেছেন।"

"ওর পরিজনবর্গ ?"

"ওরা ফিরে এসেছে দু-দিন আগে।"

"এসেছে !" হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো ওসমান, "ওরা কোথায় ?"

হুসেন অবাক হয়ে তাকালো ওসমানের দিকে।

"ইকবাল খাঁর হাবেলি এখান থেকে কতো দূর ?"

"খুব বেশী দূরে নয়। বেগম-হওজ্‌এর কাছে।"

"হুসেন !" ওসমান ওর হাত চেপে ধরলো, "হুসেন, আমার একটা কাজ করে দেবে ?"

"হুকুম করুন মালিক।"

"হুসেন ! আমি তোমাদের সমস্ত নির্দেশ পালন করতে রাজী আছি, কিন্তু আমার একটা অনুরোধ,—ইকবাল খাঁর মহলে আমার একটা রুকা নিয়ে যেতে হবে।"

"মালিক, এই মহল থেকে কারো কোথাও আনাগোনা করা মানা।"

"হুসেন !"

"হুকুম করুন মালিক—।"

"হুসেন, আমি একবার দেখতে চাই আরজুমান-আরাকে, শুধু একবার।"

"আরজুমান-আরা !"

"হ্যাঁ, সর্দার ইকবাল খাঁর কন্যা, আমার মাশুক, আমার ভাবী পত্নী।"

হুসেনের মুখে কোনো ভাববিকার দেখা গেল না, কিন্তু দুচোখে কৌতুকের হাসি ঝিলমিল করে উঠলো। গাম্ভীর্য বজায় রেখে মুখে শুধু বললো, "মালিক, আগামী একপক্ষকাল আমি আপনাকে আমার নজরের বাইরে যেতে দিতে পারবো না।"

সর্দার শর্জা খাঁর হাবেলির এক কক্ষে অপেক্ষা করছিলো শর্জা খাঁ, মুল্লা রহমান, ইয়ার ইসমাইল বেগ, সিদ্দি দিলওয়ার আর ব্যাঙ্কজী ভোঁসলে। এমন সময় আরেকজন দীর্ঘদেহ পাঠান এসে উপস্থিত হোলো সেখানে।

"এঁকে চিনতে পারেন ?" ইসমাইল বেগকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো শর্জা খাঁ।

আগন্তুক এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। তারপর জড়িয়ে ধরলো ইসমাইল বেগকে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলো, "হামিদ খাঁ! কতো বছর পর—।"

"হ্যাঁ, মুস্তাফা খাঁ, আঠারো বছর,—না তো, উনিশ, হ্যাঁ, উনিশ বছর কেটে গেছে সেদিন থেকে।"

"আপনার কথা আমরা একদিনও ভুলিনি," আসন গ্রহণ করে বললো বিজাপুরের অন্যতম প্রখ্যাত সেনানায়ক মুস্তাফা খাঁ।

"আপনি কথা বলেছেন ওঁদের সঙ্গে ?" ব্যাঙ্কজী ভোঁসলে জিজ্ঞেস করলো।

"সবার সঙ্গে বলিনি। নিরাপদ নয়। তবে সর্দার আবদুল মহম্মদ, সর্দার আহমদ খাঁ, মুল্লা আহমদ ও সর্দার আবদুল কারিমের সঙ্গে কথা বলেছি। সিদ্দি মর্জনকেও দলভুক্ত করতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো। কিন্তু সে কোনো ষড়যন্ত্র বা কূটনীতির মধ্যে থাকতে চায় না।"

"ওঁরা কি বললেন ?" জিজ্ঞেস করলো মুল্লা রহমান।

"খাঁ-মহম্মদকে পদচ্যুত করে সর্দার আবদুল মহম্মদকে উজীর

করতে প্রস্তুত হলে ওঁরা আমাদের সর্বপ্রকারে সহায়তা করবেন। হামিদ খাঁ বিজাপুরে উপস্থিত হয়েছে এবং আমাদের স্বর্গীয় সুলতানের ও বড়ী সাহিবার আসল সন্তানও এখানে উপস্থিত আছেন শুনে ওঁদের মধ্যে একটা উত্তেজনা এসেছে।"

"ভালো। মুল্লা রহমান, সর্দার আবদর রওফ, সর্দার খিজির খাঁ পানি ও সর্দার খওয়াস খাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। ওঁদের উপর পুণার শিবাজী ভোঁসলের প্রভাব খুব বেশী। শিবাজী তাঁদের নির্দেশ পাঠিয়েছেন আমাদের সহায়তা করবার জন্য। তিনি একথাও জানিয়েছেন যে উজীর খাঁ-মহম্মদ ও সর্দার আফজল খাঁকে যদি ক্ষমতাচ্যুত করা যায়, তাহলে তিনি আমাদের পক্ষভুক্ত হয়ে শাহজাদা আওরংজেবের মোগল ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন।"

"ওঁরা সবাই স্বর্গীয় সুলতানের পুত্রকে চাক্ষুষ নিরীক্ষণ করতে চাইছেন," বললো মুস্তাফা খাঁ।

"এখনো সময় হয়নি," গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো ইসমাইল বেগ্, "ওঁকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে খুব গোপন জায়গায়। লোক জানা-জানি হলে তার জীবন সংশয় হতে পারে। তাঁকে যথাসময়ে নিশ্চয়ই সবার সামনে উপস্থিত করা হবে।"

"এখন আমাদের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কি চূড়ান্তভাবে কিছু স্থির হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো মুস্তাফা খাঁ।

শর্জা খাঁ একটু ভেবে উত্তর দিলো, "চূড়ান্তভাবে এখনো কিছু স্থির হয়নি তবে একটা পরিকল্পনা মোটামুটি স্থির করা হয়েছে। সর্দার ইকবাল খাঁ সাক্ষাৎ করতে গেছেন বড়ী সাহিবার সঙ্গে—।"

"তাঁকে জানানো হবে?" মুস্তাফা খাঁ সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো।

"তাঁকে না জানিয়ে কিছু করা অনুচিত হবে," উত্তর দিলো ইসমাইল বেগ্।

"হামিদ খাঁ, আমি জানতে চাইছি তাঁকে জানানো নিরাপদ হবে কিনা।"

"ওসমানই যে তাঁর আসল সন্তান এটা জানলে কি তিনি এমন কোনো কাজ করবেন যাতে ওসমানের অমঙ্গল হয়?"

"হামিদ খাঁ," ইসমাইল বেগকে সম্বোধন করে বললো মুস্তাফা খাঁ, "বড়ী সাহিবা ক্ষমতালোলুপ নারী। উজীর খাঁ-মহম্মদ এবং সর্দার আফজল খাঁর সহায়তায় তিনিই রাজ্য শাসন করছেন। রাজনীতিতে ভাবপ্রবণতার কোনো স্থান আছে?"

"মায়ের সামনে সন্তানকে উপস্থিত করে দেওয়া আমার কর্তব্য," ইসমাইল বেগ্ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলো, "আমি স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র কাছ থেকে এই সন্তানকে গ্রহণ করেছিলাম, তাঁর অবর্তমানে তাঁর পত্নী এবং এর জননীর কাছেই আমি একে প্রত্যার্পণ করবো।"

"তারপর যদি ওর কোনো বিপদ হয়—?"

"তাকে রক্ষা করাও আমার কর্তব্য। তার সমস্ত পরিকল্পনাও স্থির হয়ে আছে। বড়ী সাহিবা আমাদের সহায়তা করেন ভালো, যদি না করেন তাহলেও কোনো ক্ষতি নেই।"

"কি আমাদের পরিকল্পনা?"

"পরশুদিন কিলা অর্কএর চৌকির ভার পড়েছে সর্দার শর্জা খাঁর উপর" বললো সিদ্দি দিলওয়ার, "সেদিন আমরা সবাই ওর চৌকির সাধারণ সৈনিকের ছদ্মবেশে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করবো।"

"তারপর?" ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মুস্তাফা খাঁ।

ইসমাইল বেগ্ শান্ত ভাবে উত্তর দিলো, "তারপর জানে আমাদের তলোয়ার আর আমাদের তকদির।"

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলো সর্দার ইকবাল খাঁ।

সবাই উঠে দাঁড়ালো। সিদ্দি দিলওয়ার ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "সাক্ষাৎ হোলো বড়ী সাহিবার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ," ক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো ইকবাল খাঁ।

"ওকে জানিয়েছেন? কি বললেন উনি?"

ইকবাল খাঁ আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "ওঁকে জানিয়েছি, ওঁর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করবার জন্যে শাহ্-ই-আলিজা দারা শিকো ইয়ার ইসমাইল বেগ্ নামে এক প্রতিনিধিকে এখানে পাঠিয়েছেন। বেগম সাহিবা রাজী হয়েছেন সাক্ষাৎ করতে,—দারা শিকোর দূত ইয়ার ইসমাইল বেগের সঙ্গে।

কিলা অর্কএর চৌহদ্দির ভিতরে সুলতানের মহলের কাছেই উজীর খাঁ-মহম্মদের দফ্তর। দ্বিতল হর্ম্যের পেছন দিকের একটি নিভৃত কক্ষে খাঁ-মহম্মদ এবং সর্দার আফজল খাঁর সামনে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে ছিলো সিদ্দি হানিফ।

উজীর খাঁ-মহম্মদের মুখভাব শান্ত, অবিচলিত কিন্তু চোখ দুটি জ্বলছে অঙ্গারের মতো। বয়েসের ভারে আনত ঈষৎ খর্বাকৃতি দেহ গভীর চিন্তায় নিশ্চল হয়ে আছে তাকিয়ার উপর ভর দিয়ে। সর্দার আফজল খাঁ বড়ী সাহিবার ভগ্নীপতি, সুলতানের খানদানের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত। রাজ্য পরিচালনা আফজল খাঁর কাছে একটা পারিবারিক ব্যাপারের বেশী কিছু নয়, এই ভাবধারানিসৃত দম্ভ চোখে মুখে সুস্পষ্ট। ওর দীর্ঘ শালপ্রাংশু অমিতশক্তিমান দেহ একাসনে স্থির হয়ে থাকতে পারেনা, মনের চাঞ্চল্যে পার্শ্ব পরিবর্তন করছে বার বার। ক্রোধে নাসারন্ধ্র স্ফুরিত।

তাদের সামনে নির্বাক কুণ্ঠায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সিদ্দি হানিফ।

"ওসমানের কথা সুলতানের সামনে উত্থাপিত করার কী দরকার ছিলো," ভর্ৎসনার সুরে বলে উঠলো খাঁ-মহম্মদ, "শুধু আমাদের কাছে জানাতে, আমরা যা ব্যবস্থা করার করতাম। সুলতান কোনোদিন জানতেও পারতেন না, তাঁর মনের শান্তির বিঘ্ন হোতো না। এখন, এই ব্যাপারে ওঁকে না জানিয়ে কিছু করা যাবে না।"

"সুলতান আলি তো দেখতে চেয়েছে এই ওসমানকে," বললো

আফজল খাঁ, "বলছে, যেখান থেকে হোক তাকে ধরে নিয়ে এসো আমার কাছে।"

"সুলতান তো হুকুম দিয়ে খালাস," খাঁ-মহম্মদ বিরক্তি প্রকাশ করলো।

"তুমি ঠিক জানো ওসমান নামে সেই যুবকটি বিজাপুরে এসেছে?" জিজ্ঞেস করলো আফজল খাঁ।

"হ্যাঁ, মালিক, এ বিষয়ে আমার কোনো সংশয় নেই।"

"আশ্চর্য ব্যাপার, ভাবা যায় না। এরকম হতে পারে বলে কোনোদিন শুনিনি।"

খাঁ-মহম্মদ রাগে ফুলছিলো। বলে গেল, "সিদ্দি ওয়াজিদ, মুল্লা মুখতার, সিদ্দি ফজলুল, সিদ্দি ইব্রাহিম, হাসান আলি, আবদুল রহিম,—আমার বাছা বাছা লোক সব শেষ হয়ে গেল! তুমি অত্যন্ত অবিবেচকের মতো কাজ করেছো সিদ্দি হানিফ।"

"আমার নসীব খারাপ, কিছু করবার ছিলো না।"

"এতগুলো লোক মিলে একটি লোককে ধরতে পারলে না?"

আফজল খাঁ বললো, "অন্য সংবাদও যা পেলাম, সেসব তো ভালো লাগছে না। সর্দার ইকবাল খাঁর কাছে শাহজাদা আওরংজেবের মির আতশ খাঁ-ই-জামান মির খলিলের অবিরাম আনাগোনা, শিবার চর মিনাজী ভোঁসলে আর অন্যান্য সন্দেহজনক ব্যক্তিদের সঙ্গে সর্দার শর্জা খাঁ, মুল্লা রহমান ও ব্যাঙ্কজী ভোঁসলের গোপন যোগাযোগ,—এসব তো আশ্বস্ত হবার মতো সংবাদ নয়। আমি ওই শিবা লোকটিকে একেবারে বিশ্বাস করি না। আমাদের ধোঁকা দিয়ে সে রায়পুর সিংহগড় ও তোর্ণ দুর্গ অধিকার করে বসে আছে। আওরংজেবের সঙ্গে এদের একটা যোগসাজস নেই তো? আমরা তো কয়েকটি অত্যন্ত উদার শর্ত দিয়েছিলাম, কেন সন্ধি করতে রাজী হয়নি আওরংজেব? নিশ্চয় এব্যাপারে এদের কোনো হাত ছিলো।"

"এসব তো শুধু অনুমান মাত্র," মন্তব্য করলো খাঁ-মহম্মদ।

"দেশের সামনে যা পরিস্থিতি তাতে দেশের শত্রুদের সম্বন্ধে কোনো উদারতা দেখানো নিরর্থক। আমার পরামর্শ যদি গ্রহণ করতে চান অবিলম্বে শর্জা খাঁ, মুল্লা রহমান, ব্যাঙ্কজী এবং আবদুল মহম্মদ প্রমুখ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গিরফ্তার করে কয়েদ করুন খাঁ-মহম্মদ।"

"এখন নয়," খাঁ-মহম্মদ আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "তাতে রাজ্যের বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে সংঘাত আরো তীব্রতর হবে। দেশের এই পরিস্থিতিতে সেটা বাঞ্ছনীয় নয়।"

"তাহলে কি করবেন?"

"আমার মনে হচ্ছে সব কিছুর সঙ্গে এই ওসমান নামক ব্যক্তিটির রহস্য জড়িয়ে আছে। আগে আমার তাকে চাই।"

"এই ইয়ার ইসমাইল বেগ্ লোকটি কে?" জিজ্ঞেস করলো আফজল খাঁ।

"ঠিক জানি না," সিদ্দি হানিফ উত্তর দিলো, "ওসমান বললো সে তার পিতা। তাদের সঙ্গে তার জননীও আছে।"

কিছুক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তা করলো খাঁ-মহম্মদ। তারপর আফজল খাঁর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, সর্দার আফজল খাঁ, আমাদের স্বর্গীয় সুলতানের সন্তান সম্বন্ধে একটা গুজব চলে আসছে আজ আঠারো বছর ধরে, এই ওসমানের সঙ্গে সেই গুজবের কোনো সম্পর্ক নেই তো?"

আফজল খাঁ হেসে উঠে বললো, "আপনাদের এসব আশঙ্কা অমূলক, খাঁ-মহম্মদ। এই গুজবের কোনো ভিত্তি নেই। সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ বড়ী সাহিবার সমক্ষে কোরাণ ছুঁয়ে স্বীকার করেছিলেন যে, এই আলি তাঁরই সন্তান। আমাদের আর এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ঠিক নয়।"

"এই ওসমানকে আমার চাই," পুনরাবৃত্তি করলো খাঁ-মহম্মদ।

"আমার মনে হয় সর্দার শর্জা খাঁ ও সর্দার ইকবাল খাঁ সুলতানের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। আমি বড়ী সাহিবার সঙ্গে আজই কথা বলবো।"

"ওসব পরে হবে। আগে এই ওসমানকে আমার চাই। এই রহস্যের কিনারা করতে হবে। ওর সম্বন্ধে আমার মনে একটা কৌতূহল জেগেছে।"

"বিজাপুরে এত লোক। তাদের মধ্যে কোথায় সে লুকিয়ে আছে, সেটা খুঁজে বার করা দুচারদিনের কাজ নয়। হরকরাদের একাজে নিয়োগ করলে আগে পরে তার সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, কিন্তু ততদিন শর্জা খাঁ ও ইকবাল খাঁ সম্বন্ধে নিস্পৃহ থাকা কি বাঞ্ছনীয়?"

"ওসমানের সন্ধান দুএকদিনের মধ্যেই পেতে হবে," দৃঢ়কণ্ঠে বললো উজীর খাঁ-মহম্মদ।"

"দুএকদিনের মধ্যেই? সেটা কিভাবে সম্ভব?" জিজ্ঞেস করলো আফজল খাঁ।

উজীর খাঁ-মহম্মদ ফিরে তাকালো সিদ্দি হানিফের দিকে, "তুমি না বলছিলে এই ওসমান সর্দার ইকবাল খাঁর কন্যা আরজুমান আরার আশিক?"

"হ্যাঁ, ওরা গোপনে মিলিত হোতো প্রত্যেকদিন। সে সংবাদ আমি পেয়েছি," সিদ্দি হানিফ উত্তর দিলো।

উজীর খাঁ-মহম্মদ হাসলো। "সেখান থেকেই আমাদের অনুসন্ধান আরম্ভ করতে হবে সিদ্দি হানিফ। ওসমান যেখানেই লুকিয়ে থাক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে ইতিমধ্যে একদিন না একদিন আরজুমান-আরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেই।"

হুসেনের দেখা নেই সারাদিন। ওসমান ঘুমিয়ে, পদচারণা করে নিজের মনে দিওয়ান আবৃত্তি করে অপরাহ্ণ কাটিয়ে দিলো।

এই নিঃসঙ্গ দিনগুলি তার কাছে বন্দীজীবনের মতো অসহ্য হয়ে উঠেছে। আওরঙ্গাবাদেও যথেষ্ট কড়াকড়ি ছিলো, কিন্তু সেখানে তার বাইরে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতাও ছিলো। এখানকার মতো সারাদিন এরকম একটি কক্ষের ভিতরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হোতো না। কাল থেকে ইয়ার ইসমাইল বেগেরও দেখা নেই। ফতিমার সঙ্গে তো দেখাই হয়নি আওরঙ্গাবাদ ছেড়ে আসবার পর থেকে। সবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে একটা দুঃসহ ব্যাকুলতা বোধ করছিলো ওসমান।

বাইরে কখন অন্ধকার ঘিরে এলো। সন্ধ্যার পর খাদিম নিয়ে এলো নানারকম উপাদেয় আহার্য। কিন্তু আহারে একেবারে রুচি নেই। বেশী খেতে পারলো না ওসমান। খাদিমকে জিজ্ঞেস করলো, "হুসেন কোথায় ?"

"উনি বাইরে গেছেন, সায়াহ্নকালের মধ্যেই ফিরে আসবেন।"

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না। আহার সমাধা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই হুসেন ফিরে এলো।

ওসমান বিমর্ষ হয়ে চুপ করে বসেছিলো।

"বাগিচায় একটু তফরি করতে যাবেন না ?" হুসেন জিজ্ঞেস করলো।

"না, কিছুই ভালো লাগছে না এখন।"

"চলুন। বাইরে খোলা হাওয়ায় একটুখানি বেড়ালে ভালো লাগবে।"

হুসেনের অনুরোধে ওসমান আসন ছেড়ে উঠলো। এগিয়ে যাচ্ছিলো দরজার দিকে।

"মালিক, আপনার তলোয়ার—"

"কি দরকার, মহলের চৌহদ্দির মধ্যেই তো থাকবো।"

"না মালিক, আপনাকে এক মুহূর্তের জন্যেও নিরস্ত্র থাকতে দেওয়া যাবে না। ইয়ার ইসমাইল বেগ্ সাহেবের হুকুম।"

নিস্পৃহতার সঙ্গে খাপশুদ্ধ তলোয়ার কমরবন্দ-এর সঙ্গে বাঁধালো ওসমান। তারপর হুসেনের সঙ্গে নিচে নেমে বেরিয়ে এলো উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাগিচায়।

তখন কৃষ্ণপক্ষের রাত। কালো আকাশে শুধু অসংখ্য তারা। বাগিচার ভেতর জমাট অন্ধকারে উড়ে বেড়াচ্ছে একরাশ জোনাকি।

অন্যান্য দিন হুসেন একটি গাছতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। চারদিকে নিজের মনে পায়চারি করে ওসমান বেগ্। কিন্তু সেদিন হুসেন এগিয়ে গেল না গাছতলার দিকে। বাগানে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকিয়ে নিলো। তারপর ওসমানকে বললো, "আসুন আমার পেছন পেছন—।"

পাঁচিলের কাছে এসে বললো, "পাঁচিলটা ডিঙোতে হবে। উঠতে পারবেন ওই শিকড় ধরে? দাঁড়ান, আগে আমি উঠছি, তারপর আপনাকে সাহায্য করবো।"

"সহায়তার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু পাঁচিলটা ডিঙোতে হবে কেন?" জিজ্ঞেস করলো ওসমান।

"দুটি ঘোড়া বাঁধা আছে পাঁচিলের বাইরে।"

"কিন্তু যাচ্ছি কোথায় আমরা?"

একটু চুপ করে রইলো হুসেন। তারপর উত্তর দিলো, "আরজুমান-আরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন।"

বেগম্ হওজের কাছে সর্দার ইকবাল খাঁর হাবেলি। এ অঞ্চলটা একেবারে নির্জন নয়। কিছু দোকানপাট আছে আশেপাশে। পথে যে লোক চলাচলও একেবারে নেই তা-নয়। পথের দুপাশেই বাড়িঘর আছে, বিভিন্ন জানলা থেকে আর দোকানগুলোর ভিতর থেকে বাতির রোশনাই পথের উপর এসে পড়ে খানিকটা দূর করেছে রাত্রির অন্ধকার।

একটি দোকানের সামনে বসে একটি লোক পরাটা কাবাব খেতে খেতে গল্প করছিলো দোকানদারের সঙ্গে। একটা চাপা কণ্ঠের ডাক শুনে সে ফিরে তাকালো, তারপর উঠে পড়লো খাওয়া ছেড়ে। একটু দূরে ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলো একজন। তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো. "কি ব্যাপার সিদ্দি হানিফ?"

সিদ্দি হানিফ তাকে একটু ভৎর্সনা করলো। সন্ধ্যার পর পাহারা আরো সতর্ক হওয়া দরকার, পরাটা কাবাব খাওয়া ও গল্প করার সময় এটা নয়।

ইকবাল খাঁর হাবেলির আশেপাশে ছড়িয়ে ছড়িয়ে অন্ধকারের অন্তরালে আত্মগোপন করে ছিলো আরো কয়েকজন। ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তদারক করে এলো সিদ্দি হানিফ।

একজনের সঙ্গে কথা বলছিলো সে, এমন সময় কানে এলো অশ্ব পদধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার আড়ালে মিশে গেল সবাই।

"ঘোড়ায় চড়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে আসবে বলে মনে হয় না," বললো সিদ্দি হানিফ, "তবু নজর রাখা দরকার।"

নাতিদ্রুত বেগে ছুটে আসছে দুটি দীর্ঘকায় আরবী ঘোড়া।

"ফৌজেরই কেউ হবে," বললো সিদ্দি হানিফের সঙ্গী।

সে কোনো উত্তর দিলো না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

অশ্বারোহী দুজন ইকবাল খাঁর হাবেলির প্রবেশপথ অতিক্রম করে, সিদ্দি হানিফ ও তার সঙ্গীদের পেরিয়ে এগিয়ে চলে গেল। এক মুহূর্তের জন্যে আলো পড়লো একজনের মুখে, অন্যজনের মুখ ছিলো ছায়ার আড়ালে।

"লোকটিকে চেনা মনে হোলো—," আস্তে আস্তে বললো সিদ্দি হানিফ।

"হ্যাঁ," উত্তর দিলো তার সঙ্গী, "ও সিদ্দি দিলওয়ারের অনুচর হুসেন ইমাম।"

"হুসেন? হ্যাঁ, ওকে আমি দু-একবার দেখেছি কিলা অর্কএ,"
বললো সিদ্দি হানিফ, "অন্য লোকটার মুখ দেখতে পেলাম না।"

"সেও হবে সিদ্দি দিলওয়ারের মহলের কেউ।"

"যাই হোক," বলে উঠলো সিদ্দি হানিফ, "ইকবাল খাঁর মহলে যারা ঢুকবে বা ওখান থেকে যারা বেরোবে, শুধু ওদেরই উপর নজর রাখো। অন্য কারো সম্বন্ধে আপাতত আমার কোনো আগ্রহ নেই।"

"ওই লোকটা কে ঢুকছে সামনের ফটক দিয়ে?"

সিদ্দি হানিফ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইকবাল খাঁর হাবেলির প্রবেশ পথের দিকে তাকালো। তারপর বললো, "ভৃত্যদের মধ্যে কেউ হবে। আমি ওর মুখ চিনি। আওরঙ্গাবাদেও দেখেছি। আমরা যার প্রত্যাশায় আছি, সে হাবেলির সামনের প্রবেশপথ ব্যবহার করবে বলে মনে হয় না।"—নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো সিদ্দি হানিফ।

হুসেন আর ওসমান বেগ্ অশ্বারোহণে এগিয়ে গেল আরো খানিকটা পথ।

"ইকবাল খাঁর হাবেলি আর কতদূর?" জিজ্ঞের করলো ওসমান।

"পেছনে ফেলে এসেছি।"

ওসমান রাশ টেনে অশ্বের গতি সংবরণ করলো।

"আমরা তাহলে যাচ্ছি কোথায়?"

"যেখানে আরজুমান-আরা আছেন, সেখানে। ইকবাল খাঁর হাবেলিতে যাওয়ার কথা তো হয়নি।"

আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো ওসমান বেগ্। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "এই সাক্ষাতের আয়োজন নিশ্চয়ই খুব গোপন?"

হুসেন হাসলো। উত্তর দিলো, "গোপন না হলে প্রাচীর

ডিঙিয়ে আসার প্রয়োজন হতো না। আমাদের হাবেলির বন্ধ দরওয়াজার ভিতরে সশস্ত্র পাহারা। ইয়ার ইসমাইল বেগ্ ও আমার মালিকের বিনা অনুমতিতে ওরা আপনাকে বাইরে আসতে দিতো না।”

“রাত্রে যদি কেউ এসে দেখে আমি ঘরের ভিতর নেই ?”

“কেউ আসবে না, মালিক। আমি ছাড়া আর কারো যাওয়ার হুকুম নেই।”

কিছুক্ষণ আবার ওরা পথ চললো চুপচাপ। তারপর ওসমান হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “তুমি নিশ্চয়ই শুধু আমার অনুরোধে আমাকে এভাবে লুকিয়ে হাবেলি থেকে বার করে আনোনি।”

“না, মালিক, শুধু আপনার অনুরোধ আমার পক্ষে রাখা সম্ভব হোতো না।”

“তাহলে ?”

“একটু পরে সবই জানতে পারবেন।”

খানিকটা এগিয়ে পথের বাঁকে একটি উচ্চ প্রাচীরঘেরা অভিজাত মঞ্জিল। ওরা এগিয়ে আসতে নিঃশব্দে ফটক খুলে গেল। ওরা দুজনে অশ্বারোহণেই চলে গেল প্রাচীরের ভিতরে। ফটক পেছন দিকে আবার বন্ধ হয়ে গেল নিঃশব্দে। ওসমান মুখ ফিরিয়ে দেখলো দুজন ভৃত্য দাঁড়িয়ে আছে ফটকের পাশে।

“এখানে নামতে হবে ঘোড়া থেকে।”

ওসমান অশ্ব থেকে অবতরণ করে এগিয়ে চললো। মঞ্জিলের প্রায় সমস্ত ঘরই অন্ধকার, শুধু দ্বিতল ত্রিতলের দু-একটি কক্ষের জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে।

হুসেন সোজা মহলের ভিতর ঢুকলো না, ওসমানকে নিয়ে বাঁধানো আঙিনা পার হয়ে ডানদিকের একটি ছোটো দরজার সামনে দাঁড়ালো। তারপর বললো, “মালিক, আপনি ভেতরে

চলে যান। দরজাটা এমনি ভেজানো আছে। একটু এগিয়ে সামনে সিঁড়ি দেখতে পাবেন। সোজা দোতলায় উঠে যান। একটু সাবধানে যাবেন। আলো নেই এখানে।”

ঠেলা দিতে দরজা খুলে গেল। ওসমান ভেতরে ঢুকলো। হুসেন দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিলো। ভেতরে গাঢ় অন্ধকার। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ওসমান। প্রথমটা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। একটু পরে অন্ধকার চোখে সয়ে যেতে দেখতে পেলো একপাশে সরু পাথরের বাঁধানো সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে গেছে। দুপাশে পাথরের দেওয়াল। হাতড়ে হাতড়ে ওসমান উপরে উঠে এলো। সেখানে প্রদীপ জ্বলছে এক পাশে। অন্ধকার থেকে আলোতে এসে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। চোখ রগড়ে নিলো ওসমান। তারপর চোখ খুলে দেখে সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে একজন।

“আম্মি!”

ফতিমা বিবি এগিয়ে এলো ওসমানের দিকে।

“ওসমান!”

সে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো ফতিমাকে।

“ও আম্মিজান! কতোদিন দেখিনি তোমায়—।”

“ওসমান, কি রকম রোগা হয়ে গেছ তুমি।”

“আম্মি, তুমি এখানে কি করে এলে?”

“এটি সর্দার হবিব-উল্লা খাঁর মঞ্জিল। আমি এঁদের এখানেই মেহমান হয়ে আছি।”

“আব্বাজান এখানে আসেন?”

“এর মধ্যে শুধু একদিন এসেছেন। খুব ব্যস্ত। ফুরসত নেই।”

“আমাকেও এখানে তোমার সঙ্গে রাখে না কেন আম্মি?”

একটু চুপ করে রইলো ফতিমা বিবি। তারপর রুদ্ধকণ্ঠে বললো, “যে উদ্দেশ্য সাধনে আমরা সবাই এদেশে এসেছি, সেটা

সফল হলে হয়তো সব সময় আর তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকা আমাদের পক্ষে হয়ে উঠবে না, বাবাজান!"

"আম্মি, এসব রহস্য আমার আর ভালো লাগছে না। কি এমন গুরুতর ব্যাপার যে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারবো না? ওরকম হলে,—না, আম্মি, কিছুই চাই না আমি, শুধু তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই। আমি আমার মাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।"

ফতিমা কোনো উত্তর দিলো না। চোখ ছলছল করে উঠলো। বুকে চেপে ধরলো ওসমানকে।

"আম্মি, আমি এখানে কি করে এলাম? তুমি বুঝি হুসেনকে বলে আমাকে আনিয়েছো?"

"হ্যাঁ বাবাজান। হুসেন আগে ছিলো সর্দার হবিব-উল্লা খাঁর অনুচর। ওর মৃত্যুর পর এখন সিদ্দি—ম্—না বাবা, কারো কোনো নাম ধাম এখন মুখে আনা মানা,—এখন অন্য একজন বিশিষ্ট সর্দারের অধীনে কর্মগ্রহণ করেছে হুসেন। তবে এবাড়িতেই শৈশব থেকে প্রতিপালিত হয়েছে বলে খুব মানে হবিব-উল্লা খাঁর স্ত্রীকে। উনি আমায় কনিষ্ঠা ভগ্নীর মতো স্নেহ করেন। তোমায় না দেখে আর থাকতে পারছিলাম না। তবে তা হলেও তোমায় এত ঝুঁকি নিয়ে আসতে দিতাম না। কিন্তু আরেকজনের কষ্ট আমার আর সহ্য হচ্ছিলো না। তার কষ্ট দেখে আমি আর হবিব-উল্লা খাঁর হুসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তোমাকে এখানে আনিয়েছি। কিন্তু একটি কথা বাবাজান, ফেরার সময় খুব সাবধানে থাকবে, আর সামনের পনোরো কুড়ি দিন আমার মালিকের নির্দেশ ছাড়া তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে না।"

"আম্মি, তোমার ছেলে দুনিয়ায় কাউকে ভয় পায় না, তার কোনো বিপদ হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি সাবধানে থাকবো। কিন্তু আরেকজন কার কথা বলছিলে আম্মি?"

ফতিমা হাসলো। "বাবাজান, তুমি কি আমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যেই এতটা পথ এসেছো?"

এতক্ষণে ওসমানের খেয়াল হোলো। ফতিমা বিবির সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়ার আনন্দে সে ভুলেই গিয়েছিলো।

"হ্যাঁ। আরজুমান-আরা। হুসেন তো বলেছিলো ওর সঙ্গেই দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্যে সে আমায় নিয়ে আসছে এখানে। কিন্তু—কিন্তু আরজুমান-আরা কোথায়? তুমি কি ওকে চেনো আম্মিজান?"

"এসো আমার সঙ্গে।"

ফতিমা বিবির পেছন পেছন একটি কক্ষে প্রবেশ করলো ওসমান। দরজার দিকে পেছন ফিরে ঝরোকার কাছে বসে আছে এক তন্বী নারীমূর্তি।

"চেয়ে দেখতো ওকে চিনতে পারো কিনা?"

ওসমানের উত্তরের অপেক্ষা করলো না ফতিমাবিবি, কথাটা বলেই আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে গেল ঘর থেকে।

ফতিল-সোজএর উপর জ্বলছে একটি বড়ো রুপোর চিরাগ। চঞ্চল প্রদীপশিখার অস্থির আলোকে বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে ঘরের ভিতরের দীর্ঘ ছায়াগুলো। মেয়েটি ডান হাত দিয়ে ফিরোজা রঙের দুপাট্টায় মুখ ঢেকে বসেছিলো। আস্তে আস্তে মুখ ফেরালো। ধীরে অপসারিত করলো মুখের আবরণ।

"আরজুমান-আরা!" দুকদম এগিয়ে গেল ওসমান বেগ্।

"এসো, আমার কাছে এসে বোসো," আরজুমান-আরা শান্ত কণ্ঠে বললো।

ওসমান ওর কাছে এসে মাটিতে জানু পেতে বসে পড়লো। ব্যাকুল আবেগে বলে উঠলো, "আরজুমান-আরা, তোমায় আবার অন্তত একটি বারের জন্যে দেখতে পাওয়ার কামনায় মন ছটফট করতো প্রত্যেকটি মুহূর্ত।"

আরজুমান-আরার কণ্ঠ অত্যন্ত সংযত। বললো, "ওসমান তোমার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে, সে আশা আমার আর ছিলো না। ভেবেছিলাম, আমি আওরঙ্গাবাদ ছেড়ে চলে আসার পর তুমি হয়তো আমার জীবন থেকে একেবারে হারিয়ে গেলে। পিতার আদেশে আমাদের হঠাৎ বিজাপুর রওনা হতে হোলো। তোমায় খবর দেওয়ার কোনো সুযোগই পেলাম না। রাত জেগে চোখের জল ফেলা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিলো না। হয়তো এমনিই কেটে যেতো সমস্ত জীবন।"

"তুমি এবাড়িতে কি করে এলে?"

"সর্দার হবিব-উল্লা খাঁর পত্নী আমার খালাজান। শৈশবে মাতৃহীন হওয়ার পর আমি ওঁরই কাছে মানুষ হয়েছি। ফতিমা বিবি যে তোমার ওয়ালিদা সে কথা তো জানতাম না। উনি এই কদিনে আমার মাতৃসমা হয়ে উঠেছেন। আমার কষ্ট আমি গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ধরা পড়ে গিয়েছিলো ওঁদের চোখে। তোমার কথা আমি ওঁদের না বলে পারিনি।"

"যদি না বলতে, এভাবে দেখাও হোতো না।"

"ওসমান, আমায় কাল আবার আমার পিতার হাবেলিতে ফিরে যেতে হবে। তারপর আবার কখন দেখা হবে কে জানে।"

একটা কঠিন সংকল্পের ভাব দেখা দিলো ওসমানের মুখের উপর। বললো, "আরজুমান-আরা, এবার যখন তোমায় ফিরে পেয়েছি, আমাদের আর কেউ জুদাহ্ করতে পারবে না।"

"ওসমান, ভুল আমারই হয়েছিলো। পিতাকে জানিয়েছিলাম তোমার কথা, বলেছিলাম তুমি ওর কাছে এসে আমাকে বিবাহ করবার অনুমতি চাইবে, এবং এই বিবাহে আমার অমত নেই। কথাটা এতখানি ঘুরিয়ে বলেছিলাম বলে তিনি জোর গলায় তাঁর অসম্মতি জানাবার সুযোগ পেয়েছিলেন, আমায় জোর করে এখানে পাঠিয়ে দিতে পেরেছিলেন। যদি স্পষ্ট ভাষায় একথা বলতে

পারতাম যে বিধিমতো বিবাহ হোক বা না-হোক, তুমিই আমার স্বামী, তোমার কাছ থেকে আমায় দূর সরিয়ে রাখা অন্যায় হবে, তাহলে হয়তো এই কদিনের এত কষ্ট আমায় সহ্য করতে হত না। তবে এই অভিজ্ঞতা থেকে মনে এমন একটা জোর পেয়েছি যে তোমার জন্যে আমি এখন যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি।"

"আরজুমান-আরা, চলো আমরা কোথাও চলে যাই।"

"আমি প্রস্তুত। কিন্তু ফতিমা বিবি বলছিলেন তোমার ওয়ালিদ নাকি কোনো একটা বিশেষ প্রয়োজনে তোমায় বিজাপুরে নিয়ে এসেছেন, যার জন্যে তোমায় কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকতে হবে।"

"তুমি কি জানো, সেই বিশেষ প্রয়োজনটা কি ?"

"না, খালাজান কি ফতিমা বিবি, কেউ আমায় বিশেষ কিছু বলেন নি।"

"আরজুমান-আরা, এই ব্যাপারে আমিও কিছু জানিনা। তবে বিশ্বাস করো আমায়, এই অবস্থা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি আজ তিনমাস ধরে এই একই কথা শুনছি, শাহ-ই-আলিজার নির্দেশে বিজাপুরে আসতে হয়েছে আমার ওয়ালিদকে, এবং আমার উপর একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা সময় হলে আমাকে জানানো হবে। আজ তিনমাসের মধ্যে আমাকে জানানোর সময় কারো হয়নি। আমি শুধু কয়েদির মতো আবদ্ধ হয়ে আছি এক অজ্ঞাত রহস্যের কয়েদখানায়।"

"ওসমান, হয়তো তোমার জীবনের উন্নতি নির্ভর করছে এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করার উপর।"

"না, আমার এসব আর ভালো লাগছে না। আমি সৈনিক, তলোয়ার চালাতেই শিখেছি, ছিলাম আগ্রার বাদশাহ্‌র ফৌজে একজন সাধারণ আহাদি। সেই অবস্থাই ছিলো ভালো, সুখে

ছিলাম তখন, আশা ছিলো যে একদিন মনসবদার হবো নিজের গুণে। আমি সাধারণ লোক, সাধারণ পিতামাতার সন্তান, সাধারণভাবেই জীবন অতিবাহিত করা আমার কাম্য। এসব কূটনীতি ষড়যন্ত্র আমার জন্যে নয়। এই তিনমাসে অনেক দেখেছি, অনেক শিখেছি, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তোমাকেও আমি কোনো উচ্চাশা—সম্পদ, বিত্তবৈভব, উচ্চ রাজপদ ইত্যাদির প্রত্যাশা দিতে চাই না। তুমি যদি আমার সঙ্গে আসো, সাধারণ লোকের সাধারণ ঘরণী হয়েই আসতে হবে।"

"ওসমান, তোমাকে পেলেই আমার সব পাওয়া হয়ে যাবে। তার বেশী কিছু আমি চাই না।"

"আমি কালই কথা বলবো আমার ওয়ালিদ ইয়ার ইসমাইল বেগের সঙ্গে। ওদের কূটনৈতিক কর্মব্যস্ততা নিয়ে ওরা পড়ে থাকুক। আমার মুক্তি চাই এই আবহাওয়া থেকে। আমি বাইরের মুক্ত হাওয়ায় প্রাণভরে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে চাই, বাইরের সূর্যের আলোয় উপভোগ করতে চাই মুক্ত জীবন।"

"বাবাজান," ফতিমা বিবি ঘরের ভিতর এসে ডাকলো, "তোমাকে এবার যেতে হবে যে! বেশীক্ষণ বাইরে থাকা ঠিক নয় তোমার পক্ষে।"

"আম্মি—!"

"এবার তুমি ফিরে যাও বাবাজান," ওসমানের মাথায় হাত বুলিয়ে ফতিমা বললো।

"আরজুমান-আরা," ওর দিকে ফিরে বলে উঠলো ওসমান, "আমরা যখন চলে যাবো, আমার মাকেও নিয়ে যাবো আমাদের সঙ্গে।"

সিদ্দি হানিফ আর তার সঙ্গী দেখতে পেলো দ্রুত অশ্বচালনা করে ফিরে আসছে হুসেন ও তার সঙ্গী। ততক্ষণে রাত আরেকটু

গভীর হয়ে এসেছে, নিভে গেছে অনেক জানালার আলো। তাদের পেরিয়ে, ইকবাল খাঁর হাবেলি অতিক্রম করে চলে গেল দুই ঘোড়-সওয়ার।

"সিদ্দি হানিফ, আমাদের কি সারারাত জেগে নজর রাখতে হবে সর্দার ইকবাল খাঁর হাবেলির উপর?"

"হ্যাঁ হারুণ। সকাল বেলা পাহারা বদল হবে। দিনরাত কড়া নজর রাখতে হবে। তন ঘড়ি অন্তর অন্তর উজীর সাহেবকে জানাতে হবে কে কখন আসা যাওয়া করছে।"

"আজ সন্ধ্যা থেকে পাহারা মোতায়েন হয়েছে, কিন্তু দু-চারজন খাদিম ছাড়া আর তো কাউকে যাওয়া আসা করতে দেখলাম না।"

"আমরা যাকে খুঁজছি দু-একদিনের মধ্যেই দেখতে পাবে তাকে," আশ্বাস দিলো সিদ্দি হানিফ, "মৌমাছি মধুর আস্বাদন লাভ করেছে, না এসে যাবে কোথায়?"

"আপনি চিনতে পারবেন তাকে?"

"চিনতে পারবো না? আমি কারো মুখ একবার দেখলে [illegible] আর ভুলি না। আর, এ লোকটার মুখ ভুলবার নয়। বড় খুব-সুরত তার চেহারা।"

অল্প কিছুক্ষণের পথ মাত্র বাকী ছিলো। এমন সময় ঘটনাটা ঘটলো।

পথের একপাশে একটি গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়োয়ান ডাকলো।

"মালিক, একটু শুনবেন?"

হুসেন ভ্রুক্ষেপ না করে চলে যাচ্ছিলো কিন্তু ওসমান রাশ টেনে থেমে গেল বলে তাকেও থামতে হলো।

"কি ব্যাপার ভাই?"

"আমার গাড়ির চাকা পথের পাশে একটা গর্তের মধ্যে বসে গেছে। একা পেরে উঠছি না। আপনারা একটু মদত দেবেন?"

হুসেন চটে গেল। "গরুর গাড়ি নিয়ে এত রাত্তিরে বেরিয়েছো কেন? এটা তো নিয়ম নয়। কোতোয়ালের পিয়াদারা দেখলে যে ধরে নিয়ে যাবে।"

"কি করবো মালিক। কেল্লার ভেতরে এক সর্দারের কিছু সামান বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে বরাতগি শহর থেকে। ওঁর খাদিম কিরায়া মঞ্জুর করতে এত দেরি করলো এবং তারপর সর্দার সাহেবের মুন্সির ধমক খেয়ে এমন মেহমানদারি করলো যে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। তারপর আর বেরুতে পারি না কেল্লা থেকে। মুন্সিজী নিজে তদ্বির করে কেল্লাদারের কাছে থেকে দস্তক যোগাড় করার পরে বেরোতে পারলাম। তখন এক প্রহর রাত হয়ে গেছে। তারপর আস্তে আস্তে আসছি। এখানে এসে এই বিপত্তি।"

"তুমি বরাতগি যাবে? সে তো তিন ক্রোশ দূর। তাছাড়া শহরের দরওরাজাওতো বন্ধ হয়ে গেছে—।"

"না জনাব, আজ রাত্তির শহরেই থাকবো। আমার ভাই থাকে শাহ্‌পুরে। ওর ওখানেই যাচ্ছি।"

হুসেন আর ওসমান ঘোড়া থেকে নামলো। তারপর তিনজন ধরাধরি করে গরুর গাড়ির চাকা টেনে তুললো পথের পাশের গর্ত থেকে। অন্ধকারে পথ ঠাহর করতে পারেনি গাড়োয়ান। ভুল করে পথ ছেড়ে নিচে গর্তের মধ্যে গিয়ে নেমেছিলো।

এমন সময় সাত আটটা ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এলো।

ওসমান আর হুসেন পেছন ফিরে তাকালো। কয়েকজন ঘোড়-সওয়ার তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দু-তিন জনের হাতে জ্বলন্ত মশাল।

"কী সর্বনাশ," ত্রস্তকণ্ঠে হুসেন বলে উঠলো, "খুদ কোতোয়াল সিদ্দি ইউসুফ। ঘোড়ায় চাপুন তাড়াতাড়ি।"

"কেন ? ভয় পাওয়ার কি আছে ?" জিজ্ঞেস করলো ওসমান, "কোতোয়াল তো আমাদের চেনেনা। আর আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি।

"যা বলছি শুনুন। চলুন এখান থেকে।"

দুজনেই ঘোড়ায় চেপে বসলো। কিন্তু যাওয়া হোলো না। ওরা প্রায় কাছে এসে পড়েছে। এদের দেখে একজন চিৎকার করে উঠলো, "হু-কু-ম্-দা-র! কে ওখানে ?"

ওসমান ঘোড়ার মুখ ঘুড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো নির্ভয়ে। দাঁড়িয়ে পড়তে হোলো হুসেনকেও।

ওরা এদের কাছে এসে থামলো। কোতোয়াল সিদ্দি ইউসুফ একজন দীর্ঘদেহ হাবসী। ভারী গলায় জিজ্ঞেস করলো, "কে তোমরা ? এখানে কি করছো ?"

হুসেন উত্তর দিলো, "ওই লোকটার গাড়ির চাকা পথের পাশে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে আটকে গিয়েছিলো।"

"গরুর গাড়ি এত রাত্তিরে ?" আরেকজন এগিয়ে গেল গাড়োয়ানের দিকে, "তুমি কোত্থেকে আসছো ?"

গাড়োয়ান ভয় পেয়ে গেছে। কাঁদো কাঁদো গলায় কৈফিয়ত দিতে লাগলো সে।

"তোমরা কে ?" ওসমানের দিকে তাকালো সিদ্দি ইউসুফ। মশালের আলো পড়েছে ওসমানের মুখের উপর। সিদ্দি ইউসুফ তাকিয়ে থেকেই বলে উঠলো, "আরে, আপনি ?

শঙ্কায় হুসেনের বুদ্ধিভ্রংশ হোলো। চকিতে খাপ থেকে তলোয়ার বার করে বলে উঠলো, "পালান, ওসমান বেগ্, পালান এখান থেকে—।"

একসঙ্গে আটটি তলোয়ার উন্মুক্ত হয়ে তাদের উদ্দেশে উদ্যত হোলো। ওদের ঘিরে ফেলেছে আটজন সওয়ার।

"কী পাগলামি করছো, হুসেন," ওসমান শান্ত কণ্ঠে বললো।

তার হাত পৌঁছে গিয়েছিলো তলোয়ারের বাঁটে, কিন্তু তলোয়ার বারকরা আর হয়ে ওঠেনি। সে আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে নিলো।

"কিন্তু আপনি—," সিদ্দি ইউসুফ বলতে শুরু করলো ওসমানের দিকে তাকিয়ে।

তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ওসমান উত্তর দিলো, "আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন। আমি একজন মুসাফির। এই শহরে নতুন এসেছি।"

সিদ্দি ইউসুফ ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ওসমানের দিকে। অন্য সবার চোখও ওসমানের প্রতি নিবদ্ধ। হুসেন সুযোগ নিলো এদের এই অমনোযোগিতার। সে হঠাৎ তলোয়ার ঘুরিয়ে আঘাত করতে গেল সিদ্দি ইউসুফকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন সওয়ারের বর্শা আমূল বিদ্ধ হোলো তার বক্ষে। সে ঘোড়া থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

॥ নয় ॥

পূর্বাহ্ণ প্রথম প্রহরেই উজীর খাঁ-মহম্মদ উপস্থিত হন কেল্লার ভিতরে নিজের দফতর্‌এ। সিদ্দি হানিফ সেখানেই দেখা করতে এলো উজীরের সঙ্গে। তাকে বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো। শুনলো সর্দার আফজল খাঁর সঙ্গে কথা বলছে খাঁ-মহম্মদ। এই সংবাদ শুনে সিদ্দি হানিফ একটু বিস্মিত হোলো। এত সকালে তো কেউ বড়ো একটা আসে না, যদি না বিশেষ প্রয়োজন হয়। তা-ছাড়া, আফজল খাঁর সঙ্গে উজীর খাঁ-মহম্মদের কথাবার্তা যা কিছু হয় সাধারণত বড়ী সাহিবার দিওয়ানে। আজ কি এমন গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে যে, আফজল-খাঁ উপস্থিত হয়েছেন উজীর সাহেবের দফতর্‌এ।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলো আফজল খাঁ। খুব গম্ভীর তার সুগৌর মুখমণ্ডল। সিদ্দি হানিফ অভিবাদন করলো। কিন্তু আফজল খাঁ তাকালোই না তার দিকে। দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে চলে গেল।

সিদ্দি হানিফ এসে দাঁড়ালো খাঁ-মহম্মদের সামনে। খাঁ-মহম্মদ গম্ভীর ভাবে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কি খবর, সিদ্দি হানিফ, রাত্তিরে খুব মিষ্টি মধুর খোয়াব দেখেছো মনে হচ্ছে—।"

সিদ্দি হানিফ বুঝতে পারলো না কেন এরকম ব্যঙ্গোক্তি করছে উজীর সাহেব। তার মুখের চেহারা দেখে যে-কোনো ব্যক্তিই বুঝতে পারবে যে, সে সারারাত জেগে কাটিয়েছে। বললো, "খোয়াব দেখার অবসর পাইনি, মালিক। পাহারায় ছিলাম সারারাত।"

"ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। তারপর ?"

"বিশেষ কোনো খবর নেই। কাল সর্দার ইকবাল খাঁর হাবেলিতে কেউ আসেনি, কেউ সেখান থেকে বাইরেও যায়নি—শুধু দু-তিনজন খাদিম দু-একবার বাইরে এসেছিলো। সকালে পাহারা বদল হয়েছে। তবে ওসমান দিনের আলোয় সেখানে আসবে এটা অবিশ্বাস্য। সে আরজুমান-আরার সঙ্গে সব সময়েই রাত্রি প্রথম প্রহরের কিছু পরেই মিলিত হোতো। আমি আবার সন্ধ্যার পর পাহারায় থাকবো।"

"দরকার হবে না।"

সিদ্দি হানিফ বিস্মিত হোলো একথা শুনে। "কি বলছেন, মালিক ?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"তোমায় পাহারায় থাকার আর দরকার হবে না।"

"দরকার হবে না! কেন ?"

খাঁ-মহম্মদ একটু হাসলো। উত্তর দিলো, "ওসমান বেগ্ এখন কিলা অর্ক্এ আমাদের মেহ্মান হয়ে আছেন।"

"ওসমান বেগ্? কিলা অর্ক্এ!" বিস্ময়ের শেষ সীমায় উপনীত হোলো সিদ্দি হানিফ, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"কি করে বুঝতে পারবে ?" রাগে এবার ফেটে পড়লো উজীর খাঁ-মহম্মদ, "কাল রাত্তিরে সিদ্দি দিলাওয়ারের অনুচর হুসেনের সঙ্গে ওসমান যখন তোমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল ঘোড়া ছুটিয়ে তখন বুঝতে পেরেছিলে ? তোমার বুদ্ধির উপর ভরসা করে আমি হতাশ হয়েছি। সিদ্দি ওয়াজিদ, মুন্সী মুখতার, সিদ্দি ফজলুল, সিদ্দি ইব্রাহিম, হাসান আলি, আবদুল রহিম, এদের মতো কর্মদক্ষ হরকরাদের আমি হারিয়েছে শুধু তোমারই বুদ্ধির ভুলে। ওসমান তো কাল রাত্তিরে তোমার চোখেও ধুলো দিয়ে সরে পড়লো, নেহাৎ ওর নসীব খারাপ আর আমারও ভালো কিসমত্, তাই কোতোয়াল সিদ্দি ইউসুফের হাতে ধরা পড়ে গেল। তা-নইলে কি হোতো,

কে জানে! কি রকম একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের জাল তৈরী হয়েছিলো আমাদের চারদিকে, কোনোদিন জানতেই পারতাম না।"

স্তম্ভিত হয়ে খাঁ-মহম্মদের কথা শুনছিলো সিদ্দি হানিফ। হুসেনের সঙ্গে যে ছিলো সে ওসমান? স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি সে।

"তোমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলে তারই আধ ক্রোশ দূরে সে ধরা পড়লো কোতোয়ালের হাতে। রাত্তিরেই সিদ্দি ইউসুফ আমায় জাগিয়ে দিয়ে খবরটা জানায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোতোয়ালি থেকে এনে কেল্লার ভিতর রেখেছি কড়া পাহারায়। ইতিমধ্যে আমাদের হরকরা আরো অনেক সংবাদ আমাদের কর্ণগোচর করেছে। ইকবাল খাঁর কন্যা যে ইকবাল খাঁর হাবেলিতে নেই এখবরও নিশ্চয় তোমার জানা নেই।"

সিদ্দি হানিফ কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো।

খাঁ-মহম্মদ বলে গেল, "আজ শেষ রাত্তিরে অনেককে গিরফতার করা হয়েছে,—শর্জা খাঁ, মুল্লা রহমান, ব্যাঙ্কজী ভোঁসলে ও সর্দার আব্দুল মহম্মদ প্রত্যেকেই এখন কয়েদখানায়। সর্দার আহম্মদ খাঁ কোতোয়ালকে বাধা দিয়েছিলো বলে নিহত হয়েছে। হুসেন তো নিহত হয়েছে ওসমানকে ধরে ফেলার সময়ই। সর্দার মুস্তাফা খাঁ, সিদ্দি দিলওয়ার ও সর্দার ইকবাল খাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। ইয়ার ইসমাইল বেগ্ এবং ফতিমা বিবিও নিখোঁজ। ওরা কি করে খবর পেলো কে জানে! আরো কয়েকজন বিশিষ্ট সর্দারের উপর আমাদের নজর আছে। ওরা যে পুণার শিবাজী ভোঁসলের উৎকোচপুষ্ট, সে খবর আমরা পেয়েছি। আশা করছি দু-একদিনের মধ্যে ওঁদেরও কয়েদখানায় এনে বেঁধে রাখবার সুযোগ আমাদের হবে।"

"কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত প্রভাবশালী" বললো সিদ্দি হানিফ, "এঁদের কয়েদ করলে ফৌজে যদি বিদ্রোহ দেখা দেয়?"

"সিদ্দি মর্‌জন ও আফজল খাঁ কোনোদিন সেটা হতে দেবে না। ফৌজের উপর প্রভাব যদি কারো থাকে, শুধু ওদের দুজনের। দেশের আজাদী আজ বিপন্ন। যে কোনোদিন মোগল ফৌজ আক্রমণ শুরু করতে পারে। দেশের লোক মনে মনে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে আছে। এসময় জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে সুলতানের পেছনে পাওয়া দরকার। এর সবচেয়ে ভালো উপায় হোলো লোকের মনে কোনোরকম ষড়যন্ত্রের ভয় ধরিয়ে দেওয়া। শর্জা খাঁদের এই ষড়যন্ত্র খুব মওকা মতো পাওয়া গেছে। একদল সর্দারের আনুগত্য শিবাজীর প্রতি, আরেকদলের আনুগত্য এক অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির প্রতি,—এসব সর্দারদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে দেশের জনসাধারণ। এটা প্রমাণ করা কঠিন হবে না যে, এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আছে শাহজাদা আওরংজেব। তার প্রধান সাক্ষী তুমি। আওরংজেবের নিকট আত্মীয় খাঁ-ই-জামান মির খলিল যে ইকবাল খাঁর মহলে নিয়মিত যাতায়াত করতো, আওরংজেবের কন্যাদের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ ছিলো আরজুমান-আরার এবং এই ওসমান বেগ্‌ যে আওরংজেবের প্রিয়জন ও তার জিলওদার আকিল খাঁর বন্ধু, সে প্রাণ বাঁচিয়েছিলো আওরংজেবের,—এসব সংবাদ তোমাকে আম-দরবারে রাজ্যের সর্দারদের সমক্ষে জানাতে হবে সুলতানকে।"

"আপনার হুকুম হলে কোনো সংবাদই সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই," সিদ্দি হানিফ উত্তর দিলো।

"তুমি ইকবাল খাঁর হাবেলির দিকে ফিরে যাও। সুলতানের হুকুম নিয়ে আমাদের কোতোয়াল খুদ সেদিকে গেছেন। আজ [illegible] আরজুমান-আরা তার খালার ওখান থেকে নিজের হাবেলিতে ফিরে আসবে। কিন্তু তার পাল্কি সেখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাকে নিয়ে আসা হবে কিলা অর্কএ। তুমি আমার লোক হিসেবে নজর রাখবে এ নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করা

হচ্ছে কিনা। আরজুমান-আরা যেন তার হাবেলির কোনো লোকের সঙ্গে কোনো কথা বলবার সুযোগ না পায়।"

"আরজুমান-আরা ওর খালার বাড়িতে ছিলো? সেখানেই ওঁকে ধরা হচ্ছেনা কেন?"

"তাহলে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে," বললো খাঁ-মহম্মদ, "স্বর্গীয় সর্দার হবিব-উল্লা খাঁ সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র খুব অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। সুতরাং তাঁর পত্নীকে আমরা সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তিনি এসব জটিলতার মধ্যে নেই। তাই তাঁর মঞ্জিলে কোনো হামলা আমরা করতে চাই না। তা-ছাড়া তিনি বড়ী-সাহিবারও খুব অন্তরঙ্গ। হয়তো সমস্ত ব্যাপারটা তাহলে বড়ী-সাহিবার কানে উঠবে। উপস্থিত সেটা আমরা চাইনা। তাঁকে এখন কিছু জানতে না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহলে তাড়াতাড়ি সমস্ত ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করা যাবে। দরবারের পুরোনো সর্দারদের অনেকের প্রতি তাঁর একটা অকারণ দুর্বলতা আছে।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সিদ্দি হানিফ। কি যেন চিন্তা করছিলো সে।

"তুমি এবার বিদায় গ্রহণ করতে পারো," বললো খাঁ-মহম্মদ।

"একটা খুব জরুরী কথা ছিলো।"

"বলো।"

"বিজাপুরে ফিরে আসবার আগে শাহজাদা আওরংজেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছিলো।"

খাঁ-মহম্মদ বিস্মিত হোলো একথা শুনে।

"মোগলদের হাতে আমিও ধরা পড়েছিলাম," বলে গেল সিদ্দি হানিফ, "শুধু একটি শর্তে আমি মুক্তি পেয়েছি।"

"কি শর্ত?"

"মালিক সুলতান ও আপনার সমক্ষে আমি ওঁর একটি প্রস্তাব জানাবো।"

"উনি কি তোমার মারফতে কোনো নিশান পাঠিয়েছেন?" খুব আস্তে জিজ্ঞেস করলে খাঁ-মহম্মদ।

"না। প্রস্তাবটা মৌখিক।"

"এর যথার্থতা কি ভাবে নিরুপণ করবো?"

"আমার সঙ্গে অভিজ্ঞান আছে। আঠারো বছর আগে স্বর্গীয় সুলতান শাহজাদাকে একটী বহুমূল্য পান্নার অঙ্গুশতরী দিয়েছিলেন অন্যান্য উপহারের সঙ্গে। আপনি জানেন, কারণ উপহারের ফর্দ তৈরি করেছিলেন আপনি নিজে।—এই দেখুন, এটা সেই অঙ্গুশতরী কিনা?"

সেদিন সকালেই সারা বিজাপুর শহরে খবর ছড়িয়ে পড়লো। চারদিকে প্রবল উত্তেজনা। লোক দলে দলে ছুটলো কিলা অর্ক-এর দিকে। প্রথমে শহরের লোকেরা, তারপর কাতারে কাতারে নগরপ্রাচীরের বাইরের দৌলতপুর, খুসরওপুর, শাহ্‌পুর, বরাত্‌গি প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা। উজীর খাঁ-মহম্মদের নির্দেশে নগর-প্রাচীরের প্রত্যেকটি দরওয়াজা খুলে দেওয়া হোলো, দরওয়াজার চৌকির উপর হুকুম জারি করা হোলো কাউকে যেন শহরে ঢুকতে বাধা দেওয়া না হয়। তবে যেন নজর রাখা হয়, যারা আসছে তাদের মধ্যে কেউ উজীর খাঁ-মহম্মদ, আফজল খাঁ ও বড়ী সাহিবার সমালোচনা করছে কিনা। সে-ধরণের লোক চোখে পড়লে তাদের যেন সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে সরিয়ে ফেলা হয় আম-জনতার মধ্যে থেকে। বিশেষ নির্দেশ পেয়ে উজীর সাহেবের কয়েকশো হরকরা মিশে গেল এই জনস্রোতের মধ্যে, তাদের উপর নজর রাখবার জন্যে, তাদের উস্কে দেওয়ার জন্যে এবং প্রয়োজন মতো তাদের উত্তেজনা রুখবার জন্যে।

সবাই দলে দলে এসে জমা হোলো কেল্লার সামনের চওকে। সবারই মুখে একটি প্রসঙ্গ।—হিন্দুস্তানের বাদশাহ্‌র উজীর মির

জুমলা এসে পড়েছে আওরঙ্গাবাদের কাছাকাছি। আর অল্প কয়েকদিনের পথ মাত্র বাকী। সঙ্গে আছে ফিরিঙ্গী বিশেষজ্ঞদের পরিচালিত বিখ্যাত গোলন্দাজ বাহিনী। আওরঙ্গাবাদে শাহজাদা আওরংজেবও তাঁর ফৌজ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন। সীমান্তে বেড়ে উঠেছে মোগল টহলদার ফৌজের তৎপরতা। বিজাপুর আক্রমণ আসন্ন।

এ খবর খুব অপ্রত্যাশিত নয়। শুধু এ খবর শুনেই লোক জমায়েত হয়নি কিলা অর্কএর সামনে। তাদের উত্তেজনার কারণ আরেকটি গুজব, যেটি সকাল থেকেই লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে সারা রাজধানী জুড়ে।

সবারই মুখে একটি কথা—দেশদ্রোহীদের কোতল করো। বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি চাই।

কি হয়েছে ভাই? কে বিশ্বাসঘাতক?—জিজ্ঞেস করলো যারা জানেনা।

—কে আবার? শর্জা খাঁ, মুল্লা রহমান, ব্যাঙ্কজী ভোঁসলে—ওদের কয়েদ করা হয়েছে। নিহত হয়েছে সর্দার আহমদ খাঁ।

—সর্দার আব্দুল মহম্মদকেও বন্দী করা হয়েছে।

—তাঁকেও? কি আশ্চর্য! সদার খাঁ-মহম্মদের পরে যে ওঁরই উজীর হবার কথা!

—সর্দার মুস্তাফা খাঁ, সিদ্দি দিলাওয়ার এবং সর্দার ইকবাল খাঁ ফেরার হয়ে গেছেন।

—আশ্চর্য! এঁরা তো রিয়াসতের বিশিষ্ট সর্দার। প্রত্যেকেই খ্যাতনামা যোদ্ধা! এঁরা দেশদ্রোহী, বেইমান? বিশ্বাস হচ্ছে না।

—কি করেছিলো এরা?

—দেশের শাসনক্ষমতা জবরদখল করার পরিকল্পনা করার হীন ষড়যন্ত্র করেছিলো ভাই।

—সে কি কথা? দেশের এই বিপদের সময়?

—যাদের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থ বড়ো, দেশের স্বার্থের কী দাম আছে তেমন লোকের কাছে ?

—কোতল করো, প্রত্যেককে ধরে ধরে কোতল করো !

—মৃত্যু চাই, বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু চাই।

লোকে জোর করে ঢুকতে চাইলো কেল্লার ভিতর। কিন্তু কেল্লাদারের নির্দেশে দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দেউড়ি-চৌকির একদল অশ্বারোহী ফৌজ অশ্বচালনা করে বার বার হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো উত্তেজিত জনতাকে।

—আমরা সুলতান সলামতকে দেখতে চাই।

—দর্শন চাই মালিক-ই-জাহাঁর।

উজীর খাঁ-মহম্মদের লোকেরা মিশে আছে জনতার মধ্যে। একজন উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো,—মালিক-ই-জাহাঁ সুলতান সলামত জিন্দাবাদ !

তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালো সমবেত জনতা। অনেকে ভুলে গেল যে নাম ধরে সুলতানের উল্লেখ বে-আদবি। তারা উত্তেজনার উৎসাহে আওয়াজ তুললো,—সুলতান আলি আদিল শাহ জিন্দাবাদ।

—জিন্দাবাদ। সুলতান সলামত জিন্দাবাদ !

ওরা ধরা পড়লো কি করে ?—কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলো।

—আরে আমাদের উজীর খাঁ-মহম্মদ কি যে সে লোক ! সাধারণ লোকের চোখ দুটো দুটো করে। উজীরের চশম্ হাজার হাজার।

—ওরা কি সুলতান সলামতকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করে ছিলো ?

—না, না, ওঁকে নয়। ওদের লক্ষ্য ছিলো উজীর খাঁ-মহম্মদ ও ফৌজের মির বক্‌শি সিদ্দি মর্‌জন। এই দুজনকে হত্যা করবার হীন ষড়যন্ত্র করেছিলো।

—শুধু এটুকু নয় ভাই। তুমি সবটা জানো না। আরো জঘন্য উদ্দেশ্য ছিলো তাদের। ওরা সর্দার আবজল খাঁকে কয়েদ করতে চেয়েছিলো, আর—হ্যাঁ, কয়েদ করবার পরিকল্পনা করেছিলো হজরত বড়ী সাহিবাকেও।

—হজরত বড়ী সাহিবাকেও? ছিঃ ছিঃ, উনি আমাদের জননী। ওঁকেও! এদের লাশ টুকরো টুকরো করে কুত্তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া উচিত।

—রিয়াসতের দুশমনদের মৃত্যু চাই। বেইমানদের লাশ দেখতে চাই।

—কোতল করো, ওদের কোতল করো।

উত্তেজিত জনতা আবার ছুটে গেল কেল্লার দরওয়াজার দিকে, চৌকির ঘোড়সওয়ারদের তাড়া খেয়ে পুনরায় পিছু হটে এলো।

—আজ রাত্তিরে দেউড়ি-চৌকির পালা ছিলো সর্দার শর্জা খাঁর। এই সুযোগে ওরা সুলতানের মহল দখল করে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলো।

—বেইমানদের খুন দেখতে চাই।

রাজধানীর বিভিন্ন মহল্লায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

—চলো, কিলা অর্ক্‌এ চলো। সুলতান সলামত বিপদাপন্ন। রিয়াসতের খত্‌রায় আজ আমাদের দাঁড়াতে হবে সুলতান সলামতের পেছনে, হজরত বড়ী সাহিবার পেছনে। চলো, চলো, কে কোথায় আছো, কিলা অর্ক্‌এ চলো।

চবুতরায় বসে ফিসফাস করছে বুড়োরা।

—আমরা আগেই জানতাম। এরকম যে হবে আগেই জানতাম।

—সর্দার আবদর রওফ, সর্দার খিজির খাঁ পানি, সর্দার খওয়াস খাঁ এদেরও কয়েদ করা হবে।

—সত্যি সত্যি?

—আরে, বিদ্রোহী সর্দারদের অনেকে পুণার শিবাজীর কাছ থেকে অনেক ছুন ঘুষ পায়।

—এর মধ্যে আওরংজেবের গুপ্তচরেরাও নাকি আছে।

—দুজন মোগল নাকি আগ্রা থেকে এখানে এসেছে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করবার জন্যে। একজনকে কোতোয়াল সিদ্দি ইউসুফ কাল রাত্তিরে গিরফ্‌তার করেছে। তার সঙ্গী তলোয়ার উঁচিয়ে হত্যা করতে গিয়েছিলো কোতোয়ালকে। সে নিহত হয়েছে।

—তোমরা জানোনা। সর্দার শর্জা খাঁ, মুল্লা রহমান ও ব্যাঙ্কজী ভোঁসলেকে আমাদের উজীর আওরঙ্গাবাদ পাঠিয়েছিলেন শাহজাদার সঙ্গে আপোস মীমাংসার আলোচনা করতে। ওরা সেখানে গিয়ে শাহজাদার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে। শিবাজীর একজন প্রতিনিধিও নাকি তাদের সঙ্গে এসে কথাবার্তা বলে গেছে।

—এরা কি দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে চায়?

—তাছাড়া আবার কি! শিবাজী ও আওরংজেবের সঙ্গে এদের গোপন চুক্তি হয়েছে। সিংহগড়, রায়গড় ও তোর্নের উপর শিবাজীর অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হবে এবং উত্তর-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ জায়গির দেওয়া হবে। নামে জায়গিরদার হলেও আসলে স্বাধীন রাজার মতো রাজত্ব করবে শিবাজী। আর উত্তরে অনেক কেল্লা ছেড়ে দেওয়া হবে মোগলদের।

—না, আমি বিশ্বাস করিনা। শাহজাদা আওরংজেব শিবাজীকে বিশ্বাস করেন না।

—তুমি কূটনীতির কি বোঝো? বিজাপুর আওরংজেবের শত্রু। শিবাজী বিজাপুরের শত্রু! সুতরাং যুদ্ধের সময় শত্রুর শত্রুদের সঙ্গে অনায়াসেই একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়।

—দুশমনদের হাতির পায়ের নিচে ফেলে নিহত করা হোক।

—বেইমানদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক।

বুড়োদের আলোচনা ডুবে গেল একদল লোকের শোরগোলে।

—চলো, কিলা অর্ক্‌এ চলো।

প্রথম প্রহরের পর আরো দুঘড়ি সময় অতীত হয়েছে। কেল্লার চারদিকে কাতারে কাতারে লোক।

—সুলতান সলামত জিন্দাবাদ।

—আমরা সুলতান সলামতের দর্শন চাই।

—উজীর খাঁ-মহম্মদ জিন্দাবাদ। সিদ্দি মর্‌জন জিন্দাবাদ।

কেল্লার দরওয়াজায় ধস্তাধস্তি। দুজন সওয়ার পড়ে গেল ঘোড়ার উপর থেকে। জনতা কেল্লার ভিতরে ঢুকবেই। দেউড়ি চৌকির পিয়াদা সিলাহদারেরা প্রাণপণে চেষ্টা করছে জনতাকে সামলে রাখতে।

উজীর খাঁ-মহম্মদের মুখে হাসি। কিছুক্ষণ পর পর হরকরা এসে বাইরের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে। সবই ঘটে যাচ্ছে পরিকল্পনা অনুযায়ী। প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবার জন্যে এই বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিলো।

উজীরের কাছ থেকে জরুরী আহবান পেয়ে ফিরে এসেছিলো সর্দার আফজল খাঁ। গম্ভীর মুখে চুপচাপ শুনলো উজীর খাঁ-মহম্মদের বক্তব্য। কিছুক্ষণ চুপচাপ ভাবলো। তারপর বললো, "তাহলে এই হোলো শাহজাদা আওরংজেবের প্রস্তাব? ওসমানকে ফিরিয়ে দিতে হবে আকিল খাঁর হাতে?"

"হ্যাঁ। তাহলে আপোস-মীমাংশার শর্ত্ত আলোচনা করতে উনি রাজী আছেন।"

"আপনি বিশ্বাস করেন ওঁর কথায়?"

"বিশ্বাস করা কি উচিত?"

আফজল খাঁ হাসলো। উত্তর দিলো, "শাহজাদা যে ওসমানকে

আমাদের সুলতানের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করবেন না, তার নিশ্চয়তা কি ?"

"একথা যে আমারও মনে হয়নি তা নয়।"

"তা হলে কি করবেন স্থির করেছেন ?"

"আমরা স্থির করা না-করার কে ?" আস্তে আস্তে উত্তর দিলো খাঁ-মহম্মদ, "শাহজাদার অনুরোধ অবহেলা করতে আমরা চাই না। মোগলের সঙ্গে শত্রুতা আমাদের কাম্য নয়। সুতরাং ওসমানকে আকিল খাঁর হাতে সমর্পণ করতে যে আমরা অনিচ্ছুক তা নয়। কিন্তু যদি সেটা হয়ে না ওঠে আমরা কি করতে পারি ?"

আফজল খাঁ তাকালো খাঁ-মহম্মদের দিকে। বললো, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।"

"মনে করুন, আমরা ওসমানকে একদল সশস্ত্র সৈন্যের পাহারায় সীমান্তের দিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। এমন সময় ওসমান কেল্লার কয়েদখানা থেকে পালিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হোলো। কিন্তু বেশীদূর পালাতে পারলো না। কেল্লার প্রহরীরা তাকে ধরে ফেললো। ওসমান তলোয়ার হাতে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। প্রহরীদের হাতে নিহত হোলো সে।—এই অবস্থায় শাহজাদার অনুরোধ রক্ষা করতে আমরা সক্ষম নাও হতে পারি।"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো আফজল খাঁ। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কিছু জানতে পেরেছেন ওসমান সম্বন্ধে ?"

"না। ওর সম্বন্ধে আমার কয়েকটা অনুমান আছে। কিন্তু নিঃসংশয় হওয়ার মতো কোনো প্রমাণ পাচ্ছি না। সে কোনোদিন হামিদ খাঁ কি আয়েশাবানুর নামও শোনেনি। হয়তো সে নিজে কিছু জানেও না। ওই ইসমাইল বেগ্ লোকটাকে পেলে হয়তো কিছু জানা যেতো।"

"ঠিক মতো পীড়ন করলে হয়তো কোনো কথা বেরোতে পারতো ওসমানের মুখ থেকে —।"

একটু চুপ করে থেকে খাঁ-মহম্মদ বললো, "চেষ্টা সব রকমেরই করা হয়েছে। এখন বড়ী সাহিবা বিশেষ কিছু জানবার আগে বা ওসমানকে চাক্ষুষ নিরীক্ষণ করার আগেই আমি তাকে ইহজগত থেকে সরিয়ে দিতে চাই। প্রথমে ভেবেছিলাম, কাউকে কিছু না জানিয়ে একেবারে গোপনে কাজ সারবো। কিন্তু ভেবে দেখলাম বড়ী সাহিবা আগেপরে কিছু না কিছু জানতে পারবেন। তখন কৈফিয়ত দেওয়া মুশকিল হবে। তাই আজকের এই গোলযোগটা সৃষ্টি করতে হোলো। ওঁর ষড়যন্ত্রের ভয় খুব। সুতরাং একটা গভীর ষড়যন্ত্র আমরা ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছি শুনতে পেলে বেশী কিছু জানতে চাইবেন না, ওসমানের ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাবে। আর ওঁকে বুঝিয়ে বলবার জন্যে আপনি তো আছেনই।"

"এদিকে সুলতান আলি যে দেখতে চেয়েছে তাকে?"

"কি করি। সুলতানের আদেশ অমান্য করা বে-আদবি হবে, অথচ সুলতানের সঙ্গে ওসমানের সাক্ষাৎ হয় সেটা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না।"

"তাহলে?"

খাঁ-মহম্মদ হাসলো। "আমি তো ওসমানকে সুলতানের সমক্ষে উপস্থিত করার আয়োজন করছি, কিন্তু তার আগে যদি ওসমান কয়েদখানা থেকে পালিয়ে যায় এবং নিহত হয়, আমি কি করতে পারি?'—এভাবে বোঝানো যাবে সুলতানকে।"

"তা তো বটেই। আচ্ছা, ইকবাল খাঁর কন্যা আজুমান-আরাকে কি মহলের ভিতর নিয়ে আসা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। আমি এইমাত্র সংবাদ পেয়েছি। তবে আমার মনে হয়, সুলতান একাজটা ভালো করেন নি। বড়ী সাহিবা শুনতে পেলে ক্রুদ্ধ হবেন।"

"আরজুমান-আরাকে মহলে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে?"

"সুলতানের কৌতূহল ছাড়া আর কি বলবো। ওঁর চরিত্র

সম্বন্ধে আপনি তো সম্পূর্ণ অবগত আছেন। উদ্দেশ্য যে সাধু নয় একথা বলাই বাহুল্য।"

আফজল খাঁ হাসলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "ওসমানকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেবে কে?"

"সে ভার দিয়েছি সিদ্দি হানিফের উপর। ওসমানের সঙ্গে একটা ভালো তলোয়ার ছিলো। সেটাও তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তাকে সশস্ত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, এর চাইতে বেশী সে আর কি আশা করতে পারে?"

কিছুক্ষণ ভাবলো আফজল খাঁ। তারপর মুখ তুললো।

"খাঁ-মহম্মদ!"

"বলুন।"

"আলির সম্বন্ধে একটা গুজব মহলে প্রচলিত আছে অনেক বছর থেকে। আপনি কি বিশ্বাস করেন সেকথা?"

উজীর খাঁ-মহম্মদ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলো, "স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ বড়ী সাহিবার সমক্ষে কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করেছেন যে আলি তাঁরই সন্তান। সুতরাং, এর পর আমি এ বিষয়ে আর কোনোরকম আলোচনা করতে প্রস্তুত নই।"

আফজল খাঁ চুপ করে রইলো।

খাঁ-মহম্মদ একটু থামলো, তারপর বললো, "আফজল খাঁ, একটা কথা স্মরণ রাখলে আমাদের সবারই মঙ্গল। কথাটা হোলো এই,— সুলতান আলি, বড়ী সাহিবা, আপনি এবং আমি, আমাদের এই চারজনের ভাগ্য এক সূত্রে গাঁথা।"

আফজল খাঁ উত্তর দিলো, "বিজাপুরের ভাগ্যও আমাদের চারজনের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত।"

খাঁ-মহম্মদ বার বার বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলো। আফজল খাঁর কথা শেষ হতে বলে উঠলো, "সিদ্দি হানিফকে পাঠিয়েছি অনেকক্ষণ। এর মধ্যে এসে পড়া উচিত ছিলো ওসমানের খবর।"

বড্ড বিলম্ব হচ্ছে!—কে যেন আসছে মনে হচ্ছে," চঞ্চল পদে দরজার দিকে এগিয়ে গেল খাঁ-মহম্মদ।

একজনকে দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে। খুব নিচু গলায় সে কি যেন বললো খাঁ-মহম্মদকে, তারপর চলে গেল।

উজীর খুব চিন্তান্বিত। আফজল খাঁ জিজ্ঞেস করলো, "কি ব্যাপার?"

খাঁ-মহম্মদ উত্তর দিলো, "বড়ী সাহিবা খবর পেয়ে গেছেন যে ইকবাল খাঁর কন্যা আরজুমান-আরাকে বন্দী করে মহলে নিয়ে আসা হয়েছে সুলতানের হুকুমে। উনি গেছেন জেনানা কয়েদ-খানার দিকে, ওকে মুক্ত করে আনতে। রাজ্যের একজন সর্দারের কন্যাকে এভাবে মহলে নিয়ে আসায় তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন।"

"উনি যখন জানতে পেরেছেন এবং নিজে গেছেন তাকে মুক্ত করে আনতে, তখন আমাদের আর কি করার আছে। যাই হোক, আমার মনে হয় এ-নিয়ে ভাবনা করার কোনো কারণ নেই।"

"যদি আরজুমান-আরা ওসমানের বিষয়ে কিছু বলে বড়ী-সাহিবাকে?"

"সে কি কিছু জানে?"

"জানে না একথাও কি দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়?"

খাঁ-মহম্মদ তাকিয়ে রইলো আফজল খাঁর দিকে। জিজ্ঞেস করলো, "এখন কি করা যায়?"

"চলুন বড়ী সাহিবার গুসলখানায়। হয়তো তিনি আরজুমান-আরাকে নিয়ে সেখানেই ফিরে আসবেন।"

ওদের অনুমান ভুল হয়নি। অনুমতি পেয়ে বড়ী সাহিবার গুসলখানায় প্রবেশ করে দেখলো, বড়ী সাহিবার কাছে দাঁড়িয়ে আছে নকাব্-এ মুখ ঢাকা এক তরুণী।

"আমি আপনাদের প্রত্যাশা করছিলাম," বড়ী সাহিবা বললো ওরা ঢুকতেই, "আরজুমান-আরা আমাদের প্রিয়পাত্র এবং বিশ্বাস

ভাজন সর্দার ইকবাল খাঁর কন্যা। তাকে জেনানা কয়েদখানায় এনে আটক করা আপনাদের উচিত হয়নি।"

"সুলতানের হুকুম। আমার কিছু করবার ছিলো না।"

"কেন কিছু করবার ছিলো না?" কঠিনতর হোলো বড়ী সাহিবার কণ্ঠ।

রেওয়াজ অনুযায়ী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলে খাঁ-মহম্মদ ও আফজল খাঁ দুজনেই। খাঁ-মহম্মদ উত্তর দিলো, "সুলতান সলামতকে আমি পরামর্শ দিই শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করি না।"

বড়ী সাহিবার মুখমণ্ডল আরক্ত হোলো খাঁ-মহম্মদের উত্তর শুনে। বলে উঠলো, "একথা তো সুলতানকে আপনার জানানো উচিত ছিলো যে এর পিতা ইকবাল খাঁ দরবারের একজন বিশ্বস্ত সর্দার।"

"আপনার সঙ্গে আমি একমত নই বেগম সাহিবা। আমার গুস্তাকি মাফ করবেন।"

"এ কি বলছেন আপনি?"

"বেগম সাহিবা! আজ শহরে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। আপনি কি সে সংবাদ এখনো পান নি?"

"পেয়েছি। শুনেছি, কোনো একটা ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গিয়েছে বলে আপনি কয়েকজন সর্দারকে কয়েদ করেছেন।"

"ওদের নির্দেশে একটা বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলছিলো। আপনি কি শুনলে বিস্মিত হবেন যে, এই পরিকল্পিত বিদ্রোহের অন্যতম নেতা সর্দার ইকবাল খাঁ?"

"হতেই পারে না। মিথ্যে কথা," বলে উঠলো আরজুমান-আরা।

"বেগম সাহিবা, একথাও নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞাত নন যে, সর্দার ইকবাল খাঁর কন্যা এমন একজনের সঙ্গে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত, যে

এই পরিকল্পিত বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে আওরঙ্গাবাদ থেকে গোপনে বিজাপুরে উপনীত হয়েছে ?"

"কে সে ?" জিজ্ঞেস করলো বেগম সাহিবা।

"সেই ব্যক্তির নাম ওসমান বেগ্। আমার অনুমান, সে শাহজাদা আওরংজেবের অতি বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি, কারণ শাহজাদা আমাদেরই একজন হরকরা মারফত আমায় জানিয়েছেন যে, এই ব্যক্তিকে যদি নিরাপদে সীমান্ত পার করে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি আমাদের সঙ্গে আপোস-মীমাংসার আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন। এই ওসমান বেগ্‌কে নিরাপদে আওরঙ্গাবাদে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নসরতপুরে অপেক্ষা করছেন শাহজাদার জিলওদার আকিল খাঁ।"

"এসব কথা সত্যি ?" বড়ী সাহিবা জিজ্ঞেস করলো আরজুমান-আরাকে।

"না, বেগম সাহিবা, এ অসম্ভব," আরজুমান-আরা দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো, "ওসমান নিজে আমাকে বলেছে, ও জীবনে কিছু চায় না, শুধু আমাকে বিবাহ করে সাধারণ লোকের মতো জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে চায়।"

"বেগম সাহিবা," বললো খাঁ-মহম্মদ. "আপনি আরজুমান-আরাকে জিজ্ঞেস করুন, ওসমানের সঙ্গে আকিল খাঁর পরিচয় আছে কিনা।"

বড়ী সাহিবা তাকালো আরজুমান-আরার দিকে। সে মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, পরিচয় আছে।"

"আরো শুনুন," বলে গেল খাঁ-মহম্মদ, "আওরঙ্গাবাদে এই আকিল খাঁর সঙ্গে ওসমান ও আরজুমান-আরা মিলিত হয়েছিলো আরজুমান-আরার পিতার মঞ্জিলের পশ্চাতভাগের বাগিচায়। এবং এই সাক্ষাৎকার হয়েছিলো অত্যন্ত গোপনে।"

"সত্যি ?" জিজ্ঞেস করলো বড়ী সাহিবা।

আরজুমান-আরা কোনো উত্তর দিলো না।

"ওদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিলো সেটা জানবার অধিকার নিশ্চয়ই আমাদের আছে," বললো আফজল খাঁ।

আরজুমান-আরা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলো, "আপনার ইঙ্গিত অত্যন্ত হীন। আমাদের মধ্যে এমন কোনো আলোচনা হয়নি, যেটা জানবার অধিকার আছে বিজাপুরের উজীরের কি মোগল দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের।"

"কাল রাত্রিকালে ওসমান বেগের সঙ্গে আরজুমান-আরার সাক্ষাৎ হয়েছিলো?" জিজ্ঞেস করলো খাঁ-মহম্মদ।

"হ্যাঁ হয়েছিলো।" আরজুমান-আরা উত্তর দিলো।

"গোপনে—,"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমাদের গোপনে সাক্ষাৎ হওয়ারই সম্পর্ক। তিনি আমার ভাবী স্বামী।"

বেগম সাহিবা তাকালো আরজুমান-আরার দিকে। তারপর খাঁ-মহম্মদের দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এই ওসমান বেগ্ এখন কোথায়?"

"সঠিক সংবাদ আমার জানা নেই বেগম সাহিবা।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খাঁ-মহম্মদের দিকে তাকালো বড়ী সাহিবা। বললো, "আপনি একটু আগে বলেছেন, আপনারই হরকরা মারফত শাহজাদা আওরংজেব আপনাকে জানিয়েছেন এই ব্যক্তিকে নিরাপদে সীমান্ত পার করে ছেড়ে দিতে। শাহজাদার আপনাকে একথা জানানোর উপলক্ষটা কি?"

খাঁ-মহম্মদের মুখ লাল হয়ে গেল। আফজল খাঁ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালো খাঁ-মহম্মদের দিকে।

"শাহজাদার কাছে একটা ভুল সংবাদ পৌঁছেছিলো যে ওসমান

আমাদের হাতে ধরা পড়েছে," উত্তর দিলো খাঁ-মহম্মদ, "আমরা যতো দূর অবগত আছি,—ওসমান তখন সীমান্ত অতিক্রম করে বিজাপুর পৌঁছায়নি।"

"ওসমান কখন বিজাপুরে উপনীত হয়েছে, সে খবর আপনি জানেন, সে কখন গোপনে আরজুমান-আরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, তাও জানা আছে আপনার,—শুধু এখন কোথায় আছে সেটা জানেন না ?"

"ষড়যন্ত্রকারীদের ধর-পাকড় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দলের অনেকে আত্মগোপন করেছে, বেগম সাহিবা।"

"আপনি কি ঠিক জানেন, ওসমান বেগ্ ধরা পড়েনি, সে কয়েদখানায় নেই ?"

"কয়েদখানায় অনুসন্ধান করে তবে আপনাকে জানাতে পারবো, বেগম সাহিবা।"

"বেশ, অবিলম্বে জানাবেন। আমি চাই যে, আপনি তাকে আমার সামনে হাজির করবেন।"

"বেগম সাহিবা কেন ওর মতো একজন সামান্য ব্যক্তিকে দেখতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না।"

বড়ী সাহিবা স্তব্ধ দৃষ্টিতে খাঁ-মহম্মদের দিকে তাকালো। আস্তে আস্তে বললো, "আমার ধারণা, আপনারা কোথাও ভুল করেছেন।"

'ভুল !"

"হ্যাঁ, খাঁ-মহম্মদ। আজ এ সময় ইকবাল খাঁর সঙ্গে ইয়ার ইসমাইল বেগ্ নামে এক ব্যক্তির এখানে হাজির হওয়ার কথা ছিলো।

"ইয়ার ইসমাইল বেগ্ !" খাঁ-মহম্মদ বিস্মিত হোলো।

"হ্যাঁ। ইকবাল খাঁ বলেছেন, ইয়ার ইসমাইল বেগ্ হিন্দুস্তানের শাহ-ই-আলিজা দারা শিকোর ব্যক্তিগত দূত। আগ্রা থেকে

বিজাপুরে উপনীত হয়েছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য। ইকবাল খাঁ বলেছিলো, তার সঙ্গে আসবে তার পুত্র ইয়ার ওসমান বেগ্। আমার ধারণা, এই ওসমান-বেগ্ সেই ইসমাইল বেগেরই পুত্র।"

খাঁ-মহম্মদ একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "আমার ধারণা ছিলো আপনার কি সুলতান সলামতের আগে এসব কথা জানবার কথা আমারই।"

"রাজ্যের উজীরের নিশ্চয়ই সব কথা জানবার অধিকার আছে," বলে উঠলো আফজল খাঁ।

"নিশ্চয়ই আছে," উত্তর দিলো বড়ী সাহিবা, "আমি যতোটা জানি আপনাকে জানালাম। এর বেশি কিছু আমার জানা নেই।"

"কিন্তু আমার জানা আছে," একটু উচ্চ কণ্ঠে বললো উজীর খাঁ-মহম্মদ, "আমাদের খবর এই যে, ইয়ার ইসমাইল বেগ্ আসলে শাহজাদা আওরংজেবের গুপ্তচর। ওসমানও তার সহকর্মী ও সহযোগী। এরা যদি ধরা পড়ে রাজ্যের কানুন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডই তাদের প্রাপ্য।"

"যদি ইসমাইল বেগের আসবারই কথা, এখনো আসছেনা কেন? আফজল খাঁ জিজ্ঞেস করলো।

"এ প্রশ্নের উত্তর উজীর সাহেবই দিতে পারবেন।"

খাঁ-মহম্মদের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো। ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বললো, "আমি তো আপনাকে জানিয়েছি বেগম সাহিবা, আমার খবর এই যে ইয়ার ইসমাইল বেগ্ দেশদ্রোহীদের সঙ্গে সংযুক্ত। নিশ্চিত প্রমাণ আছে আমার হাতে। তাই সে আত্মগোপন করেছে আজ শেষরাত্রি থেকে।"

"আপনার কাছে কী প্রমাণ আছে, খাঁ-মহম্মদ?"

"যাদের কয়েদ করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের বিচার হবে আম-দরবারে। তাদের অপরাধের সাক্ষী আমার খুফিয়া-নবিস

সিদ্দি হানিফ। আমার হাতে যা কিছু প্রমাণ আছে সবই হাজির করা হবে সবার সামনে।"

"সিদ্দি হানিফ যা বলবে তা সত্য কিনা তার প্রমাণ কি?"

রাগে কাঁপতে লাগলো খাঁ-মহম্মদের সমস্ত শরীর। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই বড়ী সাহিবা বলে উঠলো, "আপনি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছেন খাঁ-মহম্মদ। দরবারে আমাদের প্রতিপক্ষের অন্যান্য সর্দারদের মনে যে সব প্রশ্ন উঠতে পারে সে সব আমরা যদি আগের থেকেই বিবেচনা করে প্রস্তুত হয়ে থাকি, তাহলে ন্যায় বিচার পেতে আমাদের কষ্ট হবে না।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো খাঁ-মহম্মদ। তারপর বললো, "বেগম সাহিবা, আমি এ রাজ্যের উজীর আজ অনেকবছর ধরে। এই প্রথম দেখলাম, আপনি আমায় অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করছেন না।"

বড়ী-সাহিবা হাসলো। "উজীর সাহেব, এই প্রথম আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে সব কিছু করছেন নিজের ইচ্ছে মতো।"

আফজল খাঁ চুপ করে শুনছিলো এতক্ষণ। এবার বলে উঠলো, "আমরা অকারণ তর্ক করছি। আপনি, উজীর সাহেব, এবং আমি, আমাদের তিনজনেরই উদ্দেশ্য এক, স্বার্থ এক, কর্মনীতি এক— বিজাপুরের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি। এত কথা শুরু হয়েছিলো মহলে আরজুমান-আরার উপস্থিতি নিয়ে। যেহেতু খাঁ-মহম্মদের হাতে প্রমাণ আছে যে, এই নারী আওরংজেবের কন্যা জেব-উন-নিসা ও জিনত-উন-নিসার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, আওরংজেবের কিলওদার আকিল খাঁর সঙ্গে এবং বিজাপুরী দেশদ্রোহীদের সহকর্মী ওসমান বেগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেহেতু এই নারীকে জেনানা কয়েদখানায় বন্দী করে রাখা হোক। তারপর যথাসময়ে একে বিচারসভায় উপস্থিত করা হবে।"

"জেনানার বিচার হবে মহলে পর্দার ভিতর এবং সেই বিচার করবো আমি," উত্তর দিলো বড়ী সাহিবা, "আমার নির্দেশ এই যে,

একে জেনানা কয়েদখানায় রাখা হবে না। এ থাকবে আমারই সঙ্গে।"

"কিন্তু সুলতানের নির্দেশ, তিনি নিজে এই নারীকে গোপনে জেরা করবেন। রাজ্যের স্বার্থে এই গোপনীয়তা প্রয়োজন।"

বড়ী সাহিবার চোখ দুটো অঙ্গারের মতো জ্বলতে লাগলো। "সুলতানের জননীর নির্দেশ, তাঁর অপরিণতবুদ্ধি সন্তান নিজেকে তফাতে রাখবে আরজুমান-আরার থেকে। আরজুমান-আরা দরবারের একজন সম্ভ্রান্ত সর্দারের কন্যা। তার কোন অসম্মান আমি হতে দেবো না।"

মহলের ভিতর থেকে যে বারান্দা এসে পড়েছে বড়ী সাহিবার গুসলখানার সামনে, সেই বারান্দা থেকে একজন গুর্‌জ্-বরদার্ উন্মুক্ত দ্বারপথে কক্ষে প্রবেশ করে বুকের উপর দু-হাত জুড়ে সামনে ঝুঁকে আনত মুখে অভিবাদন করে বললো, "মালিক-ই-জাহাঁ সুলতান-এ-আদিল বেগম সাহিবার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এখানে তশরীফ আনছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে আদব অনুযায়ী তটস্থ হয়ে বুকের উপর দু-হাত জুড়ে আনত হোলো খাঁ-মহম্মদ, আফজল খাঁ আর আরজুমান-আরা। বড়ী সাহিবা শান্তভাবে উপবেশন করলো জাজিম ঢাকা আবলুশ কাঠের 'চার পাই' এর উপর।

আর সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দিকের দ্বারপথ খুলে গেল। ছুটে ঘরে ঢুকলো সিদ্দি হানিফ। তার জামাহ্ রক্তে ভিজে গেছে, হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ। খুব তাড়ার মধ্যে যথারীতি অভিবাদন করে বড়ী সাহিবাকে বললো, "আমার গুস্তাকী মাফ করবেন বেগম সাহিবা,—ওরা সবাই এদিকে আসছে, আমরা কেউ ওদের পথ রোধ করতে পারলাম না।"

"ওরা! ওরা কারা?" বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো বড়ী সাহিবা।"

"ওসমান, ইকবাল খাঁ, আর ইয়ার ইসমাইল বেগ্।"

"ইকবাল খাঁ? ইসমাইল বেগ্?" বিচলিত হয়ে উঠলো উজীর খাঁ-মহম্মদ, "ওরা মহলের ভিতর ঢুকতে পারলো কি করে?"

"ওঁদের সঙ্গে আছেন সিদ্দি মর্জন।"

"সিদ্দি মরজন!" স্তম্ভিত হোলো উজীর খাঁ-মহম্মদ, "বিজাপুরী ফৌজের মির বক্শি সিদ্দি মর্জন?"

স্তম্ভিত হয়েছে সর্দার আফজল খাঁও। দাঁতে দাঁত চেপে নিমেষে তরবারি কোষমুক্ত করলো। "বেগম সাহিবা, এখানে উপস্থিত থাকা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়, আপনি এক্ষুনি চলে যান মহলের ভিতর। দেখি, দেশের শত্রুদের আমি আটকাতে পারি কিনা। যাওয়ার পথে সুলতান সলামতকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন, এদিকে আসতে দেবেন না। আমি যতক্ষণ জীবিত আছি ততক্ষণ কেউ ভিতরে যেতে পারবে না আমাদের পেরিয়ে।"

"সর্দার আফজল খাঁ! সিদ্দি হানিফ!" গম্ভীর কণ্ঠে সম্বোধন করলো বড়ী সাহিবা।

"হুকুম করুন বেগম সাহিবা," উভয়ে সসম্ভ্রমে বললো।

"বেগম সাহিবার সামনে উন্মুক্ত অস্ত্র হাতে দণ্ডায়মান হওয়া মহলের আদব নয়, একথা আপনারা জানেন।"

"কিন্তু বেগম সাহিবা—"

"তরবারি কোষবদ্ধ করুন সর্দার আফজল খাঁ। সিদ্দি হানিফ! সরে দাঁড়াও এক পাশে।"

সর্দার আফজল খাঁ ও সিদ্দি হানিফ তরবারি কোষবদ্ধ করে এক পাশে সরে গেল। বাইরে শোনা গেল কয়েকজনের পদশব্দ। দরজা খুলে গেল। সিদ্দি মর্জনের পেছন পেছন কক্ষে প্রবেশ করলো ইয়ার ইসমাইল বেগ্, ওসমান আর ইকবাল খাঁ। প্রত্যেকের হাতে উন্মুক্ত তরবারি।

আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে উন্মুক্ত দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালো

আরেকজন সুদর্শন তরুণ। মাথায় সোনার জরির কাজ-করা নানাবিধ মহার্ঘ রত্নখচিত তাজ, সামনে একটি দীর্ঘ শুভ্র পংখ এক পাশে কাৎ করে এক সুবৃহৎ হীরকখণ্ড দিয়ে আঁটা। কণ্ঠদেশে বহুমূল্য মুক্তাহার, দু হাতের প্রত্যেকটি আঙ্গুলে হীরা চুনী পান্নার অঙ্গুশতরি। পরিধানে শুভ্র রেশমের কাবার উপরে সোনার জরির নক্সা-করা গাঢ় লাল মখমলের নাদিরি। কোমরে সোনালী কোমর-বন্ধ থেকে দীর্ঘ তরবারি প্রলম্বিত।

"সুলতান সলামত মুবারক," বলে বুকের উপর দুহাত আড়া-আড়িভাবে স্থাপিত করে সামনে ঝুঁকে মাথা নত করলো উজীর খাঁ-মহম্মদ, আফজল খাঁ, সিদ্দি হানিফ, সিদ্দি মর্‌জন আর ইকবাল খাঁ।

কিন্তু অবাক বিস্ময়ে সমস্ত আদব ভুলে ইয়ার ইসমাইল বেগ্, ওসমান আর আরজুমান-আরা চক্ষু বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইলো বিজাপুরের তরুণ সুলতান আলি আদিল শাহ্‌র দিকে।—আর স্তম্ভিত হয়ে ওসমানের দিকে তাকালো বড়ী সাহিবা আর সর্দার আফজল খাঁ। তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকালো সুলতান আলি আদিল শাহ্‌র দিকে।

ওসমান নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে সুলতানের দিকে। সুলতানের চোখেও বিপুল কৌতূহল, কিন্তু বিস্ময় নেই মুখের উপর! এ যেন অপ্রত্যাশিত ছিলো না।

শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো উজীর খাঁ-মহম্মদ, সিদ্দি মর্‌জন, সর্দার ইকবাল খাঁ আর সিদ্দি হানিফ। তাদের চোখে বিস্ময় নেই, কৌতূহল নেই, মুখ জুড়ে শুধু গম্ভীর ও সংযত উৎকণ্ঠা।

চারপাই থেকে উঠে এলো বড়ী সাহিবা, আবার দুজনের দিকে তাকালো এদিক ওদিক ফিরে, তারপর কি যেন বলতে গেল, কিন্তু মুখে কোনো কথা সরলো না।

আরজুমান-আরার মুখ থেকে নকাব খসে পড়েছে। কিন্তু

সেদিকে হুঁশ নেই। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে সুলতান আলি আদিল শাহ্‌র দিকে।

প্রথম বাক্য নিসৃত হোলো ইয়ার ইসমাইল বেগের মুখ থেকে। বলে উঠলো, "কী দেখছি? এও কি সম্ভব!"

"না, না," মাথা নেড়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো বড়ী [illegible], "আমরা সবাই একটা খোয়াব দেখছি। না, এরকম হতে পারে না—।"

"শুনেছি যমজ সন্তানদের চেহারায় এরকম আশ্চর্য মিল দেখা যায়," বললো ইসমাইল বেগ্, "কিন্তু এক্ষেত্রে কি করে সম্ভব!"

কোনো কথা না বলে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো ইয়ার ওসমান বেগ্ আর আলি আদিল শাহ। দুজনেরই মনে হোলো যেন দর্পণে দেখেছে নিজের প্রতিবিম্ব।

সিদ্দি মর্‌জন আস্তে আস্তে বললো, "আমার শুধু মনে হচ্ছে আমি যেন দেখছি স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র তরুণ বয়সের দুটো তসবির।"

॥ দশ ॥

স্থলতানের মহলের রুদ্ধদ্বার গুসলখানায় যখন এই নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, কিলা অর্কের বাইরে তখন লোকে লোকারণ্য। দুর্গের প্রধান প্রবেশপথের সামনে ততক্ষণে মোতায়েন হয়ে গেছে সশস্ত্র ফৌজের সুশৃঙ্খল পাহারা। তাদের উদ্যত বর্শার সামনে থেমে আছে অশান্ত জনতা। কিন্তু উত্তাল সমুদ্রের মতো গর্জে উঠছে বার বার,—স্থলতান সলামতের দর্শন চাই। স্থলতান একবার এসে দাঁড়াক দুর্গপ্রাকারের বুর্জ্ এ।

কিলাদার সিদ্দি কামগার প্রাকারের একপাশে আলিসার ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলো নিচের উত্তেজনাময় পরিস্থিতি, এমন সময় দ্রুতপদে একব্যক্তি কাছে এসে পেছন থেকে ডাকলো।

মুখ ফিরিয়ে সিদ্দি কামগার জিজ্ঞেস করলো, "কি সংবাদ ইব্রাহিম।"

"মালিক স্থলতান হুকুম দিয়েছেন, কেল্লার ভিতর থেকে কেউ যেন বাইরে যেতে না পারে, বাইরে থেকেও যেন কেউ আসতে না পারে কেল্লার ভিতরে, সে যতো বিশিষ্ট ব্যক্তিই হোক না কেন।"

"সর্দার জাফর খাঁ ও মুল্লা নুর-উদ্দিন অপেক্ষা করছে দেউড়িতে। ওরা জানাতে এসেছে যে ওরা মালিক স্থলতানের খিদমতে হাজির আছে।"

"না, সিদ্দি কামগার, কাউকেই ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। মালিক স্থলতানের কড়া হুকুম।"

"হুকুমের অন্যথা হবে না মুল্লা ইব্রাহিম। একটি পিপীলিকাও

কেল্লার চৌকির পাহারা এড়িয়ে ভিতরে যেতে পারবে না। কিন্তু ওদিকের কি খবর?"

মুল্লা ইব্রাহিম চারদিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললো, "মালিক সুলতানের আজ কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। ওঁকে এরকম প্রত্যক্ষভাবে নিজের দায়িত্বে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দেখিনি আজ পর্য্যন্ত।"

"কেন, কি হয়েছে?"

"সুলতানের হুকুমে তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী দল মহল অবরোধ করেছে। আর দেহরক্ষী দলের দারোগা সর্দার সর্‌বুলন্দ খাঁ পঞ্চাশ জন বাছা-বাছা যোদ্ধাদের নিয়ে মোতায়েন হয়েছেন গুসলখানার সামনের অঙ্গনে।"

"কেন?" বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো সিদ্দি কামগার।

"জানিনা। গুসলখানার দরজা বন্ধ।"

"কে কে আছেন সেখানে?"

"আছেন অনেকেই।—খুদ মালিক সুলতান, মালিকা বড়ী সাহিবা, উজীর খাঁ-মহম্মদ, সদার আফজল খাঁ, সিদ্দি মর্‌জন্, ইকবাল খাঁ আর সেই লোকটি, যাকে কাল রাত্রে বন্দী করে আনা হয়েছিলো।"

"তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?"

"না, সিদ্দি কামগার! কি হয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। যদ্দুর জানতে পেরেছি সিদ্দি হানিফকে নির্দেশ দেওয়া ছিলো মহলের নিচে ভূগর্ভস্থ তহ্‌খানা থেকে সেই বন্দীকে মুক্ত করে দেওয়ার। তার তলোয়ারও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তাকে। এক কথায় তাকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো।"

"উজীরের নির্দেশে!" বিস্মিত হোলো সিদ্দি কামগার।

"হ্যাঁ। কিন্তু মতলব ছিলো অন্য। সিঁড়ির বাঁকে মুক্ত তলোয়ার হাতে অপেক্ষা করছিলো উজীরের সাত আটজন ব্যক্তিগত

অনুচর। তাদের উপর হুকুম ছিলো, ওরা আচমকা সেই বন্দীর উপর চড়াও হয়ে তাকে নিহত করবে। সে যাতে পালাতে না পারে, সিঁড়ির নিচে পেছন থেকে তার পথ আটকাবে সিদ্দি হানিফ।"

"তারপর ?" সিদ্দি কামগার জিজ্ঞেস করলো ব্যগ্রকণ্ঠে।

"ওরা যেই চড়াও হতে গেল সেই বন্দীর উপর, ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত হোলো সিদ্দি মর্‌জন, সর্দার ইকবাল খাঁ এবং আরেকজন অপরিচিত ব্যক্তি। ওরা বাঁচালো সেই বন্দীকে। তারপর সিদ্দি মর্‌জনের সঙ্গে সবাই চলে গেল মহলের ভিতর, গুসলখানার দিকে। শুনেছি খুদ সুলতানও হাজির হয়েছেন সেখানে।"

খুব চিন্তান্বিত দেখালো সিদ্দি কামগারের মুখ। বললো, "এভাবে সেই বন্দীকে নিহত করার চেষ্টা করার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। সে যদি অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হোতো তাকে সোজাসুজি কোতল করলেই হোতো। তাকে বাঁচাবার জন্যে খুদ মির বকশি সিদ্দি মর্‌জনইবা এলো কেন ? কে এই অজ্ঞাতপরিচয় বন্দী ?"

"জানি না। ওকে তহ্‌খানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, ওর মুখ কালো কাপড়ে বন্ধ করে। তহ্‌খানার ভিতরে স্বয়ং উজীর খাঁ-মহম্মদ, সিদ্দি হানিফ ও উজীর সাহেবের তিন চারজন লোক ছাড়া আর কারো যাওয়ার হুকুম ছিলো না। বাইরের কেউ এই বন্দীর মুখ দেখেনি।"

"যারা ওর উপর চড়াও হয়েছিলো ?"

"ওরা সবাই উজীর সাহেবের অনুচর। ওদের মধ্যে চারজন নিহত ও দুজন গুরুতর জখম হয়েছে।"

"হ্ম্‌। একটা জোর গোলমাল কিছু হচ্ছে মহলের ভিতর। তবে সুলতান যখন এতখানি তৎপরতার সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যাই হোক, বোধ হয় সুলতানেরই জিৎ হোলো।"

মুল্লা ইব্রাহিম একটু হাসলো। "একটা খবর শুনলে বেহুঁশ হয়ে যাবে সিদ্দি কামগার।"

"কি ?"

"শহরের কোতোয়াল এবং ওঁর অন্যান্য সঙ্গী যারা কাল রাত্তিরে সেই লোকটিকে গিরফতার্ করেছিলো, তাদের প্রত্যেককে বন্দী করে কড়া পাহারায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে কয়েদখানায়।"

"সে কি? কখন ? ওকে তো কিছুক্ষণ আগে দেখেছি কেল্লার দরওয়াজায়।"

"এই মাত্র।"

"এই মাত্র ? আশ্চর্য !" বিস্ময়ভরে বলে উঠলো সিদ্দি কামগার, "কার এত সাহস সুলতান ও উজীর সাহেবের প্রিয়পাত্র, বিজাপুর শহরের কোতোয়াল সিদ্দি ইউসুফকে কয়েদ করবার হুকুম দেয় ?"

"ভাই সিদ্দি কামগার, জীবনে অনেক কিছু দেখেছো, আরো অনেক কিছু দেখবে। ওকে বন্দী করবার নির্দেশ দিয়েছেন খুদ সুলতান আলি আদিল শাহ।"

দুর্গ প্রাকারের নিচে বার বার চিৎকার করে উঠছে অধৈর্য জনতা। সেদিকে তাকিয়ে সিদ্দি কামগার বললো, "শহরের লোক মালিক সুলতানকে দেখতে চাইছে। উনি একবার এখানে এলে ভালো হয়।"

"হ্যাঁ, সেই খবরটাও দিতে এসেছি। আপনি ঘোষণা করে দিন, মালিক-ই-জাহাঁ সুলতান আলি আদিল শাহ জানিয়েছেন তিনি প্রজাদের শান্ত করবার জন্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই উপনীত হবেন বুরুজ্-ই দর্শন্-এ!"

চারপাইএর উপর বড়ী সাহিবা বসে আছে ললাট করতলন্যস্ত করে।

সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনছিলো ইয়ার ইসমাইল বেগের কথা। বক্তব্য শেষ করে ইসমাইল বেগ্ বললো, "হজরত বেগম্ সাহিবা, আঠারো বছর আগে আমাদের মালিক স্বর্গীয় সুলতান আমার হিফাজত্এ দিয়েছিলেন আপনাদের এই সন্তানকে। আজ আপনার সন্তানকে আপনার হাতে প্রত্যার্পণ করে আমি ভারমুক্ত হতে চাই।"

উজীর খাঁ-মহম্মদ সবার মুখের দিকে তাকালো। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে আপনিই হামিদ খাঁ?"

"আপনি কি আমায় চেনেন না খাঁ-মহম্মদ?" স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইসমাইল বেগ্ জিজ্ঞেস করলো।

শান্তকণ্ঠে খাঁ-মহম্মদ উত্তর দিলো, "আমার বয়েস হয়েছে। চোখের ভুল হতে পারে। শুধু তার উপর নির্ভর করে বিনা প্রমাণে কোনো কথা আমি মেনে নিতে রাজী নই। হয়তো আপনিই হামিদ খাঁ। আপনার পূর্বপরিচিত অনেককে উপস্থিত করে আপনি আপনার নিজের পরিচয় প্রমাণিত করতে পারেন। খুদ সিদ্দি মর্জনও বলছেন আপনি হামিদ খাঁ। আফজল খাঁও বলেছেন, তিনি আপনাকে চিনতে পেরেছেন। আপনি নিশ্চয়ই হামিদ খাঁ। কিন্তু এই ব্যক্তিই যে বড়ী সাহিবার সন্তান তার প্রমাণ কি? আমার তো ধারণা এ হারেমের সেই নারী শামস্-উন-নিসার সন্তান। আপনি কোনো গূঢ় উদ্দেশ্যে ওকে নিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন। আজ আপনি মোগলদের অর্থপুষ্ট। আপনি তাদের নির্দেশে একে বিজাপুরে নিয়ে এসেছেন একটা গোলযোগ সৃষ্টি করবার জন্যে, যাতে তার সুযোগ নিতে পারে আওরংজেব।"

ইসমাইল বেগ্ উত্তর দিতে যাচ্ছিলো কিন্তু বড়ী সাহিবা আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো ওসমানের কাছে। হাত বাড়িয়ে ওর বুকের উপর থেকে জামাহ্‌র সম্মুখভাগ সরিয়ে দিলো। সেখানে দেখা গেল একটা মস্তো বড়ো জড়ুল।

"আমার পত্নী ফতিমা সেই শামস্-উন-নিশার খাদিমান আয়েশা-

বানু," বলে উঠলো ইসমাইল বেগ্, "সে এখন আশ্রয় নিয়েছে সিদ্দি মরজন্‌এর গৃহে। তাকে এখানে আনানোর হুকুম হোক। তার কাছে প্রমাণ আছে। বড়ী সাহিবার শিশুসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিলো একটা সোনার বাজুবন্ধ। সেটি এখনও তার কাছে আছে।"

"আমার আর কোনো প্রমাণের দরকার নেই," বড়ী সাহিবা আস্তে আস্তে বললো। তাঁর কণ্ঠস্বর শেষ কথাগুলোতে এসে রুদ্ধ হয়ে গেল। ধীর পদক্ষেপে ফিরে এলো চারপাইএর কাছে।

ওসমান তাকালো ইসমাইল বেগের দিকে। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "এসব কথা আমাকে এতদিন জানানো হয়নি কেন?"

"জানানোর সময় হয়নি বলেই জানাইনি," উত্তর দিলো ইসমাইল বেগ্।

আমি জানলে কখনো এদেশে আসতাম না," বলে উঠলো ওসমান, "আমি দরিদ্র পিতামাতার দরিদ্র সন্তান, এই পরিচয়েই সুখে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম।"

"তোমার নিয়তিই তোমায় এখানে নিয়ে এসেছে ওসমান," উত্তর দিলো ইসমাইল বেগ, "আমি আর ফতিমা আমরা শুধু আমাদের কর্তব্য পালন করেছি।"

সুলতান আলি আদিল শাহ এতক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো বড়ী সাহিবার পাশে। ইসমাইল বেগের কথা শুনে হেসে উঠলো। বললো, "ওর নিয়তি? হ্যাঁ ওর নিয়তিই ওকে এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কি সেই নিয়তি কে বলতে পারে! তবে হ্যাঁ, আমার নিয়তিও আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমার কাছে খবর এলো ইকবাল খাঁর কন্যাকে জেনানা-কয়েদখানা থেকে বার করে নিয়ে এসেছেন হজরত বড়ী সাহিবা। এ খবর শুনে আমার ভালো লাগেনি। আমার হুকুমে যাকে মহলে আনা হয়, আমার

হেফাজত্ থেকে তাকে কেউ সরিয়ে নেবে এটা আমি বরদাশ্ত্ করতে চাই না। তাই হজরত বড়ী সাহিবার কাছে খবর নিতে আসছিলাম। পথে শুনলাম, উজীর খাঁ-মহম্মদের বন্দীকে তহ্খানা থেকে উদ্ধার করে সিদ্দি মর্জন ও ইকবাল খাঁও এদিকে আসছেন। তাই প্রতিরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করে নিলাম এখানে আসবার আগে। কিন্তু সিদ্দি মর্জন্! ইকবাল খাঁ ও হামিদ খাঁর ষড়যন্ত্রের মধ্যে আপনিও যোগ দিলেন? আপনি বিজাপুরী ফৌজের মির বকশি, আপনাকে একজন দেশভক্ত বিশ্বস্ত সর্দার বলেই জানতাম।"

"আমি অবিশ্বাসের কাজ কিছু করিনি," গম্ভীর কণ্ঠে সিদ্দি মর্জন উত্তর দিলো, "আমি কারো কোনো ষড়যন্ত্রের মধ্যেও নেই। কাল শেষরাত্রে যখন সিদ্দি দিলওয়ার, হামিদ খাঁ ও ইকবাল খাঁ গোপনে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে সব খুলে বললো, তখন আমি ওদের কথা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ পেলাম না। আমার মনে হোলো, এ রাজ্যের একজন বিশ্বস্ত সর্দার হিসাবে হামিদ খাঁকে হজরত বড়ী সাহিবার সমক্ষে উপস্থিত হতে দেওয়া প্রয়োজন, তা নইলে একটা বড়ো অবিচার ঘটে যাবে। এ ব্যাপারের একটা সন্তোষজনক নিষ্পত্তি অবিলম্বে না হলে একটা অন্তর্বিপ্লব ঘটে যেতে পারে দেশের মধ্যে, যার সুযোগ নেবে আওরংজেব। তাই আমি নিজের দায়িত্বে এদের এনে উপস্থিত করলাম এখানে। আমার সহায়তা না পেলে ওরা কেল্লার ভিতরে আজ প্রবেশ করতে পারতো না। ওসমানও বেশীক্ষণ জীবিত থাকতো না।"

বড়ী সাহিবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খাঁ-মহম্মদের দিকে তাকালো। খাঁ-মহম্মদ সহ্য করতে পারলো না সেই দৃষ্টি, চোখ ফিরিয়ে নিলো।

সুলতান আলি আদিল শাহ জিজ্ঞেস করলো সিদ্দি মর্জন্কে, "তাহলে অন্যান্য বিদ্রোহী সর্দারদের মতো আপনিও চেয়েছিলেন

আমাকে তখ্‌ত থেকে অপসারিত করে এই ওসমানকে তখ্‌ত-এ-হাসিল করতে ?”

“না, আমি কিছুই চাইনি। আমি শুধু হামিদ খাঁ ও এঁকে হজরত বড়ী সাহিবার সামনে উপস্থিত করেছি। তারপর উনি যা স্থির করবেন, তাই হবে। এবং আমি সেটা মেনে নেবো। এখানে আসবার আগে একথা ওদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি।”

সুলতান আলি আদিল শাহ এবার ফিরলো বড়ী সাহিবার দিকে। বড়ী সাহিবা দু-হাতে মুখ ঢাকলো।

“মা!” ডাকলো আলি আদিল শাহ।

মুখ না তুলেই জোরে জোরে মাথা নাড়লো বড়ী সাহিবা।

“মা! তাহলে হামিদ খাঁ যা বলছে তাই সত্যি? আমি তোমার সন্তান নই? আমি আমার পিতার পরসতারের সন্তান? তোমার সন্তান ওই ওসমান?”

মুখ ঢেকে বসে রইলো বড়ী সাহিবা। কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

আলি আদিল শাহ ফিরে তাকালো ইসমাইল বেগের দিকে। বললো, “হামিদ খাঁ, আপনি তাহলে এই দীর্ঘ আঠারো উনিশ বছর বসেছিলেন কেন? যখন আমরা শিশু, তখন কেন নিয়ে আসেননি ওই ওসমানকে?”

“ওর নিরাপত্তার কথা ভেবেই আনিনি,” ইসমাইল বেগ উত্তর দিলো।

“এখন ও নিরাপদ!” জিজ্ঞেস করলো আলি আদিল শাহ। মুখে একটুখানি ব্যঙ্গের হাসি।

“এখন ওসমান নিজেকে নিজে রক্ষা করতে সমর্থ।”

“দেখা যাক,” হাসলো আলি আদিল শাহ। তারপর আবার ফিরলো বড়ী সাহিবার দিকে। বললো, “বেশ, তুমি যখন অস্বীকার করছো না, আমি মেনে নিলাম, ওই ওসমানই তোমার সন্তান, ও-ই

তখ্‌তএর নায্য উত্তরাধিকারী। আমি তোমার কেউ নই, আমি আমার পিতা স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র অবৈধ সংসর্গ-জাত পুত্র, আমার কোনো অধিকার নেই বিজাপুরের তখ্‌তএ। মা!—না, না, তোমাকে মা ডাকবার অধিকার আমার নেই,—আমার গুস্তাকী মাপ করো, হজরত বেগম সাহিবা, কিন্তু এখন আমি কি করবো বলে দাও।"

বড়ী সাহিবা মুখ ঢেকে চুপ করে রইলো। একবার কেঁপে উঠলো সারা শরীর।

"হজরত বেগম সাহিবা, আমি কি করবো বলো। কেল্লার বাইরে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে। ওরা শুনতে পেয়েছে যে দেশের দুর্দিনে একদল বিদ্রোহী সর্দার সুলতানকে তখ্‌ত থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। ওরা দেশভক্ত প্রজা, তাই দলে দলে এসেছে হজরত বড়ী সাহিবা ও সুলতান আলি আদিল শাহ্‌কে তাদের আনুগত্য জানাতে। আমি কি বুর্‌জ্‌-ই-দর্‌শন্‌এ হাজির হয়ে বলবো,—হে বিজাপুরের প্রজাবৃন্দ, মোগল শাহজাদা আওরংজেব যা বলে তাই সত্য। আমি সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র অবৈধ সন্তান। সুলতানের তখ্‌ত-এ আমার কোনো অধিকার নেই। তোমাদের যে আসল সুলতান সে এসেছে মোগল দক্কানের রাজধানী আওরঙ্গাবাদ থেকে, তোমরা তার জয়ধ্বনি দিয়ে তাকে তখ্‌ত-এ হাসিল করো। বলো, হজরত বেগম সাহিবা, এই কি আমার করা উচিত?"

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালো বড়ী সাহিবা, কোনো উত্তর দিলো না।

ওসমান এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, ভাবছিলো এ কি নাটকীয় পরিবর্তন এলো তার জীবনে। ছিলো শাহী ফৌজে আহাদি, কোনো একদিন মনসবদার হবে, শুধু এটুকুই ছিলো তার উচ্চাভিলাষ। আজ শুনছে সে যাদের এতদিন পিতামাতা জেনে

এসেছে, সেই ইসমাইল বেগ্ আর ফতিমা বিবির সন্তান সে নয়। তার পিতা বিজাপুরের সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ, তার গর্ভধারিণী জননী সম্মুখে উপবিষ্ট ওই বেগম সাহিবা।

ওসমান তাকালো আরজুমান-আরার দিকে। সে মুখের উপর নকাব তুলে দিতে ভুলে গেছে। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক হয়ে।

এবার সুলতান আলি আদিল শাহ্‌র দিকে ফিরে তাকালো ওসমান। আদবত্নরস্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে বললো, "না, মালিক-ই-জাহাঁ, আপনাকে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে না। আমি চলে যাবো বিজাপুর ছেড়ে।"

"ওসমান, আমিও চলে যাবো তোমার সঙ্গে—," বলে উঠলো আরজুমান-আরা। ইকবাল খাঁর দিকে ফিরে বললো, "[illegible], এ সেই ওসমান, যার কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম একদিন।"

"হ্যাঁ, হামিদ খাঁর কাছে আমি সব শুনেছি," ইকবাল খাঁ উত্তর দিলো।

"কিন্তু এই রাজ্য, এই তখ্‌ত-এর বৈধ উত্তরাধিকারী তুমি," বললো ইসমাইল বেগ্।"

"না," দৃঢ়কণ্ঠে জানালো ওসমান, "রাজ্য, তখ্‌ত আমার দরকার নেই। এসব জটিলতার বিন্দুমাত্র আভাস পেলে আমি বহুপূর্বেই আপনাকে নিবৃত্ত করতাম। আমি হু-হুবার কয়েদখানায় আবদ্ধ হয়েছি, তৃতীয়বার একটি সোনার পিঞ্জরে ঢুকতে চাই না। আমি মুক্তি চাই। আমি সাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই।"

"চলো ওসমান, আমরা চলে যাই," আরজুমান-আরা এক পা এগিয়ে এসে বললো।

"হ্যাঁ চলো, হজরত বেগম সাহিবা, আমি আপনার সন্তান কিন্তু আমার গুস্তাকী মাপ করবেন, আমি আপনার কোনো

অশান্তির কারণ হতে চাই না, আমার আরজ মন্জুর হোক, আমি আরজুমান-আরাকে নিয়ে চলে যাই বিজাপুর ছেড়ে।”

“চলে যাবে?” হেসে উঠলো আলি আদিল শাহ, “তোমায় যেতে দিচ্ছে কে?”

“না, না, চলে যাক, ও চলে যাক,” মুখ তুলে বলে উঠলো বড়ী সাহিবা, “ওকে যেতে দাও।”

“ও আপনার সন্তান, হজরত বেগম সাহিবা,” আস্তে আস্তে বললো সিদ্দি মর্জন্।

“হ্যাঁ, ও আমার সন্তান, কিন্তু ওকে ছাড়া আমার এত বছর কেটেছে, বাকী জীবনটাও কেটে যাবে। ওকে এসব জটিলতার মধ্যে আনবেন না। আরজুমান-আরাকে বিয়ে করে ও সুখী হোক। আমার ব্যক্তিগত অর্থ হীরে জহরত যা আছে সব ওকে দিয়ে দেওয়া হোক। আলি, ওকে নিরাপদে চলে যেতে দাও।” কথা শেষ করে বড়ী সাহিবা অধর দংশন করে মুখ ফেরালো।

“অর্থ, হীরে, জহরৎ আমাদের প্রয়োজন নেই হজরত বেগম সাহিবা,” বলে উঠলো আরজুমান-আরা, “আমরা শুধু মুক্তি পেয়ে নিরাপদে চলে যেতে পারলেই সুখী হবো।”

আলি আদিল শাহ হেসে উঠলো, হাসতে হাসতে বললো, “বাঃ, তখ্ত্-এ অধিকার হাসিল করা, প্রত্যাখ্যান করা এবং তার বিনিময়ে একটা রফা করার শর্ত, এরই মধ্যে সবই হয়ে গেল? মুক্তি পেয়ে নিরাপদে চলে যাবে?” হঠাৎ গম্ভীর হোলো তার কণ্ঠস্বর, “কিন্তু চলে যেতে দিচ্ছে কে?”

এবার আলোচনায় যোগ দিলো উজীর খাঁ-মহম্মদ। বললো, “ওসমান যে আওরঙ্গাবাদে আওরংজেবের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেবেনা তার নিশ্চয়তা কি? এখানে বেগতিক দেখে ওসমান বলছে, তখ্ত-এর উপর তার কোন লোভ নেই, কিন্তু আওরংজেবের সমর্থন পেলে কি এই নির্লোভ মন থাকবে?”

"বেরাদরজান!" ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে আদিল শাহ বললো, "আমি তোমায় যেতে দিতে পারতাম, তোমায় মুক্তি দিতে পারতাম, যদি তোমার ওই চেহারা না হোতো। অবিকল আমার চেহারা নিয়ে যে তুমি জন্মেছো, সেটাই তোমার চরম দুর্ভাগ্য—"

"না, না," বলে উঠলো বড়ী সাহিবা।

ওঁর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আলি আদিল শাহ্ বলে গেল, "তুমি কোন তখ্ত্এর উপর অধিকার দাবি করতে এসেছো ওসমান? যে তখ্ত-এ হাসিল আছে তখ্ত তার। শক্তি থাকে, কেড়ে নাও। হতে পারো তুমি সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ ও হজরত বড়ী সাহিবার সন্তান, কিন্তু আমার পিতা এই তখ্ত-এর জন্যে মনোনীত করে গেছেন আমাকে। শুনেছি শাম্স্-উন-নিসাকে আমার পিতা অত্যন্ত ভালোবাসতেন, হজরত বড়ী সাহিবা আমার পিতাকে বিবাহ করতে দেন নি সেই নারীকে, এই ভয়ে যদি নিঃসন্তান বড়ীসাহিবার চোখের সামনে শাম্স্-উন-নিসার সন্তান তখ্ত্-এ বসে। নিয়তির এমনই খেলা যে, সেই নারীর সন্তানকেই নিজে লালন পালন করে তখ্ত্-এ বসালেন বড়ী সাহিবা। আজ একথা জানতে পেরে আমার পরম গর্ব যে সেই হতভাগ্য নারী শাম্স্-উন-নিসাই আমার জননী—।"

"আলি!" আর্তস্বরে ডেকে উঠলো বড়ী সাহিবা।

"—আজ আমার পরম আনন্দ যে হজরত বড়ী সাহিবার পুত্র ভিখারীর মতো আমার মহলে এসে উপস্থিত হয়েছে আর অক্ষম জননীর কাছে তখ্ত্ ভিক্ষা করছে, তারপর আমারই কাছে মুক্তি ভিক্ষা করে ফিরে চলে যেতে চাইছে!"

ওসমানের মুখ লাল হয়ে উঠলো। হাত চলে গেল কোষবদ্ধ তরবারির বাঁটে।

"বৃথা বীরত্ব দেখবার চেষ্টা করবে না ওসমান, বাইরে আমার দেহরক্ষী দল আমার নির্দেশের অপেক্ষা করছে।"

"আপনি আমাদের নিরাপদে চলে যেতে দেবেন না ?" ওসমান জিজ্ঞেস করলো।

"না। এই তুনিয়ায় তোমার আমার একই চেহারার তুজন লোকের স্থান হতে পারে না। যারা এখবর জানে, তাদেরও অনেকের জীবিত থাকা বিজাপুর রাজ্যের পক্ষে নিরাপদ নয়।"

সুলতান আলি আদিল শাহ্‌র কথা শুনে সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে, এমন কি বড়ী সাহিবাও। শুধু উজীর খাঁ-মহম্মদের মুখে ফুটে উঠলো আনন্দের আভাস।

"আলি !" বড়ী সাহিবা ডাকলো।

"হুকুম করো, হজরত বেগম সাহিবা।"

"ওসমান আর হামিদ খাঁকে নিরাপদে বিজাপুরের সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া হবে, এই আমার আদেশ। কেউ ওদের কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না।"

আলি আদিল শাহ্‌র মুখে একটা বিষণ্ণ ভাব ফুটে উঠলো। একটু চুপ করে থেকে বললো, "এই হুকুম পালন করার কতো ঝুঁকি সে কি তুমি বুঝতে পারছো না ? শাহজাদা আওরংজেব আমাদের জানিয়েছেন ওসমানকে যদি ওঁর জিলওদার আকিল খাঁর হাতে সমর্পণ করা হয়, তাহলে উনি আমাদের সঙ্গে আপোসের শর্ত আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন।"

"না, না," শিউরে উঠলো বড়ী সাহিবা।

"না, আমিও এপ্রস্তাবে সম্মত নই, কারণ এতে উপস্থিত বিপদ কেটে গেলেও ভবিষ্যতে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।"

"তাহলে, তুমি কি করতে চাও ওসমানকে নিয়ে ?"

"সুলতানের তখ্‌ত্‌-এর দাবিদার হাজির হলে সুলতান কি করে ?"

"না, না, আলি, আমি তোমার কাছে ওর প্রাণভিক্ষা চাইছি।"

"কেন ? ওসমান তোমার সন্তান বলে ?" আবার কঠিন হোলো

আলি আদিল শাহ্‌র কণ্ঠস্বর, "অন্য কেউ আজ আমার তখ্‌ত্‌-এর দিকে নজর ওঠালে তুমি কি এভাবে তার প্রাণভিক্ষা চাইতে?"

"আলি, আমি তোমার মা, আমি তোমার কাছে—"

"না," বাধা দিয়ে আলি বলে উঠলো, "যে মুহূর্তে ওসমানের পরিচয় আমরা পেয়েছি, সেই মুহূর্তে তুমি আর আমার মা রইলে না। কি করে তুমি আমার মা হতে পারো? এরা ষড়যন্ত্র করে ছিলো, কাল যখন শর্জা খাঁর চৌকির পালা পড়বে, এরা মহলে ঢুকে আমায় বন্দী করবে। তুমি কি মনে করেছো তারপর এরা আমায় প্রাণে বাঁচতে দিতো? কি হোতো আমার পরিণতি, সেকথা তুমি ভালো করেই জানো। তারপরও তুমি আমায় বলছো, ওসমানকে নিরাপদে বিজাপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুমতি দিতে?"

"আলি!"

"না, হজরত বেগম সাহিবা, এ আমার তখ্‌ত্‌, আমার নিজের শক্তিতেই একে রক্ষা করতে হবে। একমাত্র উজীর খাঁ-মহম্মদকেই আমি বিশ্বাস করি, আর কাউকে নয়। সিদ্দি মর্‌জন আর তোমার স্বরূপতো আজ স্বচক্ষেই দেখলাম।"

"কিন্তু আমাদের বন্দী করা কি এত সহজ হবে?" ইয়ার ইসমাইল বেগ্‌ জিজ্ঞেস করলো।

আলি আদিল শাহ কোনো উত্তর দিলো না, শুধু দুহাত দিয়ে করতালিধ্বনি করলো। খুলে গেল সামনের রুদ্ধদ্বার। সবাই স্তম্ভিত হয়ে দেখলো বাইরে অঙ্গনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন সশস্ত্র রক্ষী।

তাদের কয়েকজন ভিতরে এলো।

"সর্দার সরবুলন্দ খাঁ," দেহরক্ষীদলের দারোগাকে সম্বোধন করে আলি আদিল শাহ বললো, "ওদের নিরস্ত্র করে নিয়ে যাও কয়েদখানায়—।"

"কয়েদখানায়?" বলে উঠলো ইসমাইল বেগ, "আঠারো বছর

কি দিন গুনেছি এই পরিণতির জন্যে ?” বলে আচমকা তলোয়ার বার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সর্দার সরবুলন্দ খাঁর উপর। কিন্তু চকিতে চারপাঁচজন দেহরক্ষী ঘিরে ফেললো তাকে, এক সঙ্গে চারটি তলোয়ারের আঘাত পড়লো তার উপর। গুরুতর আহত হয়ে ধরাশায়ী হোলো ইসমাইল বেগ্।

চোখের পলকে ঘটে গেল এই ব্যাপার। মুখ ফিরিয়ে নিলো বড়ী সাহিবা। হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো আরজুমান-আরা। আর সঙ্গে সঙ্গে অসি নিষ্কাসিত করলো ওসমান বেগ্। কিন্তু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হোলো তাকে। কারণ, আলি আদিল শাহও সেই ক্ষণে তরবারি কোষমুক্ত করেছে। সেই তরবারি চকিতে স্থাপিত হোলো আরজুমান-আরার কণ্ঠদেশে।

“ওসমান,” আলি আদিল শাহ নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললো, “যে মুহূর্তে উদ্যত হবে তোমার অস্ত্র, আমার তলোয়ার সেই মুহূর্তে আরজুমান-আরার কণ্ঠ বিদীর্ণ করবে।”

“আমি মরতে ভয় পাইনা,” বলে উঠলো আরজুমান-আরা।

“মরতে আমরা কেউই ভয় পাইনা আরজুমান-আরা,” আলি আদিল শাহ বললো, “কিন্তু প্রিয়জনকে নিহত হতে দেখতে ভালো লাগে না আমাদের।”

“কাপুরুষ !” দাঁতে দাঁত ঘষে ওসমান বললো।

“কটুবাক্য তুমি যতো খুশী উচ্চারণ করতে পারো ওসমান,” আলি আদিল শাহ হাসলো, “যতক্ষণ বিজাপুর তখ্‌ত্ আমার ততক্ষণ এসব আমার গায়ে বিঁধবে না। সরবুলন্দ খাঁ! ওসমান আর ইকবাল খাঁর অস্ত্র কেড়ে নাও।”

নিরুপায় ক্রোধে ঠোঁট কামড়ে অস্ত্রসমর্পন করলো ওসমান আর ইকবাল খাঁ। চারজন রক্ষী ঘিরে দাঁড়ালো তাদের। আরো চারজন রক্ষী ভিতরে চলে এলো।

ইসমাইল বেগ্ অচেতন হয়ে পড়ে আছে, মাঝে মাঝে শোনা

যাচ্ছে যন্ত্রণার কাতর ধ্বনি। ওসমান ইসমাইল বেগের পাশে বসে পড়ে ওর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলো।

"সরবুলন্দ খাঁ," আদেশ জানালো আলি আদিল শাহ, "এবার সিদ্দি মর্‌জনের তরবারি খুলে নিয়ে ওকে বন্দী করো।"

"আমাকে!" স্তম্ভিত হোলো সিদ্দি মর্‌জন। সুলতান যে তাকে বন্দী করবার আদেশ দিতে পারে একথা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তলোয়ারের বাঁটে চলে গেল সিদ্দি মর্‌জনের হাত। কিন্তু তার আগেই চারটি তরবারি উদ্যত হোলো তার দিকে। হাত নামিয়ে নিলো সিদ্দি মর্‌জন। সরবুলন্দ খাঁ খুলে নিলো তার তরবারি।

"আমাকে বন্দী করলে বিজাপুরী ফৌজ বিদ্রোহ করবে," বললো সিদ্দি মর্‌জন।

"দেশদ্রোহীকে বন্দী করলে বিজাপুরী ফৌজ আনন্দিত হবে," উত্তর দিলো আলি আদিল শাহ।

"আমি দেশদ্রোহী?"

"হ্যাঁ, আপনি ইসমাইল বেগের পত্নীকে আশ্রয় দিয়েছেন, ইসমাইল বেগ্‌ ও ইকবাল খাঁর মতো দুজন ষড়যন্ত্রকারীকে মহলের ভিতর আসতে সহায়তা করেছেন, ওসমানকে প্রহরীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন—এর প্রত্যেকটিই রাষ্ট্রদ্রোহিতা।"

আরো চারজন রক্ষী চলে এলো অঙ্গন পার হয়ে।

"সরবুলন্দ খাঁ—!"

"হ্যাঁ, মালিক সুলতান—," বলে রক্ষী চারজনকে নিয়ে আফজল খাঁর দিকে এগিয়ে এলো সরবুলন্দ খাঁ। আফজল খাঁর একটা বিদ্বেষ ছিলো সিদ্দি মর্‌জনের উপর, তাকে অপমানিত হতে দেখে হাসি ফুটে উঠেছিলা আফজল খাঁর মুখে। কিন্তু কিছু বুঝে উঠবার আগেই যখন চারজন রক্ষী তরবারি উদ্যত করে তাকেও ঘিরে ফেললো, তখন মিলিয়ে গেল তার হাসি। চকিতে তার অস্ত্র খুলে নিলো সরবুলন্দ খাঁ।

স্তম্ভিত হয়ে আফজল খাঁ বলে উঠলো, "একি উন্মাদের মতো কাজ হচ্ছে মালিক সুলতান! আমাকে কেন?".

নির্বিকারভাবে আদিল শাহ বললো, "আমি নিরুপায় আফজল খাঁ। আপনি হজরত বেগম সাহিবার আত্মীয়, যখন দেখবেন হজরত বেগম সাহিবাকে কোনো এক সুরক্ষিত মহলে নিঃসঙ্গ বন্দীজীবন যাপন করতে হচ্ছে, আপনি কি নীরবে সহ্য করবেন? তাছাড়া, আজ আপনি এত দেখেছেন ও জেনেছেন যে, আমি নিরাপদ বোধ করতে পারছি না—।"

"খাঁ-মহম্মদ!" উজীরের দিকে ফিরে তাকালো আফজল খাঁ।

"আমি নিরুপায়," উজীর খাঁ-মহম্মদ উত্তর দিলো, "আমি মালিক সুলতানের খাদিম।"

এককোণে দাঁড়িয়ে প্রফুল্লমুখে সমস্ত পরিস্থিতি উপভোগ করছিলো সিদ্দি হানিফ। কয়েকজন রক্ষীকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তার হাসিও অন্তর্হিত হোলো।

"মালিক!" সে আর্তকণ্ঠে ডাকলো উজীর খাঁ-মহম্মদকে।

"কোনো প্রতিবাদ কোরো না সিদ্দি হানিফ," বললো খাঁ-মহম্মদ, "আত্মসমর্পণ না করে তোমার কোনো উপায় নেই।"

নিরস্ত্র করা হোলো তাকেও। সে শঙ্কা ও বিস্ময়ে নয়ন বিস্ফারিত করে তাকালো সবার দিকে। তারপর ব্যাকুলকণ্ঠে [illegible] করলো, "আমার কি অপরাধ মালিক-ই-জাহাঁ? আমি তো অতি বিশ্বস্তভাবে আপনার খিদমত করেছি।"

"সিদ্দি হানিফ," বললো আলি আদিল শাহ, "তোমার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তুমিই প্রথম আওরঙ্গাবাদের বাজারে ও[illegible]কে দেখতে পেয়ে তার কথা আমাদের কর্ণগোচর করেছিলে। কিন্তু তোমার দুর্ভাগ্য যে ওসমান ও আমার জন্মরহস্য তুমিও অবগত আছো। তা-ছাড়া, আওরঙ্গাবাদের কেল্লায় আমাদেরও গুপ্তচর এবং সংবাদদাতা আছে। তুমি কি শুনলে খুশী হবে যে,

শাহজাদা আওরংজেবের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করে তার বিনিময়ে তুমি বিজাপুরী ফৌজ সম্বন্ধে গোপন খবর শাহজাদাকে [illegible] যে স্বীকৃত হয়েছো, সে সংবাদ এবং তার প্রমাণ আমাদের কাছে এসে গেছে?"

পাংশুবর্ণ ধারণ করলো সিদ্দি হানিফের মুখ। কোনো উত্তর দিতে পারলো না সে। আর্তদৃষ্টিতে তাকালো উজীর খাঁ-মহম্মদের দিকে। খাঁ-মহম্মদ তাকালোই না তার দিকে।

এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আলি আদিল শাহ্‌র কথা শুনছিলো বড়ী সাহিবা। এবার আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো তার কাছে, ডাকলো, "আলি!"

"হুকুম করো, হজরত বেগম সাহিবা," বললো আলি আদিল শাহ।

বড়ী সাহিবা ঠোঁট কামড়ালো একটুখানি, তারপর [illegible] করলো গম্ভীর কণ্ঠে, "আমাকে কি তুমি আর মা বলে সম্বোধন করবে না?"

চোখ ফিরিয়ে নিলো আলি আদিল শাহ। উত্তর দিলো, "না, এজীবনে আর নয়।"

"তুমি আমাকেও কয়েদ করে রাখবে?"

"হ্যাঁ। তবে তুমি স্বর্গীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ্‌র প্রধানা বেগম, তোমার কোনো অসম্মান আমি হতে দেবো না। তুমি কয়েদ হয়ে থাকবে মহলের ভিতরেই। দেশের শাসন পরিচালনায় তোমার প্রাধান্যের দিন এবার শেষ হোলো।"

"আজ এত বছর ধরে জননীর সমস্ত স্নেহ দিয়ে আমি তোমায় মানুষ করেছি, এই কি তার প্রতিদান?"

"আমি শামস্‌-উন-নিসার সন্তান বলে জানলে কি সেটা পারতে, হজরত বেগম সাহিবা?"

কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলো বড়ী সাহিবা, তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "আলি, এই অভিমান কার উপর?"

হঠাৎ ফেটে পড়লো আলি আদিল শাহ। রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠলো, "অভিমান! সুলতান কারো উপর অভিমান করে না। মাথায় যার শাহী তাজ, তার হৃদয়ে কোনো কোমল বৃত্তি, কোনো ভাবপ্রবণতার স্থান নেই। যখন জানতাম তুমি আমার মা, তখন আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, অবোধ ছিলাম। আমি আমার আনন্দ বিলাস নিয়ে ছিলাম পরিতৃপ্ত, জানতাম রাজ্যশাসনের জন্মে তুমি আছো, সর্দার আফজল খাঁ আছেন, উজীর খাঁ-মহম্মদ আছেন। আজ যখন জানলাম তুমি আমার কেউ নও, তখন বুঝলাম আমি এক হতভাগ্য নিঃসঙ্গ সুলতান, ছুনিয়ার কেউ আমার নয়। সেই মুহূর্তে আমি বদলে গেছি হজরত বেগম সাহিবা, একেবারে বদলে গেছি। রাজ্য শাসনের সমস্ত দায়িত্ব এখন আমার। আমি আর সেই অবোধ সুলতান নই, আমার এখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। স্বচক্ষেই তো দেখলে, কিরকম অনায়াসে বন্দী করলাম এক একজন করে এদের সবাইকে। একদিন আগে কেউ ভাবতে পারতো, কোনো গভীর ষড়যন্ত্র এক মুহূর্তে নির্মূল করে দিতে পারবে আলি আদিল শাহ, বন্দী করতে পারবে বিশিষ্ট সর্দার সিদ্দি মর্জন্‌কে, সর্দার আফজল খাঁকে? রাজ্য শাসন থেকে সরিয়ে দিতে পারবে তোমার মতো ক্ষমতাশালী নারীকে?"

"আলি!"

"আমায় আর নাম ধরে ডেকো না হজরত বেগম সাহিবা। আমি মালিক-ই-জাঁহা সুলতান-এ-আদিল আলি আদিল শাহ।"

বেদনাহত দৃষ্টিতে বড়ী সাহিবা তাকালো আলি আদিল শাহ্‌র দিকে, তারপর বললো, "বেশ, আমাকেও যদি কয়েদ হয়ে থাকতে হয়, তাহলে মহলের ভিতর কেন, আমি আমার সন্তান ওসমানের সঙ্গেই যাচ্ছি। এসো, আরজুমান-আরা।"

"না, আরজুমান-আরা যাবে আমার সঙ্গে," কঠিন কণ্ঠে বললো আলি আদিল শাহ।

"তোমার সঙ্গে?"

"না, না, সে হতে পারে না," বলে উঠলো ওসমান। ইয়ার ইসমাইল বেগের মাথা নিজের কোল থেকে নামিয়ে ওসমান উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে চারপাঁচজন রক্ষী চেপে ধরলো ওসমানকে।

"এসো," আলি আদিল শাহ ডাকলো আরজুমান-আরাকে।

"না, আমার স্থান ওসমানের পাশে," বলে উঠলো আরজুমান-আরা, "আমি মরতে চাই ওসমানের সঙ্গে, আমায় কেউ জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না ওর কাছ থেকে।"

"কেউ পারবে না?" ব্যঙ্গের হাসি হেসে আলি আদিল শাহ জিজ্ঞেস করলো।

সিদ্দি মর্‌জন, আফজল খাঁ, ইকবাল খাঁ প্রত্যেকেরই মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো। কিন্তু প্রত্যেকেই নিরুপায়, প্রত্যেকে নিরস্ত্র, প্রত্যেকের দুপাশে সশস্ত্র প্রহরী। ওসমান জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো প্রহরীদের কবল থেকে, কিন্তু পারলো না।

আলি আদিল শাহ ওসমানের দিকে ফিরে বললো, "এই তোমার উচ্চাভিলাষের প্রতিফল। যেই সুলতানের তখ্‌ত্‌ দখল করবার দুঃসাহস তোমার হয়েছিলো তারই হারেমে উপভোগ্যা নারী হয়ে থাকতে হবে তোমায় প্রণয়ীকে। তোমায় এভাবে চরম অপমান করার আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাই না।"

"আলি!" গর্জে উঠলো বড়ী সাহিবা। এক মুহূর্তে বদলে গেল বড়ী সাহিবার সমস্ত ব্যক্তিত্ব। ক্রুদ্ধা সিংহীর মতো ফুলে উঠলো বড়ী সাহিবা, আগুন জ্বলে উঠলো দুটি চোখে।

আলি আদিল শাহ ভ্রূক্ষেপ করলো না। আরজুমান-আরার দিকে ফিরে বললো, "এসো আমার সঙ্গে। স্বেচ্ছায় যদি না আসো আমি জোর করে ধরে নিয়ে যাবো তোমায়।"

ভয়চকিত ত্রস্ততায় দু-পা পেছনে সরে গেল আরজুমান-আরা। আলি আদিল শাহ এগিয়ে এলো তার দিকে।

মুহূর্তে তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো বড়ী সাহিবা। গর্জে উঠলো, "খবরদার, ওকে স্পর্শ করবে না।"

সবাই স্তম্ভিত হয়ে দেখলো একটি শানিত ছুরিকা ঝলমল করছে বড়ী সাহিবার হাতে। কখন বার করে নিয়েছে পশমিনার আঁট কাবার অন্তরাল থেকে।

আলি আদিল শাহ হেসে উঠলো। বললো, "তুমি? তুমি আমায় ছোরা দেখিয়ে শাসাচ্ছো? পারবে? আমার বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে পারবে তুমি?"

মুহূর্তে নিস্তেজ হয়ে গেল বড়ী সাহিবা। ছোরা পড়ে গেল অবশ হাত থেকে।

পায়ের আঘাতে ছোরা একপাশে সরিয়ে দিলো আলি আদিল শাহ। তারপর বড়ী সাহিবাকে সরিয়ে আরজুমান-আরার দিকে এগিয়ে গেল।

সবার ক্ষণিক অসাবধানতার সুযোগ নিলো সিদ্দি হানিফ। চোখের পলকে মাটি থেকে ছোরা কুড়িয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আলি আদিল শাহ্‌র উপর।

সরবুলন্দ খাঁ ও দু-তিনজন রক্ষী ছুটে গেল সিদ্দি হানিফের দিকে। কয়েকটি তরবারির নিষ্ঠুর আঘাত পড়লো তার উপর। প্রাণহীন দেহ নিচে লুটিয়ে পড়লো।

কিন্তু তার আগেই ভূতলশায়ী হয়েছে সুলতান আলি আদিল শাহ। ছোরার বাঁট বেরিয়ে আছে পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগ থেকে।

"আলি!" প্রবল কান্নায় তার পাশে বসে পড়লো বড়ী সাহিবা। কোন উত্তর এলো না। আলি আদিল শাহ্‌র নিষ্প্রাণ চোখ দুটো নিশ্চল হয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সবাই।

তারপর সরবুলন্দ খাঁ ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, "মালিক-ই-জাহাঁ নিহত হয়েছেন। কি হবে এখন?"

"দ্বার বন্ধ করে দাও," গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করলো উজীর খাঁ-মহম্মদ।

সরবুলন্দ খাঁ বন্ধ করে দিলো গুসলখানার প্রবেশদ্বার।

"বাইরে যারা আছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি কি হয়েছে," আস্তে আস্তে বললো খাঁ-মহম্মদ, "ভিতরে যারা আছে, তারা আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত। সুতরাং কেউ কিছু জানবে না।"

বড়ী সাহিবা মুখ গুঁজে পড়ে আছে আলি আদিল শাহ্‌র বুকের উপর। সেদিকে কেউ তাকালো না।

"প্রহরীরা সবাই সরে দাঁড়াও," আদেশব্যঞ্জক কণ্ঠে বললো খাঁ-মহম্মদ, "সরবুলন্দ খাঁ! সিদ্দি মর্‌জন্‌, আফজল খাঁ, ইকবাল খাঁ ও ওসমানের তরবারি সসম্মানে প্রত্যার্পণ করুন।"

যথাবিহিতভাবে আদেশ প্রতিপালিত হোলো।

সিদ্দি মর্‌জন্‌ তাকালো আলি আদিল শাহ্‌র মৃতদেহের দিকে। তারপর খাঁ-মহম্মদকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি বললেন? কেউ কিছু জানবে না?"

"সে কি করে হয়," বলে উঠলো আফজল খাঁ, "সুলতানের মৃত্যু-সংবাদ কতক্ষণ গোপন রাখবেন প্রজাসাধারণের কাছ থেকে?"

উজীর খাঁ-মহম্মদ সবার মুখের দিকে তাকালো এক এক করে। তারপর খুব মৃদুকণ্ঠে বললো, "সুলতানের মৃত্যু সংবাদ? আপনারা ভুল করছেন।"

"আপনি এ কি রহস্য করছেন খাঁ-মহম্মদ?" জিজ্ঞেস করলো সিদ্দি মর্‌জন।

"হ্যাঁ, আপনারা ভুল করছেন। কে বলছে সুলতান আলি আদিল শাহ্‌র মৃত্যু হয়েছে?"

সবাই বিস্মিত হয়ে তাকালো খাঁ-মহম্মদের দিকে। সেই

...তার মধ্যে বড়ী সাহিবার চাপা ক্রন্দনধ্বনি সবার কানে এলো। কিন্তু সেদিকে কেউ তাকালো না।

খাঁ-মহম্মদ আস্তে আস্তে বললো, "এখানে নিহত হয়েছে ওসমান নামে এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি। আমাদের সুলতান আলি আদিল শাহ দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সামনে।"

সবাই ওসমানের মুখের দিকে তাকালো, তারপর তাকালো ভূলুণ্ঠিত দেহের মুখের দিকে। তারপর এক একজন করে সবাই হাঁটু গেড়ে ওসমানের সামনে বসে পড়লো, বুকের উপর দু-হাত আড়াআড়ি ভাবে রেখে। এক সঙ্গে বলে উঠলো সবাই—"মালিক-ই-জাহাঁ মুবারক।"

জ্ঞান ফিরে এসেছিলো ইয়ার ইসমাইল বেগের। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলো,—"ওসমান!" ওসমান কাছে গিয়ে বসে পড়লো এক পাশে।

"আমি জানতাম," খুব আস্তে আস্তে বললো ইয়ার ইসমাইল বেগ্। তারপর এক পাশে ঢলে পড়লো তার মাথা।

সিদ্দি মর্‌জন নিজের কাবা খুলে ইয়ার ইসমাইল বেগের দেহ ঢেকে দিলো।

ওসমান উঠে দাঁড়ালো আস্তে আস্তে। প্রশস্ত গুসলখানা নিঝুম নিস্তব্ধ। শুধু থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে বড়ী সাহিবার রোদনের চাপা আওয়াজ।

"মালিক-ই-জাহাঁ", বললো উজীর খাঁ-মহম্মদ, "কেল্লার বাইরে বিপুল জনতা সুলতান আদিল শাহ্‌র দর্শনপ্রার্থী। সুলতান-এ-আদিল বুর্‌জ্‌-ই-দর্‌শন্‌এ হাজির হয়ে তাদের সন্তুষ্টিবিধান করুন।"

ওসমান বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো উজীর খাঁ-মহম্মদের দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে আরজুমান-আরার দিকে তাকালো।

"আরজুমান-আরা!" ডাকলো ওসমান।

সে কাছে এসে দাঁড়ালো।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ওসমান বললো, "আরজুমান-আরা, ইয়ার ওসমান বেগের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু নিঃসঙ্গ হয়ে গেল সুলতান-আলি আদিল শাহ। কারণ তার পরম সুহৃদ ইয়ার ইসমাইল বেগও আর ইহলোকে নেই।"

"না, তুমি নিঃসঙ্গ হওনি, আলি আদিল শাহ," আরজুমান-আরা উত্তর দিলো, "তোমার পাশে আমি আছি।"

দুজনে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো বড়ী সাহিবার কাছে। ওসমান আস্তে আস্তে ডাকলো, "মা!"

বড়ী সাহিবা কোনো উত্তর দিলো না।

"মা!" আবার ডাকলো ওসমান।

বড়ী সাহিবা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। সারা মুখ কান্নায় ভিজে আছে।

ওসমানের দিকে ফিরেও তাকালো না বড়ী সাহিবা। আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল মহলের ভিতরে যাওয়ার দ্বারপথ দিয়ে।

ওসমান তাকিয়ে রইলো। প্রশস্ত বারান্দা চলে গেছে মহলের দিকে।

সে পথ ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেল বড়ী সাহিবা।

॥ পরিশিষ্ট ॥

আকিল খাঁ ফিরে এলো আওরঙ্গাবাদে। হরকরা মারফত সংক্ষিপ্ত সমাচার আগেই পেয়েছিলো আওরংজেব। বিস্তারিত বিবরণ শুনলো আকিল খাঁর কাছে।

"ওদের ষড়যন্ত্র তাহলে সফল হোলো না", জিজ্ঞেস করলো আওরংজেব।

"না, আলিজা", আকিল খাঁ উত্তর দিলো, "সুলতান খুব তৎপরতার সঙ্গে নিজের দেহরক্ষীবাহিনীর সহায়তায় বিদ্রোহীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। মহলের ভিতর সেই সংঘর্ষে নিহত হোলো ওসমান আর ইয়ার ইসমাইল বেগ্। যদ্দুর জানতে পেরেছি সেই সিদ্দি হানিফ নামক ব্যক্তির হাতেই নিহত হয়েছে ওসমান।"

সিদ্দি হানিফ?" ভ্রূকুঞ্চিত করে আওরংজেব বললো।

"হ্যাঁ। তবে সিদ্দি হানিফও বাঁচেনি। সেও প্রাণ দিয়েছে সেই সংঘর্ষে। ইতিমধ্যে শহরের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। প্রজারা দলে দলে এসে জমায়েত হয় কিলা অর্কের সামনে। পরে সুলতান আলি আদিল শাহ নিজে বুর্জ্-ই-দর্শন্এ এসে উপস্থিত হয়ে প্রজাদের শান্ত করেন। লোকে বলছে, এই ঘটনার পর একটা আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে সুলতানের মধ্যে। উনি আর মহলের বিলাসপঙ্কে ডুবে থাকেন না, এখন উনি আত্মনিয়োগ করেছেন দেশের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার কাজে। বিদ্রোহী সর্দারেরা সবাই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছে। সুলতান মার্জনা করেছেন সবাইকে। রাজ্যের সর্দারেরা সবাই নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদ

ভুলে তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে একতাবদ্ধ হয়েছে। একটা নতুন উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে বিজাপুরীদের মধ্যে।"

"হুঁঃ", বাঁকা হাসি হাসলো আওরংজেব, "উজীর মির জুমলা পরশু আওরঙ্গাবাদে উপনীত হবেন। আমাদের বিজাপুর আক্রমণ আসন্ন। দেখা যাক, ওদের এই একতা, উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস ওদের কতখানি রক্ষা করতে পারে। না, আকিল খাঁ, বিজাপুরের পতন অবশ্যম্ভাবী। বিজাপুর আমার চাই।"

কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে ভাবলো শাহজাদা আওরংজেব। চক্ষু দুটি মুদিত। মুখখানি ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর। মনে হয় যেন ঝিমুচ্ছে শাহজাদা। সবাই চুপ করে রইলো। হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসলো আওরংজেব, ডাকলো, "আকিল খাঁ—।"

"হুকুম করুন আলিজা—।"

"তোমার একটা কাজ বাকী আছে। দেউড়িতে গিয়ে আমার দুই কন্যার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করো। ওসমান বেগ্ যে নিহত হয়েছে সে সংবাদ ওদের জানা প্রয়োজন। এবং তোমার মুখেই ওদের এ সংবাদ পাওয়া বাঞ্ছনীয়।"

আকিল খাঁ অবাক হয়ে তাকালো শাহজাদার দিকে। আওরং-জেব মন্ত্রণাসভা ভঙ্গ করে চলে গেল মহলের ভিতর।

দেওড়িতে উপনীত হোলো আকিল খাঁ। দেওড়িতে দারোগা খোজা হবিব-উল্লা সংবাদ নিয়ে গেল মহলের ভিতর। কিছুক্ষণ পরে দেওড়ির বিস্তৃত জাফরির ওপারে হাজির হোলো জেব-উন-নিসা ও জিনত-উন-নিসা। জেব-উন-নিসার বিশ্বস্ত খোজা খাদিমের মারফতে সমস্ত সংবাদ জানালো আকিল খাঁ।

শুনতে শুনতে দুজনের চোখ সজল হয়ে উঠলো।

খোজা খাদিম বলে গেল, "আকিল খাঁ বলছেন, [illegible] বিশেষ সংবাদ আছে আপনাদের দুজনের জন্যে সেটা আলিজাকে জানানো হয়নি। ওসমান ও আলি আদিল শাহ দুজনে যখন

মুখোমুখি দাঁড়ালো তখন সবাই আশ্চর্যান্বিত হোলো তাদের চে-ারার আশ্চর্য মিল দেখে। সিদ্দি হান্‌ কর োরার আঘাত ঠিক কে নিহত হয়েছে কেউ ঠিক করে বলতে পারে না। তবে যিনি নিহত হয়ে‍েন তাঁকেই ওসমান বেগ্‌ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, আলি [illegible] শাহ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে অন্যজনকে।

চুপচাপ শুনে গেল আওরংজেবের দুই কন্যা।

খাদিম বলে গেল, "আকিল খাঁ বলছেন, সুলতান আলি আদিল শাহ বিশেষ দূত মারফত আকিল খাঁকে জানিয়েছেন সুলতানের হয়ে যেন তিনি আপনাদের তাঁর স্নেহ ও শুভেচ্ছা জানান। আওরঙ্গাবাদে এক হাবেলির পেছন দিকের বাগিচায় তাঁরা একদিন এক অজ্ঞাত পরিচয় তরুণকে তাঁদের ভ্রাতা বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেকথা স্মরণ করে সুলতান আলি আদিল শাহ তাঁর দুই ভগ্নীকে দুটো হীরার কোতবিলদার স্নেহের উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।"

আকিল খাঁর কাছ থেকে দুটি ছোটো রৌপ্যনির্মিত পেটিকা গ্রহণ করে জেব-উন-নিসার খোজা খাদিম জাফরির এধারে এদের হাতে তুলে দিলো।

হাসি ফুটে উঠলো জিনত-উন-নিসার মুখে। জিজ্ঞেস করলো, "আমার সহেলী ভালো আছে তো?"

খাদিম জানালো, "আকিল খাঁ বলছেন, শীঘ্রই সুলতান আলি আদিল শাহ বিবাহ করছেন সর্দার ইকবাল খাঁর কন্যা আরজুমান-আরাকে।"

"করুণাময় খোদা আমার আরজ্‌ মন্‌জুর করেছেন," বলে উঠলো জিনত-উন-নিসা। তার দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো আনন্দের অশ্রু।

তার দুদিন পরের কথা। সেদিনের তারিখ হোলো আঠারোই জানুয়ারী, উনিশশো সাতান্ন সাল। মির জুমলা তার গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে উপনীত হোলো আওরঙ্গাবাদে। আর সেদিনই

বিরাট মোগল বাহিনী নিয়ে বিজাপুর অভিযানে রওনা হোলো শা-জাদা আওরংজেব।

আরো কয়েক মাস পরের কথা। সেদিনের তারিখ হোলো ছয়ুই সেপ্টেম্বর।

মোগল দরবার তখন দিল্লিতে। বাদশাহ শাহ জাহানের সঙ্গে দারাও দিল্লি এসেছে স্ত্রী পুত্রকন্যাদের নিয়ে। এখানেও বাদশাহ্র সঙ্গে লাল কেল্লায় থাকতো না দারা শিকো। তার ছিলো আলাদা মহল।

প্রত্যেকদিনকার মতো সেদিনও অপরাহ্ণবেলা দারার কন্যা পাক্-নিহাদ বান্নু বেগম পদচারণা করছিলো বেগম মহলের পেছন দিকের প্রশস্ত অলিন্দে। নির্মেঘ আকাশে এক সার বলাকা উড়ে আসছিলো সুদূর দক্ষিণ থেকে। সেদিকে তাকিয়ে এক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। মনে মনে একটা হিসেব করলো পাক্-নিহাদ বান্নু। নয় মাস হয়ে গেছে—।

নয় মাস, তবু যেন মনে হয় মাত্র দুতিন দিন আগেকার কথা।

সেই যে চলে গেল ইয়ার ওসমান বেগ্, আজ পর্যন্ত কোনো খবর নেই।

চোখ বুজলে পাক্-নিহাদ বান্নু এখনো যেন দেখতে পায় সেদিনের সেই ছবি,—আগ্রার শাহী কেল্লার উচ্চ প্রাকার থেকে যমুনার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ইয়ার ওসমান বেগ্।

কতদিন, আর কতদিন!—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলো পাক্-নিহাদ বান্নু বেগম,—আর কতদিন বসে এমনি দিন গুনতে হবে আমায়।

হঠাৎ একটা পদধ্বনি শুনে পাক্-নিহাদ বান্নু ফিরে তাকালো।

দেখলো মহলের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে শাহ-ই-আলিজা দারা শিকো। আসছে পাক্-নিহাদ বানুর দিকে। পাক্-নিহাদ বানু হাসি মুখে এগিয়ে গেল তার পিতার দিকে।

পাক্-নিহাদ বানুর মুখে যতোই হাসি থাক, তার চোখ দুটি কেন বিষণ্ণ সেকথা দারা শিকোর অজানা নেই। সেদিন দারা শিকোও খুব গম্ভীর, খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

"আমার খুবই খুশ কিসমতি, আলিজা, আপনি এসময় কন্যাকে স্মরণ করেছেন," বললো পাক্-নিহাদ বানু।

"কন্যা!" দারা হাত রাখলো পাক্-নিহাদ বানুর কাঁধে, বললো, "দুটি সংবাদ আছে। একটি আনন্দের, একটি রীতিমতো দুর্ভাবনার।"

দারার কথা শুনে পাংশু হোলো পাক্-নিহাদ বানুর মুখ। বললো, "বলুন, পিতা—।"

"পাক্-নিহাদ বানু। বিজাপুর থেকে ওসমানের সংবাদ এসেছে। আমাদের সঙ্গে বিজাপুরের প্রবল যুদ্ধ চলছে, তাই সংবাদ আসতে এত বিলম্ব হোলো।"

"ওসমানের সংবাদ!" চঞ্চল হয়ে উঠলো পাক্-নিহাদ বানু, "কি সংবাদ পিতা? কেমন আছে ওসমান?"

"পাক্-নিহাদ বানু, আমার কথা মন দিয়ে শুনে বুঝবার চেষ্টা করো কি বলছি। আগে থেকেই বিচলিত হয়ে উঠোনা।"

অধৈর্য হয়ে উঠলো পাক্-নিহাদ বানু। কিন্তু দেখাতে চাইলো না সেই অধীরতা। শাহ-ই-আলিজার সামনে সংযতভাবে কথা বলাই মহলের আদব।

"পাক্-নিহাদ বানু," দারা বলে গেল, "ওসমানের আসল জন্ম-বৃত্তান্ত কয়েকদিন আগে তোমায় জানিয়েছি। যে কথা আমরা কেউ জানতাম না, সেটা হোলো আলি আদিল শাহ ও ওসমানের চেহারায় একটা আশ্চর্য [illegible] লো, সেটা জানা গেল [illegible]

বেগম [illegible] হাসি মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে ভাবলো, ওসমানের মৃত্যু [illegible]য়েছে ও [illegible] আর বেঁচে নেই। কিন্তু আমি বেঁচে আছি। —স্নিগ্ধ হাওয়া থেকে বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে নিলো কয়েকবার। তারপর নিজের মনে বললো,—রাজা বাদশাহ সুলতান তাদের সীমিত ময়াদ নিয়ে যাওয়া আসা করুক ইতিহাসের অসংখ্য পাতায়। ওদের ভিড়ে আমি হারিয়ে যেতে চাইনা। আমি আকাশ হতে চাই।

—সমাপ্ত—